মায়ের কথা

শ্রীঅরবিন্দ

শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২
১৯৫৩

প্রকাশক : শ্রীঅরবিন্দ সোসাইটি
কলিকাতা : পণ্ডিচেরী—২

মূল অনুবাদক : পশুপতি ভট্টাচার্য্য

মুদ্রক : অল ইণ্ডিয়া প্রেস
শ্রীঅরবিন্দ আশ্রম
পণ্ডিচেরী—১

সূচীপত্র

১

মায়ের দেহধারণের উদ্দেশ্য

মায়ের দেহধারণের উদ্দেশ্য

মায়ের কথা

প্রঃ আমাদের মা হয়ে যিনি এখানে আছেন ইনিই কি সেই মা যাঁর কথা আপনি আপনার The Mother বই-খানিতে ব্যাখ্যা করেছেন?

উঃ হাঁ।

×

প্রঃ ইঁনিই কি তবে ব্যক্তিরূপ নিয়ে স্বয়ং জগন্মাতা, যিনি তাঁর সমস্ত বিশ্বাতীত ও বিশ্বগত বৃহত্তম শক্তি-গুলিকে নিয়ে মরদেহে এখানে অবতীর্ণা হয়েছেন?

উঃ হাঁ।

×

প্রঃ তাহলে স্বয়ং আদ্যাশক্তি ভগবতী কি করুণার বশে আমাদেরই জন্য এবার এসেছেন এই অন্ধকার ও মিথ্যায় ভরা মৃত্যুর জগতে মানবীরূপে দেহধারণ ক'রে?

উঃ হাঁ।

১৭-৮-১৯৩৮

মায়ের ভগবতীত্ব

প্র ঃ অনেকে বলে যে মা আগে ছিলেন আমাদেরই মতো মানুষ, কেবল এখনই হয়েছেন ভগবতী মা, তাঁর প্রার্থনাগুলি (Prayers and Meditations) দেখে সেই কথাই প্রমাণ হয়। কিন্তু আমার মনে হয় এবং আমার চৈত্য ধারণাও তাই যে স্বয়ং ভগবতী মা-ই এসেছেন মানুষের মতো দুর্ভোগ ও অজ্ঞানতার আবরণ নিয়ে, যাতে আমাদের হাতে ধরে নিয়ে যেতে পারেন জ্ঞান ও পরমানন্দের দিকে ও পরমেশ্বরের সান্নিধ্যে। আর তাঁর লেখা উপরিউক্ত প্রার্থনাগুলিও সেই কারণে—কেমন ক'রে প্রার্থনা করতে হয় তাই দেখাতে। এই কি ঠিক কথা ?

উ ঃ হ্যাঁ। ভগবান মানুষের আকৃতি ও বাহ্য প্রকৃতি নিয়ে এসে মানুষকে দেখিয়ে দেন যে কেমন ক'রে জীবনের পথে চলতে হবে, কিন্তু তাই বলে তাঁর আসল ভগবত্তাকে তিনি ছেড়ে আসেন না। এখানে এসে তাঁর দিব্য চেতনার ক্রমিক বিকাশ ও অভিব্যক্তি ঘটান, তাকে মানুষ থেকে ভগবান হওয়া বলা যায় না। মা তাঁর শিশুকাল থেকেই অন্তরে অন্তরে ছিলেন মানুষের চেয়ে বেশি কিছু। সুতরাং "অনেকে" যা বলে তা ভুল কথা।

১৭-৮-১৯৩৮

মায়ের অভিব্যক্তি ও অতিমানসের অবতরণ

প্র ঃ মায়ের অভিব্যক্তি ও অতিমানস অবতরণের মধ্যে কি প্রভেদ কিছু আছে ?

উ ঃ মা এসেছেন অতিমানসকে নামিয়ে আনতে এবং সেটা ঘটলে তখন মায়ের পুরোপুরি অভিব্যক্তি হবে।

২৩-৯-১৯৩৫

×

প্রঃ মা তো সরাসরি তাঁর উপরের স্তর থেকে সাধকদের উপর কাজ করেন না, যদিও তিনি অনায়াসে তা ক'রে জগৎ একদিনের মধ্যে অতিমানসের ক'রে দিতে পারেন। তাতে যদিও পৃথিবী উপরের মতো হবে, কিন্তু তাতে এর অজ্ঞানতা থেকে স্বাভাবিক ক্রমবিবর্তন হবে না, সুতরাং খাঁটী সেই জিনিস হবে না। ঠিক কথা কি?

উঃ এটি খুব দামী সত্য কথা।

১৭-৬-১৯৩৫

মায়ের দেহধারণের উদ্দেশ্য

প্রঃ আমার এমন ধারণা কি ঠিক যে মা ব্যক্তিগত রূপ নিয়ে এসেছেন এই বাস্তবের জগতে উত্তরোত্তর তাঁর কৃপা বর্ষণ করতে, যাতে তাঁর এই দেহধারণের ফলে সমগ্র পার্থিব চেতনা রূপান্তরিত হয়ে উঠতে পারে?

উঃ হাঁ। তাঁর দেহধারণের সুযোগে পার্থিব চেতনার যথোচিত রূপান্তর হয়ে অতিমানসকে গ্রহণ করা এর পক্ষে সম্ভব হতে পারবে। তার পরে অতিমানস এসে নিজেই আরো রূপান্তর ঘটাবে, কিন্তু সমগ্র পার্থিব চেতনাতেই যে এমন হবে তা নয়——প্রথমে কয়েকজন মাত্রকে নিয়ে একটা নতুন অতিমানসের অভিব্যক্তির জাতি হবে, যেমন মানুষ এখন মনের অভিব্যক্তির একটা মনোময় জাতি।

১৩-৮-১৯৩৩

×

দিব্য শক্তি একটাই আছে যা বিশ্বেও এবং ব্যক্তিতেও ক্রিয়া করে আবার ব্যক্তি ও বিশ্বের উপরেও থাকে। সেই সমগ্র শক্তিটাই হলেন মা, কিন্তু এখানে দেহীরূপে তিনি কাজ করছেন এখানকার বাস্তব জগতের

জীবনে রূপান্তরের জন্য এমন কিছু জিনিস আনতে যা আজ পর্যন্ত এখানে দেখা যায়নি--এখানকার মাকে ঐ উদ্দেশ্যে আগত সেই ভগবতী শক্তি রূপেই জ্ঞান করবে। মানবী রূপে যদিও তিনি এই মা-ই বটেন। কিন্তু সমগ্র চেতনাতে তাঁর মধ্যে ভগবানের সব কিছুই বর্তমান।

×

মা অনেকগুলি নেই, একটিই মায়ের অনেক স্বরূপ। পরাৎপরতা মায়ের একটা বিশেষ দিক মাত্র। পরাৎপর মাতার সাকার স্বরূপ কাকে বলে বুঝলাম না। একই মা সাকার হয়েছেন--তার দ্বারা কি অভিব্যক্তি ঘটাবেন সেটা তাঁরই উপর নির্ভর করে।

৭-৭-১৯৩৬

×

প্র ঃ বিশ্বক্রিয়ার ক্ষেত্রে মা জগৎ বিধানমত কাজ করেন, কিন্তু দেহী হয়ে তিনি কেবল নিত্য কৃপা বিতরণ করেন, এর কি কারণ?

উ ঃ ওটা হলো বিশ্বশক্তির কাজ, বিশ্ব বিধানানুযায়ী বিশ্বের নিয়ন্ত্রণ। ওর চেয়ে বেশি কিছু রূপান্তর আনতে হলে তা আসবে বিশ্বের উপরকার পরাৎপর থেকে, সেই পরাৎপরের কৃপাই এসেছেন মানবী মা হয়ে সেই বিশেষ কাজটি সম্পন্ন করতে।

১৩-৮-১৯৩৩

×

সশরীরে মায়ের কাছে গেলে এই কাজ হয়--তুমি দেহাশ্রিত মন ও প্রাণ নিয়ে দেহাশ্রিত মহাশক্তির সান্নিধ্যে উপস্থিত হতে পারলে। জগৎব্যাপী ক্রিয়াতে মা জগতের নিয়মেই চলেন--কিন্তু নিত্য কৃপা বিতরণের সুযোগের জন্যই তাঁর ব্যক্তিগত দেহধারণ--দেহের মাধ্যমে তিনি সেই কাজই নিত্য

করছেন।

১২-৮-১৯৩৩

মায়ের বিভিন্ন রূপ

মায়ের বহু ব্যক্তিত্ব, যখন যেটা প্রকট হয় তখন সেই মতো তাঁর চেহারাও বদলায়। যেটা সাধারণ তা অবশ্য ঠিক থাকে। তার মধ্যে যে রূপে তাঁর সকল ব্যক্তিত্ব প্রতিফলিত হয় তার কোনো নাম দেওয়া যায় না——আর তার পর্দার আড়ালে থাকে অতিমানস ব্যক্তিত্ব যা সেই আড়াল থেকে বর্তমান অভিব্যক্তির লক্ষ্য অনুযায়ী কাজ করছে।

৯-১১-১৯৩৩

×

মায়ের একই রূপ নয়, বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম। তাঁর স্থূল দেহের অন্তরালে রয়েছে মায়ের বহু ব্যক্তিত্বের বহু শক্তির বহু আকৃতি।

১৪-৫-১৯৩৩

×

প্র ঃ দুদিন আগে অন্তর্দৃষ্টিতে দেখলাম যে মাকে স্মরণ ক'রে আমার হৃদয়ের আস্পৃহার আগুন উপরদিকে উঠে যাচ্ছে। তখন দেখি যে মা তাঁর এই স্থূল দেহেই সেই আগুনের ভিতর দিয়ে এসে আমার সর্ব সত্তাকে শান্তি ও শক্তিতে ভরে দিলেন। এর অর্থ কি হবে? মাকে তাঁর দিব্য দেহে না দেখে ঠিক এই দেহেই দেখলাম কেন?

উ ঃ তার মানে তোমার আস্পৃহা চাইছে কেবল আভ্যন্তর সত্তাতে নয় কিন্তু বাহ্য প্রকৃতিতেও উপলব্ধি পেতে। ভিতরের কাজ বা অন্য কোনো স্তরের কাজ হলে তখন মাকে দেখা যাবে অন্যান্য মূর্তিতে, কিন্তু স্থূল দেহের

উপর কাজ চাইলে মাকে এখানকার স্থূল দেহেই দেখবে।

১৫-৭-১৯৩৩

×

প্র : মাকে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকম দেখি কেন, যেমন প্রণামে, বা প্রস্‌পেরিটিতে, বা সাক্ষাৎ দিতে যখন যান? এমন কি দেহের গঠনও বদলে যায়। চেহারাতে এমন তফাৎ হয় কেন? নিজেকে যখন যেমন বাইরের দিকে আনেন সেই অনুসারে কি তাই হয়?

উ : বোধ করি যখন তাঁর যে ব্যক্তিত্বকে সামনে রাখেন সেই অনুযায়ী হয়——কারণ তাঁর বহু ব্যক্তিত্ব, আর দেহ যথেষ্ট নমনীয় হওয়াতে যেটা যেমন আসে তারই মতো রূপ নেয়।

৪-১২-১৯৩৩

×

প্র : প্রায়ই যখন মাকে দেখি তখন মনে হয় যেন তিনি এক দিব্যানন্দের প্রতিমূর্তি আর চেহারাটা যেন অল্পবয়সী বালিকার মতো। এমন বোধ করার মধ্যে কি সত্য কিছু আছে?

উ : কেবল আনন্দই নয়——ওর মধ্যে জ্ঞান আছে, শক্তি আছে, প্রেম আছে, ভগবানের আরো অনেক জিনিস আছে। তবে বিশেষ একটা অনুভূতি হিসাবে ওটা ঠিকই।

৩০-৪-১৯৩৩

×

হাঁ, অনেকেই তাই দেখে থাকে যে মা যেন তাঁর দৈহিক কাঠামোর

চেয়ে আরো অনেকখানি লম্বা।

২৯-৯-১৯৩৩

মায়ের আবির্ভাব জানতে পারা

ক যে কোন স্তরে আছেন তা জানি না, কিন্তু তাঁর পথ হলো অদ্বৈত জ্ঞানের ও মোক্ষের——সুতরাং ভগবৎ আবির্ভাবের কথা তাঁর জানার প্রয়োজন নেই। আর খ-এর গুরু হলেন মাতৃভক্তির সাধক, অস্তিত্বের সক্রিয় দিকের সম্বন্ধে আস্থাবান, সুতরাং তাঁর পক্ষে মায়ের আবির্ভাবের কথা জানা খুবই স্বাভাবিক।

২৩-১-১৯৩৬

×

মা তাঁর শৈশবকালের অন্তর্দৃষ্টিতে আমাকে দেখেছিলেন ও তখন "কৃষ্ণ" বলে জেনেছিলেন——রামকৃষ্ণকে তিনি দেখেননি।

আর মায়ের আবির্ভাবের কথা রামকৃষ্ণের জানবার কথা নয়, কারণ ভবিষ্যৎ নিয়ে তিনি কিছু চিন্তা করেননি বা প্রস্তুত হননি। মা যে অবতীর্ণ হবেন তা তিনি হয়তো জানতেন না।

১১-৭-১৯৩৫

মাকে ভগবতী রূপে চেনা

কেউ বা তখনই চিনতে শুরু করে, কেউ বা দেরীতে।

ক মাকে প্রথম দৃষ্টিতেই চিনেছিল আর তখন থেকে সে বেশ খুশিতেই আছে; আর অন্যান্য যারা মায়ের ভক্ত তাদের মাকে চিনতে এবং মেনে নিতে কয়েক বছর সময় লেগেছে কিন্তু এখন তারাও 'খুব খুশিতে আছে। কেউ কেউ আবার তাদের সাধনাতে পাঁচ, ছয়, সাত বছর বা আরো বেশি কেবল দুঃখকষ্ট ছাড়া কিছুই পায়নি, কিন্তু তথাপি অবশেষে তাদের চৈত্য

জেগেছে। কার কতদিন সময় লাগবে এটা হলো গৌণ কথা; মুখ্য জিনিস হলো—শীঘ্র কিংবা বিলম্বে, সহজে বা কষ্টে, সেখানে গিয়ে পৌছানো।

×

প্র ঃ মনে হয় যে আমার বাহ্য অংশ যেটা মাকে মেনে নিতে পারেনি তা এখন তাঁকে ভগবতী বলে মানছে। তবু তাঁর সামনে গেলে তা ভুলে যাই কেন?

উ ঃ স্থূল মনটি বাহ্যভাবে স্থূল দেহকে কেবল স্থূল বলেই দেখে।

১৫-৮-১৯৩৭

×

তোমার মধ্যে এমন দ্বন্দ্ব হওয়া নিতান্তই অনাবশ্যক (শ্রীকৃষ্ণকে ভক্তি করা আর মাকে ভগবতী জ্ঞান করার মধ্যে)। দুইই এক কথা আর দুটোই একসঙ্গে চলতে পারে। তিনিই তোমাকে মায়ের কাছে এনেছেন, মাকে ভক্তি করতে থাকলে তুমি তাঁকেই পাবে। তিনিই রয়েছেন এই আশ্রমে, এখানে তাঁরই কাজ হচ্ছে।

১৯৩৩

×

প্র ঃ এমন কি ক-এর মতো উত্তম ভক্ত ও উত্তম ছাত্রও মাকে মেনে নিতে দ্বিধাগ্রস্ত হচ্ছে। মায়ের সম্বন্ধে এই সহজ কথাটা বুঝতে পারে না কেন তা জানি না।

উ ঃ সে যদি মানতে না পেরেছে তাহলে সে উত্তম ভক্ত হলো কেমন ক'রে? কার প্রতি ভক্ত? উত্তম ছাত্র হওয়ার কথা আলাদা; ছাত্র ভালো হলেও আধ্যাত্মিক বিষয়ে অপারগ হতে পারে। বিষ্ণু বা অন্য কোনো দেবতার ভক্ত হলে স্বতন্ত্র কথা—তাতে সে নিজের আরাধ্যকে ছাড়া আর

কাউকে মেনে নিতে পারে না।

১৪-১১-১৯৩৪

×

প্র ঃ কেউ কেউ উচ্চতর স্তরে মায়ের স্থান সম্বন্ধে এমন ভুল বোঝে—ঐসব স্তরে উঠতে পারলেই তারা মনে করে তারা এত উঁচুতে উঠেছে যে মায়ের সেখানে নাগাল নেই। বিশেষত অতিমানস সম্পর্কে তারা ভেবে নিয়েছে যে মায়ের চেয়ে তা আরো উপরকার।

উ ঃ তারা যদি মায়ের চেয়েও বেশি চেতনা বা উপলব্ধি পেয়ে থাকে তাহলে তাদের এখানে থাকার কি দরকার, বাইরে গিয়ে তার জোরে জগৎ-কে তারা রক্ষা করুক।

×

প্র ঃ আজ সকালে মাকে দেখলাম সৌন্দর্যময়ী জ্যোতির্ময়ী রূপে যেন তাঁর দেহ থেকে অস্বাভাবিক আলো বিকীর্ণ হচ্ছে, যেন স্বর্গ থেকে এক মহাদেবী নেমে এলেন। এর অর্থ কি জানাবেন।

উ ঃ অর্থ এই যে তাঁর দেবীত্ব তুমি প্রত্যক্ষ করলে, যা সর্বদাই আছে।

২০-৭-১৯৩৩

×

প্রথম দৃষ্টিতে মাকে দেবী রূপে দেখা কেবল তার পক্ষেই নয়, আরো অনেকেই দেখেছে। ক-এর ভাগ্নে, একটি মুসলমান মেয়ে, মাকে দেখেই বলেছে "ইনি মানুষ নন, দেবতা"। তখন থেকে তারা নানারকম ভাবে তাঁকে স্বপ্নে দেখেছে, আর যখনই কোনো বিপদ-আপদ ঘটেছে তখন তাঁকে স্মরণ

ক'রে তার থেকে মুক্ত হয়েছে। মাকে দেবীরূপে দেখা এমন কিছু কঠিন নয়।

২৩-৭-১৯৩৫

×

ক হলো অতিমাত্রায় বৈদান্তিক: আমরা যা বিশ্বাস করি তা সে বিশ্বাস করে না, যেমন অবতরণ প্রভৃতি। অথচ সে নিজে অনুভূতি পেয়েছে যে মা স্থূল দৃশ্য মূর্তিতে তাকে দেখা দিয়ে তাকে নিষিদ্ধ কাজে নিবারিত করে-ছেন।

৭-৭-১৯৩৬

×

প্রঃ মুসলমান মেয়েটি ঠিক কি দেখেছে বলতে পারি না, আপনার বর্ণনাতে মনে হয় যে বোধির বিদ্যুৎচমকে সে কিছু দেখে থাকবে।

উঃ আদৌ তা নয়, সে প্রত্যক্ষ দেবীকেই দেখেছে; তোমার ধারণা যে তা বুঝি হঠাৎ আসা বোধিমূলক একটা ধারণা? লোকে বোধি বলতে তাই বোঝে। কিন্তু ঐ মেয়ের বা ক'এর পক্ষে সে কথা নয়।

২৯-৭-১৯৩৫

×

প্রথমেই মাকে তাঁর পূর্ণ দিব্যত্বে ক বা অন্য কেউ দেখেছে এ কথা বিশ্বাস করি না। আগের থেকেই যথেষ্ট গুহ্যদৃষ্টি থাকলে তা হতে পারে। আসল কথা হলো ভিতরে একান্ত ভাবে প্রত্যক্ষ অনুভব করা: "ইনিই মা"। বোধ করি এ বিষয়ে তোমার আধ্যাত্মিক বোধের চেয়ে কাব্যপ্রবণ ও ভাব-প্রবণ বোধটাই বেশি। অনেকের বেলাতে সাধনায় নেমে ঐরূপ গুহ্যদৃষ্টি খুলে যায়, আবার অনেকের বেলাতে যোগ না করেও কখনো কখনো তা

এসে পড়ে। কিন্তু যারা বুদ্ধিপ্রধান (সকলে নয়) তাদের প্রকৃতির মধ্যে এটা থাকে না, অনেক চেষ্টায় তা আসে। আমার বেলাতে তাই হয়েছিল। দেখবার শক্তি না থাকলেও দেখতে পাওয়া অলৌকিক ব্যাপার। আমরা কিন্তু অলৌকিক নিয়ে বিশেষ কারবার করি না।

২৯-৭-১৯৩৫

প্র ঃ পূর্বসংস্কারবশত অনেক সময় দেখি যে মায়ের দেবীত্ব সম্বন্ধে আমার বিশ্বাস হারাচ্ছি। কি করে তা নিবারণ করা যায়?

উ ঃ মাকে দেবী রূপে দেখতে পেলেই সে বিশ্বাস আসবে—সেটা হলো আভ্যন্তরীণ চেতনা ও অন্তর্দৃষ্টির ব্যাপার।

৫-৬-১৯৩৭

×

প্র ঃ মা যে দেবতা এবং তাঁর কাজ মানুষের নয়, এ বিশ্বাস কেমন করে আসবে?

উ ঃ চৈত্যের উন্মীলনে মন প্রাণের উপর প্রভাবের দ্বারা তা হতে পারে—কারণ মন যা দেখতে পারে না, চৈত্যসত্তা তা দেখতে পারে।

×

প্র ঃ আমিই ব্রহ্ম, এই ভাব আনা কি পূর্ণ যোগে দরকার নয়?

উ ঃ সমগ্র প্রকৃতির রূপান্তরই যথেষ্ট নয়। নতুবা এখানে মায়ের উপস্থিতি প্রয়োজনই হতো না। নিজেকে ব্রহ্ম মনে করলেই সব হয়ে যেতো। মায়ের উপস্থিতি ও মায়ের শক্তির কোনো প্রয়োজনই হতো না।

২৭-১২-১৯৩৫

×

নিশ্চয়, সমাধি এ যোগে পরিহার্য নয়। মা যে সব সময় সমাধিস্থ হয়ে পড়েন, সেটাই তো তার সব চেয়ে বড় প্রমাণ।

২

মায়ের বিভিন্ন স্বরূপ ও বিভিন্নমুখী শক্তি

মায়ের বিভিন্ন স্বরূপ ও বিভিন্নমুখী শক্তি

"মা" পুস্তকের কতকগুলি শব্দের অর্থ

অসত্য ও অজ্ঞানতা

অজ্ঞানতা হলো অবিদ্যা, একটা স্বতন্ত্র চেতনা যার থেকে অহংঘটিত মন ও প্রাণ হয়েছে, তার পক্ষে সেটাই স্বাভাবিক। বিশ্ববুদ্ধি অতিমানসের আলো থেকে (বিজ্ঞানের) পৃথক হওয়ার ফলেই এই অজ্ঞানতার সৃষ্টি—দিব্য চেতনার সত্য থেকে, শক্তি ও আনন্দের সত্য থেকে পৃথক হওয়ার ফলেই বিজ্ঞানময় আলোর জগতের বদলে ও দিব্য সত্যের জগতের বদলে আমরা পেয়েছি এই অর্ধসত্য ও অর্ধভ্রান্তির নিম্নতর বিশ্ববুদ্ধির জগৎ। শংকর প্রভৃতি ভাবুকেরা সেই ঋতশক্তিকে না জেনে একেই বলেছেন মায়া, যা নাকি বিধাতার শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। এখানকার চেতনার সব কিছুই সীমিত অথবা বিকৃত, মূল আলো থেকে স্বতন্ত্র হওয়াতে; সে চেতনা সত্যকেও দেখে অর্ধজ্ঞানে। তাই একে বলা হয় অজ্ঞানতা।

অসত্য কিন্তু এই অবিদ্যা নয়, যদিও তারই চরম ফল। আসুরিক শক্তির দ্বারা অসত্যের সৃষ্টি, যা কেবল সত্য হতে স্বতন্ত্রই নয় বা ভ্রান্তই নয়, কিন্তু সত্যের বিরোধী, সত্যকে বিকৃত করে। এই অন্ধ আসুরিক শক্তি বা রাক্ষসী মায়া আপন বিকৃত চেতনাকে ও সত্যের বিপরীত জিনিসকে প্রকৃত জ্ঞান বলে জাহির করে। এইসব শক্তিদের আমরা বলি বিরোধী সত্তা, বিরোধী শক্তি। যখনই তারা বিকৃত অজ্ঞানতাকে সত্য বলে উপস্থিত করে, তাই হলো অসত্য, যোগের ভাষাতে মিথ্যা, মোহ।

শক্তি ও আকৃতি

এইসব মিথ্যা শক্তি ও সত্তা এই অজ্ঞানতার জগতে অসত্যকে সত্য বলে মানুষকে প্রভাবিত করে। ভারতে এদের বলে অসুর, রাক্ষস, পিশাচ (ধাপ অনুসারে) যারা দেবতাদের বিরোধী; এরাও শক্তি কিন্তু এদের ক্ষেত্র আলাদা। পূর্বে এরা দেবশক্তি ছিল (মহাভারতে বলেছে পূর্বে দেবাঃ) কিন্তু

ভগবৎ বিরোধী হওয়াতে তাদের পতন হয়েছে। "আকৃতি" অর্থে যে রূপে তারা জগতের উপর প্রভুত্ব স্থাপন করে, মিথ্যা স্বরূপ নিয়ে এবং কখনো বা দেবতার ভেক নিয়ে।

বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব—চারটি শক্তিরূপ

শক্তি শব্দটির অর্থ বলাই হয়েছে—বিশ্বক্ষেত্রের ক্রিয়াধারাতে যে কেউ বা যা কেউ সচেতনে কাজ করবার ক্ষমতা রাখে তাকেই শক্তি নামে অভিহিত করা যেতে পারে। কিন্তু তুমি যে চার শক্তির কথা বলেছ (মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী, মহাসরস্বতী) তাঁরাও হলেন শক্তি, পরাৎপর চিৎ-শক্তির অর্থাৎ আদ্যাশক্তি মায়ের বিভিন্নরূপ অভিব্যক্তি, যার দ্বারা তিনি বিশ্ব নিয়ন্ত্রণ করছেন। সবগুলিই ভগবৎ ব্যক্তিত্ব, কারণ প্রত্যেকে একই দেবতার বিভিন্ন ব্যক্তিচরিত্র ও চেতনারূপ নিয়ে কাজ করেন। যাঁরা বড়ো বড়ো দেবতা তাঁরাও এই প্রকারে ভগবানেরই বিভিন্ন ব্যক্তিত্ব—একই মহা-চেতনা বিভিন্ন ব্যক্তিচেতনাতে অভিব্যক্ত, একম্ সৎ বহুধা। কোনো মানুষও একজন মাত্র ব্যক্তি নয়, যেমন আগে ভাবা যেতো, কিন্তু একটি মানুষের মধ্যে থাকে অনেকগুলি ব্যক্তিত্ব। সকল চেতনাই একও হয় আবার বহুও হয়। "বিভিন্ন শক্তি ও ব্যক্তিত্ব" বলতে একই সত্তার বিভিন্নতাকে বোঝায়; শক্তি হলেই যে তা নির্ব্যক্তিক হবে ও অব্যক্তম্ হবে তা নয়, যেমন তুমি বলেছ—বরং বলা যাবে যে তা ভগবৎ অভিব্যক্তির বিশ্ব জগতে এসে নিজেকে অভিব্যক্ত করছে।

মায়ের বিভূতি

বিভূতি বলতে তাই বোঝায় যেমন মাতৃকাদের বর্ণনা তোমার চিঠিতে দিয়েছ। মায়ের বিভূতি হলো তাঁর চেতনা ও শক্তির কিছু অংশ যা বাইরে বেরিয়ে এসে তার কাজ করছে মায়ের সঙ্গে যোগ রেখে, আর সে কাজ ফুরিয়ে গেলেই আবার তার স্বস্থানে ফিরে যাবে, কিন্তু আবার দরকার হলে আবার বেরিয়ে আসবে। কিন্তু অপরপক্ষে সেই যোগসূত্র ছিন্ন ক'রে দিয়ে তা স্বাধীন দিব্য সত্তা হয়েও আলাদা ভাবে জগতে তার নিজের কাজ করতে পারে। সকল দেবতাই এই ভাবে তাঁদের বিভূতিকে বাহির ক'রে দিতে পারেন তাঁদেরই চেতনা ও শক্তিতে সমৃদ্ধ ক'রে, যদিও সম পরিমাণে নয়। সেই ভাবে এই বিশ্বকেও বলা চলে পরাৎপরের বিভূতি। তবে কোনো

সাধকের চেতনাতে মায়ের বিভূতি এলে তখন সেই সাধকেরই চেনবার মতো রূপ ও বিশেষত্ব নিয়ে তা দেখা দেবে।

মায়ের ঐ চার শক্তিকে তাঁর বিভূতি রূপও বলা চলে, যেমন দেবতাদের বলা চলে ভগবানেরই বিভিন্নরূপ, কিন্তু তাঁদের থাকে আরো স্থায়ী রকমের চরিত্র। তাঁরা যদিও আদ্যাশক্তির অংশ হয়েও স্বাধীন সত্তা রূপে আপনাপন কাজ করছেন, এবং মহাশক্তি তাঁদেরই মাধ্যমে কাজ করতে পারেন, কিন্তু আবার নিজেরই স্বতন্ত্র ব্যক্তিত্বরূপে তাঁদেরকে নিজের মধ্যে গুটিয়ে নিতেও পারেন, কখনো নিষ্ক্রিয় রেখে কখনো বা সক্রিয় ক'রে, যখন যেমন তাঁর ইচ্ছা। অতিমানসের স্তরে তাঁরা সকলেই তাঁর মধ্যে অবস্থান ক'রে নিজেরা স্বাধীনভাবে কাজ করেন না, তাঁরা তখন থাকেন অতিমানস মহাশক্তির অন্তরঙ্গ অংশ হয়ে পরস্পরের সঙ্গে সংযোগ ও সঙ্গতি রেখে।

মা ও দেবতাগণ

ঐ চার শক্তি হলেন মায়েরই দেবতা রূপিনী; স্থায়ী ভাবে রয়েছেন বিশ্বলীলার মধ্যে। এঁরা হলেন সেই প্রধান দেবতাদের অন্তর্গত যাঁদের উল্লেখ ক'রে বলা হয়––"মা এই ত্রিজগতের মহাশক্তি যিনি বিরাজ করেন দেবতাদের উপরে (অধিমানসের স্তরে)"। পূর্বেই বলা হয়েছে যে দেবতাগণ হলেন ভগবানের স্থায়ী বিভূতি, পরমা জননী আদ্যাশক্তির দ্বারা এই ভাবে স্বতন্ত্রীকৃত হয়েছেন; প্রত্যেকেই তাঁরা ভগবানের শক্তি ও ব্যক্তিত্ব নিয়ে আপন আপন স্বাধীন অবস্থাতে বিশ্বে তাঁদের কাজ করছেন। তাঁরা নির্ব্যক্তিক সত্তা নন, সকলে বিশ্ব ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন, যদিও তাঁরা নির্ব্যক্তিক শক্তি ক্রিয়ার অন্তরালে অবস্থান করেন। কিন্তু অধিমানসের স্তরে এবং ত্রিজগতে যদিও তাঁরা স্বতন্ত্র স্বাধীন সত্তা, তথাপি অতিমানসে তাঁরা সেই অদ্বিতীয় একের মধ্যে ফিরে গিয়ে একই পুরুষোত্তমের বহুধা ব্যক্তিত্ব দিয়ে একজোটে কাজ করেন।

উপস্থিতি

উপস্থিতি কথাটি যখন বলা হয় তখন তা এই অর্থে যে তোমার অস্তিত্ব ও চেতনার কাছে ভগবানের একটি বিশেষ সত্তা রূপে উপস্থিতি, তার আর কোনো ব্যাখ্যা বা বর্ণনার দরকার হয় না। যখন বলা হয় "অকথ্য উপস্থিতি" তখন তার মানে ওর চেয়ে আর বেশি কিছু বলবার নেই, যদিও যে

দেখছে সে জানছে যে তার মধ্যে ব্যক্তিত্ব এবং নির্ব্যক্তিত্ব দুইই আছে। শক্তি ও আলো ও আনন্দ প্রভৃতি সব কিছুই প্রবাহিত হচ্ছে সেই অবর্ণনীয় উপস্থিতি হতে। এই হলো ওর বিশেষ তাৎপর্য, যদিও তার কমবেশি হতে পারে--কিন্তু আসলে তা হবে সুনিশ্চিত উপস্থিতির সুনিশ্চিত অনুভূতি।

মায়ের প্রেম ও আনন্দময় অতিমানস শক্তি

> প্র ঃ "চণ্ডী"তে অন্যান্য দেবতাদের সঙ্গে মহেশ্বরী, মহাকালী, মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী এই চার শক্তির উল্লেখ আছে কিন্তু "রাধা"র উল্লেখ নেই। তাতেই প্রমাণ হয় যে চণ্ডী যখন লেখা হয় তখন ঋষিদের দৃষ্টিতে রাধা-শক্তি প্রকাশ পায়নি, তাই চণ্ডীতে মায়ের কেবল বিশ্বশক্তিদের কথাই আছে কিন্তু অতিমানস শক্তির উল্লেখ নেই। কিন্তু আপনি আপনার "মা" (The Mother) পুস্তকে বলেছেন: "ভগবতী মায়ের আরো বৃহৎ ব্যক্তিত্ব আছে যাঁদের নামিয়ে আনা আরো কঠিন, তাঁরা পার্থিব চেতনার বিবর্তনের ক্ষেত্রে অতটা প্রকট হননি। তবে অতিমানস বিকাশের ক্ষেত্রে তাঁদের উপস্থিতি অপরিহার্য--বিশেষত একজনের, যিনি রহস্যময় পরমানন্দের ব্যক্তি-স্বরূপিনী, যে আনন্দ প্রবাহিত হয় চরমতম দিব্য প্রেম হতে, যে আনন্দই পারে অতিমানসের সর্বোচ্চ চূড়া ও জড়জগতের সর্বনিম্ন গহ্বরের মধ্যবর্তী ব্যবধানকে ভরাট ক'রে দিতে, যে আনন্দই পরমাশ্চর্য দিব্যজীবনের একমাত্র চাবিকাঠি এবং এখনও যা গোপনে সকল বিশ্বশক্তির ক্রিয়াকে সমর্থন দান করছে"। এই যে ব্যক্তিত্বের কথা বলেছেন ইনিই কি রাধা-শক্তি নন, যাঁকে বলা হয় প্রেমময়ী রাধা, মহাপ্রাণ শক্তি, এবং হ্লাদিনী শক্তি? .

উ ঃ হাঁ; কিন্তু রাধা-কৃষ্ণ লীলার যে চিত্র তা প্রাণময় জগৎ থেকে নেওয়া, সুতরাং সেখানে রাধাশক্তির কেবল আভ্যন্তর অভিব্যক্তিই চিত্রিত হয়েছে। তাই তাকে বলা হয়েছে মহাপ্রাণ শক্তি ও হ্লাদিনী শক্তি। আর

তোমার উদ্ধৃত লেখাটির মধ্যে যার উল্লেখ আছে তা এই আভ্যন্তর রূপটি নয়, কিন্তু তা হলো উপরের প্রেম ও আনন্দের পূর্ণ শক্তি।

৭-২-১৯৩৪

সকল স্তরেই মায়ের শক্তিরূপ

প্র ঃ মহেশ্বরী কি বোধিগত ও অধিমানস স্তরের অন্তর্গত?

উ ঃ এই সব শক্তি সকল স্তরেই অভিব্যক্ত হয়, অধিমানস থেকে বাস্তব স্তর পর্যন্ত।

২৫-৮-১৯৩৩

দুর্গা

দুর্গা হলেন মায়ের নিরাপত্তা ও রক্ষাকরী শক্তি।

১৫-৪-১৯৩৩

মায়ের বিভূতিগণ

প্র ঃ ঈশ্বরের ও মায়ের বিভূতিগণের বিকাশের মধ্যে কিরূপ পার্থক্য আছে?

উ ঃ মায়ের বিভূতিগণ সাধারণত স্ত্রী-ব্যক্তিত্ব নিয়েই আসবেন এবং মায়ের ঐ চার ব্যক্তিত্বের মধ্যে কোনো একটি তার মধ্যে প্রকট হবে। আর যাঁদের মতো ব্যক্তির কথা তুমি বলেছ (খ্রীষ্ট, বুদ্ধ, চৈতন্য, নেপোলিয়ন, সীজার ইত্যাদি) তাঁরা হবেন ঈশ্বরের শক্তি ও ব্যক্তিত্বের বিভূতি, কিন্তু সেখানেও মায়ের শক্তি কাজ করবে। সব কিছু সৃষ্টি ও রূপান্তরের কাজ হলো মায়েরই কাজ।

২৯-১০-১৯৩৫

×

প্রঃ যদি সব কিছুর সৃষ্টি মায়েরই কাজ হয়, তাহলে অবতার কিংবা বিভূতির যখন নেমে আসা দরকার হয় তখন কি মা অন্তরাল থেকে তারও প্রস্তুতি ঘটান?

উঃ যদি মায়ের দিব্য ব্যক্তিত্বগুলির সম্বন্ধে বলে থাকো তাহলে সেই কথাই বটে। এমনও বলা যেতে পারে যে প্রত্যেকটি বিভূতি মায়ের ঐ চার শক্তির বিশেষ কোনো একটির থেকে শক্তি পেয়ে আসে, যেমন নেপোলিয়ন পেয়েছেন মহাকালীর, রাম পেয়েছেন মহালক্ষ্মীর, অগষ্টাস্ সীজার পেয়েছেন মহাসরস্বতীর।

৩১-১০-১৯৩৫

ভগবতী মাতা

ভগবতী মাতা হলেন স্বয়ং ভগবানের মূল চেতনা ও শক্তি--তাই সব কিছুরই তিনি জননী।

আদ্যাশক্তি

আদ্যা শক্তি মানে মূল শক্তি, মায়ের সর্বোচ্চ স্বরূপ। কেবল যে স্তরে তাঁকে দেখবে সেই স্তরের উপযোগী বিভিন্ন প্রকারে তিনি অভিব্যক্ত হন।

২২-৭-১৯৩৩

পরাৎপর মাতা

ওকেই বলা হয় আদ্যা শক্তি; তিনিই হলেন পরাৎপরের চেতনা ও শক্তি সকল বিশ্বের উপরে, তাঁরই দ্বারা সকল দেবতাও উৎপন্ন, এমন কি অতিমানস ঈশ্বরও তাঁরই মাধ্যমে অভিব্যক্ত--যিনি পুরুষোত্তম এবং সকল দেবতার শক্তি ও ব্যক্তিত্ব যাঁর থেকে।

মা ও ঈশ্বর

মা হলেন ভগবানের চিৎশক্তি--কিংবা ভগবান যেখানে চিৎশক্তিস্বরূপ সেখানে তিনি এই মা। বিশ্ববিধাতা স্বরূপ ঈশ্বর যিনি, তিনি এই মা থেকেই হয়েছেন, আর মা বিশ্বশক্তি রূপিনী হয়ে তাঁর পাশে স্থানগ্রহণ করেছেন-- সুতরাং বিশ্ববিধাতা ঈশ্বর হলেন ভগবানের একটা বিশেষ স্বরূপ।

গীতায়, তন্ত্রে ও পূর্ণযোগে মায়ের কথা

গীতাতে ভগবতী মায়ের সম্বন্ধে স্পষ্ট উল্লেখ নেই; গীতায় বলা হয়েছে পুরুষোত্তমের কাছে সমর্পিত হবার কথা--কেবল উল্লেখ করা হয়েছে পরা-প্রকৃতির জীবভূত হবার কথা, তার মানে যিনি ভগবানের অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছেন বহু জীবের মধ্যে এবং যাঁর মাধ্যমে এই সকল জগতের সৃষ্টি হয়েছে এবং ভগবান স্বয়ংও যাঁর মাধ্যমে অবতার রূপে অবতরণ করেন। গীতা অনুসরণ করেছে বেদান্তের ঐতিহ্যকে, তাই ভগবানের ঈশ্বরত্বের দিকটার উপরেই সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়ে জগন্মাতার সম্বন্ধে খুব কমই বলেছে, কারণ বেদান্তের আদর্শ তাই ছিল যে জগৎ প্রকৃতির থেকে সরে তার উত্তরে গিয়ে চরম উপলব্ধিতে পৌঁছানো। আর তন্ত্রের আদর্শ ভগবানের ঈশ্বরীত্ব বা শক্তির উপরেই সম্পূর্ণ গুরুত্ব দিয়েছে, কারণ তার উদ্দেশ্য হলো জগৎ প্রকৃতিকে আয়ত্তীভূত ক'রে তারই মাধ্যমে চরম উপলব্ধিতে পৌঁছানো। আমাদের যোগ দুই দিকই অবলম্বন করে; আর এর মূল কথা হলো ভগ-বতী মায়েরই কাছে সমর্পিত হওয়া, তদ্ভিন্ন এই যোগের যা উদ্দেশ্য তা সফল হবে না।

আর পুরুষোত্তম সম্পর্কে, ভগবতী মাতা হলেন সর্বজগতের উপরকার পরাৎপর চিৎ-শক্তি, তাই আদ্যা শক্তি; তিনি পুরুষোত্তমকে নিজের মধ্যে বিধৃত রেখে অক্ষর ও ক্ষরের দ্বারা জগতে ভগবানের অভিব্যক্তি ঘটান। অক্ষর রূপে তিনি সেই পরাশক্তি যিনি পুরুষকে নিজের মধ্যে অনড় রেখে নিজেও অনড় হয়ে সকল সৃষ্টির পিছনে থাকেন। আর ক্ষর রূপে তিনি সক্রিয় বিশ্বতেজে সকল সত্তা ও শক্তির বিকাশ ঘটান।

×

মা-ই যে পরমতম সত্তা এ হলো তান্ত্রিক উপলব্ধি--এ হলো সত্যের একটা দিক।

জগন্মাতা

ঈশ্বরী শক্তি, ভগবৎ চিৎ-শক্তি, জগন্মাতা, ইনি হলেন শাশ্বত অদ্বিতীয় একের এবং অভিব্যক্ত বহুর মধ্যে মিলনকারিণী। ইনি একদিক দিয়ে, সেই অদ্বিতীয় উপরের দিব্য শক্তি নিয়ে তারই লীলাতে বিশ্বে বহুধা ভগবানের অভিব্যক্তি ঘটাচ্ছেন, আপন স্ফুটন ক্রিয়াতে নিবর্তন ও বিবর্তনের মধ্য দিয়ে অসংখ্য রূপসৃষ্টি করছেন; আর অন্যদিক দিয়ে তাঁর একই শক্তির পুনরারোহনের প্রবাহে আবার তাদের সেই দিকে ফিরিয়ে নিয়ে চলেছেন যেখান থেকে তারা এসেছিল, যাতে আত্মা বিবর্তনের পথে আবার তার দিব্য উৎসে ফিরে যায় কিংবা এখানেই দিব্যত্ব লাভ করে। ইনি যদিও বিশ্ব যান্ত্রিকতার স্থাপনা করেছেন, কিন্তু প্রকৃতির প্রাকৃতিক শক্তির ব্যাপারে যেমন প্রথমেই দেখা যায় তার নিশ্চেতন কর্মপ্রণালী, জগন্মাতার নিজস্ব চরিত্র তেমন নয়; আবার মায়ার জগতে যেমন আমরা প্রথমেই পাই অনিশ্চয়তা ও ধাঁধা বা অর্ধ-প্রহেলিকার সৃষ্টি, তেমন কিছুও এঁর মধ্যে নেই। অনুভূতিলব্ধ আত্মা স্পষ্টই দেখবে যে এঁর মধ্যে রয়েছে সেই পরাৎপরের একই চেতন শক্তি ও প্রকৃতি, সেখানকারই জিনিস। যদিও মনে হয় যে কোনো অবোধ্য কারণে তিনি আমাদের অজ্ঞানতা ও অচেতনার মধ্যে ডুবিয়ে রেখেছেন, যদিও মনে হয় যে বিশ্বের এই সব সন্দেহজনক শক্তির কাজগুলো তাঁরই, তথাপি অচিরেই আমরা দেখতে পাই যে ইনি আমাদের মধ্যে দিব্য চেতনা এনে দিয়ে উপরে তাঁর নিজের দিকে টেনে নিচ্ছেন, আমাদের মধ্যে উত্তরোত্তর দিব্য জ্ঞান ইচ্ছা ও আনন্দকে ফুটিয়ে দিচ্ছেন। এমন কি অজ্ঞানতার অন্ধকারে হাতড়াতে হাতড়াতেও সাধকের আত্মা জানতে পারে যে তিনিই চেতন ভাবে তাকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাচ্ছেন অন্ধকার থেকে বৃহত্তর চেতনার আলোর দিকে, মৃত্যু থেকে অমৃতের দিকে, যন্ত্রণা ও দুর্ভাগ্য থেকে এমন বৃহত্তর কুশলের দিকে যার সম্বন্ধে তার মানব মন কখনো স্পষ্ট ধারণাই করেনি, যদিও তিনি তাকে নিয়ে যান শীঘ্র অথবা বিলম্বে, কিংবা হয়তো সোজা অথবা ঘোরা পথে। অতএব এই

মায়ের শক্তি মুক্তিদায়িনী, সৃষ্টিকারিণী, রক্ষাকারিণী, যা সাধকের আত্মা ও প্রকৃতিকে নতুন ক'রে গড়ে, তার নিম্ন চেতনার জটিলতা ঘুচিয়ে তাকে উচ্চ দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত করে।

মা ও নিম্ন প্রকৃতি

নিম্ন প্রকৃতি ও তার শক্তিক্রিয়ার সঙ্গে মাকে এক ক'রে দেখা খুবই ভুল। এখানকার প্রকৃতি হলো যন্ত্রবৎ, যাকে রাখা হয়েছে বিবর্তনশীল অজ্ঞানতার মধ্যে কাজ করতে। অজ্ঞান মন প্রাণ দেহ যেমন ভগবান নয় যদিও তা ভগবান থেকেই এসেছে--তেমনি এই যন্ত্রবৎ প্রকৃতি স্বয়ং মা নয়, যদিও তাঁরই কিছু অংশ পিছন থেকে ওকে সমর্থন করছে বিবর্তন ক্রিয়ার প্রয়োজনে। কিন্তু নিজে তিনি অবিদ্যা শক্তি নন, তিনি হলেন দিব্য শক্তি, মহা চেতনা, দিব্যালোকযুক্ত পরা প্রকৃতি, মুক্তি ও দিব্য পরিণতির জন্য যাঁর থেকে সাহায্য চাই।

অজ্ঞান বিশ্বশক্তি ও জগন্মাতা

একথা ঠিক যে বিশ্ব শক্তির দ্বারা এখানে সব কিছু হচ্ছে আর বিরাট পুরুষ তার কাজকে সমর্থন দিচ্ছেন। কিন্তু বিশ্ব শক্তি কাজ করে অজ্ঞানতার অবস্থানুযায়ী--সুতরাং নিম্ন প্রকৃতিরূপে প্রকাশিত হয়ে তোমাকে দিয়ে ভুল কাজগুলো করায়। তুমি নিজে যতক্ষণ ওর চেয়ে ভালো কিছু না চাও ততক্ষণ ভগবান তার ঐসব কাজগুলো হতে দেন। কিন্তু তুমি যদি সাধক হও তখন আর তুমি সেগুলো চাও না, তখন তুমি মায়ের দিকে ফিরে বলো যে নিম্ন প্রকৃতির বদলে তিনিই যেন তোমার মধ্যে কাজ করেন। যখন তুমি সম্পূর্ণভাবে তোমার সত্তার সকল অংশ নিয়ে মায়ের দিকে ফিরে দাঁড়াবে তখন তিনিই তোমার ভিতর দিয়ে সব কিছু কাজ করাবেন।

সগুণ ও নির্গুণ ঈশ্বর এবং মা

সগুণ নির্গুণ হলো ভগবানের বিভিন্ন দিক, অভিব্যক্তির ক্ষেত্রে। সেখানে এই মা-ই সগুণ বা নির্গুণ ঈশ্বরের অভিব্যক্তি ঘটান (সৃষ্টিও এই অভিব্যক্তি মাত্র)।

২৮-৬-১৯৩৩

নীরব আত্মা, সক্রিয় আত্মা এবং মা

ঐ অনুভূতিগুলি ঠিকই বটে—কিন্তু ও ভগবৎ সত্যের কেবল একটাই মাত্র দিক, যেখানে উচ্চ মানসের দ্বারা পৌঁছনো যায়—ওর আরো এক দিক আছে যেখানে পৌঁছনো যায় হৃদয়ের দ্বারা। উচ্চ মানসের উপরে উঠলে এই দুই সত্য তখন এক হয়ে যায়। উপরের নীরব আত্মার উপলব্ধিতে কোনো ক্ষতি নেই কিন্তু তাতে কেবল মোক্ষ বা নির্বাণ মেলে, রূপান্তর হয় না। আর সক্রিয় বিশ্বাত্মার উপলব্ধি হলে সবই দেখায় সেই আত্মা, সবই হয়ে যায় আমি, আমিই ভগবান, ইত্যাদি। কিন্তু এখানে বিপদ এই যে এই "সোহহং" ভাবের মধ্যে আমার অহং ভাবটা প্রকট হয়ে ওঠে। কারণ এই "আমি" তো কোনো ব্যক্তিগত আমি নয়, যেমন আমার আমি তেমনি সকলেরই আমি। এই বিপদকে এড়াবার উপায় হলো এই কথা স্মরণ করা যে ভগবানও সেই মা, এই ব্যক্তিগত "আমি"টা সেই মায়েরই সন্তান, তাঁর সঙ্গে অভিন্ন হলেও স্বতন্ত্রভাবে তাঁর সন্তান, তাঁর দাস, তাঁর যন্ত্র। তাই তোমাকে বলি যে কেবল বিশ্ব চেতনায় আত্মার উপলব্ধিতে থেমে যেও না, সেই সঙ্গে এই কথাটিও স্মরণ করবে যে সকল কিছুই হলো মা।

১৩-১০-১৯৩৩

×

অদ্বিতীয়ের বা ব্রহ্মের মধ্যে বিলীন হয়ে যাবার অনুভূতির দ্বারা জ্ঞানমার্গে যাওয়া সম্ভব, কিন্তু এই শর্তে যে ওখানেই তুমি থামবে না ওকেই

সর্বোচ্চ সত্য বলে জেনে, কিন্তু আরো এগিয়ে গিয়ে উপলব্ধি করবে যে সেই অদ্বিতীয় হলেন পরা মাতা, যিনি শাশ্বতের চিৎশক্তি স্বরূপা। অপরপক্ষে যদি তুমি পরা মাতার মাধ্যমে অগ্রসর হও তাহলে তিনিই তোমাকে নীরব ব্রহ্মের এবং সক্রিয় ব্রহ্মের মধ্যেও মুক্তি দিয়ে দেবেন যাতে তুমি একই অবিভাজ্য সত্যে অনায়াসে পৌঁছতে পারবে। সেই সঙ্গে তোমার মন যে ভগবানকে ও তাঁর অভিব্যক্ত সৃষ্টিকে আলাদা ক'রে দেখে তাও ঘুচে যাবে, দুইএর মধ্যে কিছু ফাঁক থাকাতে যে প্রহেলিকার সৃষ্টি হয় তা আর থাকবে না।

×

পরমাত্মার দুটি দিক, নিষ্ক্রিয় ও সক্রিয়। প্রথম অবস্থাটি হলো বিশুদ্ধ, বিশাল, অটল, নীরব, নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম। দ্বিতীয় অবস্থাটি হলো বিশ্বআত্মা, বিশ্বগত ও ব্যক্তিগত। ইনিই হলেন মা, এঁর সঙ্গে তুমি একাত্ম হতে পারো। মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা ব্যক্তিগত জিনিস, সুতরাং তা চৈত্যসত্তার সম্পক।

ভগবতী-শক্তি ও ঈশ্বরে শ্রদ্ধাবিশ্বাস

আমাদের সকল ক্ষমতার পিছনে ভগবতী শক্তির উপর আস্থা থাকা চাই এবং তাঁর অভিব্যক্তিকে সম্পূর্ণ করা চাই। এই বিশ্বদেবী শাশ্বতকাল হতে সৃষ্টিকারিণী আত্মিক সর্বশক্তিসম্পন্না, এঁর কাছে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়। এঁর হাতে রয়েছে সকল শক্তি, সর্বদক্ষতা, সর্ববিজয়, সর্বপূর্ণতা ও সর্বসিদ্ধি। ইনি হলেন মহেশ্বরী, চূড়ান্ত জ্ঞানের ঈশ্বরী, আমাদের কাছে এনে দেন সত্যের পূর্ণ বিশালতা, আপন অতিমানস বৃহত্ত্ব ও জ্যোতি; ইনি হলেন মহাকালী, পরমা শক্তিময়ী, সকল অধ্যাত্মশক্তি ও তপঃশক্তি তার মধ্যে নিহিত, ক্ষিপ্র সংগ্রামজয়ে ইনি অট্টহাস্যের দ্বারা মৃত্যুকে ও পরাজয়কে ও অজ্ঞানতাকে দূর করেন; ইনি হলেন মহালক্ষ্মী, পরম স্নেহপ্রেমময়ী ও আনন্দময়ী, পরম কৃপাময়ী, আশ্রয় ও সর্বপ্রকার আশিষদায়িনী; ইনি হলেন মহাসরস্বতী, চরম নৈপুণ্য ও কার্যকুশলতাময়ী, যোগঃ কর্মসু কৌশলম্ এঁরই যোগ, এঁরই দ্বারা দিব্যজ্ঞান জীবনের ক্ষেত্রে প্রযুক্ত হয়ে জীবনকে সুখ

ও সঙ্গতিপূর্ণ করে। ইনি শাশ্বত ঈশ্বরীর সর্বপ্রকার গুণসম্পন্না, এঁর ক্রিয়াতে হয় সকল সত্তার ভিতরকার সকল শক্তির পরিপূর্ণতা এবং বিশ্বে ভগবৎ ইচ্ছার সঙ্গে পূর্ণ সঙ্গতি ও ঐক্য। এঁর উপস্থিতিতে ও ক্রিয়াতে আমাদের সত্তা পূর্ণ হয়ে ওঠে এই মহাশক্তির প্রতি শ্রদ্ধার ফলে।

এঁর পিছনে আছেন ঈশ্বর, তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা থাকবে আমাদের পূর্ণ যোগে কেন্দ্রস্বরূপ হয়ে। সেই শ্রদ্ধাকে পূর্ণতায় আনতে হবে যাতে বিশ্বের সকল কাজই আত্মজ্ঞানে ও প্রজ্ঞায় পরিণত হয়ে ওঠে, যাতে কোনো কিছুই বৃথা না হয়, যাতে ঈশ্বরের প্রভাবে সকল কাজই সুসম্পন্ন হয়, যাতে তাঁর সহায়-তায় যা কিছু করা হয়েছে ও করা হবে সমস্তই তাঁর প্রভাবে অভ্রান্তরূপে পরিচালিত হয় এবং আমাদের জীবনের সকল কাজ সার্থক হয়। জ্ঞানের উন্মীলনের সঙ্গে সঙ্গে এই শ্রদ্ধা আরো কার্যকরী হবে এবং আমরা নিঃ-সন্দেহে দেখতে পাবো যে সকলই ঘটছে একমাত্র তাঁরই ইচ্ছাতে, সেই ইচ্ছা পরমতম প্রজ্ঞার। সেই শ্রদ্ধা চরমে উঠলে আমরা ঈশ্বরের উপস্থিতি অনু-ভব করব এবং জানবো যে আমাদের সকল অস্তিত্ব ও চেতনা ও চিন্তা ও ক্রিয়া তাঁরই হাতে রয়েছে এবং তাঁরই দ্বারা পরিচালিত হচ্ছে। এই শ্রদ্ধার চরম ফল হবে এক দিব্যশক্তির পূর্ণ প্রতিষ্ঠা। তখন দিব্য জ্যোতি-র্ময়ী অতিমানস মহাশক্তির প্রকাশ ও অভিব্যক্তি ঘটবে।

×

ভগবানই পরম প্রভু---পরমাত্মা সর্বদা নিষ্ক্রিয় থেকে সাক্ষীস্বরূপ হয়ে সব কিছুকে সমর্থন করছেন---এ হলো তাঁর স্থিতিয় দিক। আবার তাঁর সক্রিয় গতীয় দিকও আছে---যাঁর পিছনে এই মা। এ কথা ভুললে চলবে না যে মায়েরই ভিতর দিয়ে সব কিছু মিলবে।

১-৯-১৯৩৩

চিৎশক্তি, জীবাত্মা, আত্মা ও অহং

চিৎশক্তি বা ভগবৎ চেতনা, তিনিই এই মা---জীবাত্মা তাঁরই একটু-খানি অংশ, চৈত্য বা আত্মাটুকু হলো তারই একটু স্ফুলিঙ্গ। আর অহং

হলো ঐ চৈত্য বা জীবাত্মার বিকৃত প্রতিফলন। তাই যদি বলে থাকো তাহলে তা ঠিকই কথা।

আত্মা ও জগন্মাতা

এই পৃথিবীতে প্রত্যেকটি আত্মার পক্ষে একথা সত্য যে জগন্মাতারই সে একটি অংশ, এখানকার অজ্ঞানতার ভিতর দিয়ে সে অতিক্রম ক'রে চলেছে, যাতে অভিজ্ঞতার শেষে আপন সত্তার সত্যকে উপলব্ধি ক'রে এখানে সে ভগবানের অভিব্যক্তির যন্ত্রস্বরূপ হয়ে কাজ করতে পারে।

×

প্র ঃ আপনি "মা" বইখানিতে বলেছেন যে "মা বিশ্ব মহা-শক্তি রূপে বিশ্বের ও পার্থিব বিবর্তনের ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে সব কিছু নিয়ন্ত্রিত করেন তাঁর দৃষ্টি ও শক্তি দিয়ে, এখানে তিনি সকল দেবতার ঊর্ধ্বে থেকে আপন শক্তিতে ও ব্যক্তিত্বে ক্রিয়া করেন, নিজের বিভূতিকে নিম্ন জগতে প্রেরণ করেন সকল কিছু পরিচালনা করতে, সংগ্রাম করতে ও জয় করতে, ঘটনা-চক্র পরিবর্তন করে দিতে এবং ব্যক্তিগত শক্তির ক্রিয়াকেও প্রভাবিত কবতে।" এ কথার অর্থ কি এই যে বিগত বিশ্বযুদ্ধ বা বোলশেভিক বিপ্লব বা এখানকার সত্যাগ্রহ আন্দোলন প্রভৃতি সব কিছুই কি মায়ের দ্বারা কোনোরূপে সম্পাদিত হয়েছে?

উ ঃ বিশ্ব পরিকল্পনারই অন্তর্গত এই সব ঘটনা বিশ্বময়ী মহাশক্তির দ্বারাই সংঘটিত হয় এবং মানুষেরা প্রকৃতির শক্তির প্রেরণাতে সেই কাজ-গুলি সম্পন্ন করে।

১-৬-১৯৩৩

মায়ের শক্তিদের নানা মূর্তি

মানুষেই দেবতাদের মূর্তি গড়ে এবং দেবতারা তা মেনে নেন কিন্তু মানুষের মনের মধ্যে তার পরিকল্পনা আসে দেবতাদের স্তরেরই প্রেরণা থেকে। সকল সৃষ্টিরই দুই দিক আছে, সাকার ও নিরাকার, দেবতারাও সাকার এবং নিরাকার, কিন্তু এক দেবতা অনেক রকম রূপ নিতে পারে, যেমন এখানে যিনি মহেশ্বরী ওখানে তিনি প্যালাস এথেনি। মহেশ্বরীরও নানা ভাবে নানা মূর্তি, যেমন দুর্গা, উমা, পার্বতী, চণ্ডী ইত্যাদি। দেবতারা মানুষের মতো রূপে সীমাবদ্ধ নয়—মানুষও তাঁদের মানুষের আকারে দেখে না।

কৃষ্ণ—মহাকালী

মা আছেন তাঁর বিশ্বময় শক্তিতে সকল বস্তুতে আর সকল দেবতাতে, কারণ মা এবং মায়ের অংশ ছাড়া কোনো কিছুই অভিব্যক্ত হতে পারে না। সাধক তাঁর Visions and Voices বইখানিতে বলতে চেয়েছেন যে ঈশ্বর এবং ভগবতী-শক্তি একই সত্তা দুই বিভিন্ন দিক নিয়ে, তাই তিনি তাকে দেখেছেন কৃষ্ণ-মহাকালী মিলিত রূপে এক মহা অভিব্যক্তিতে।

২০-১০-১৯৩৬

দুর্গা

দুর্গার মধ্যে রয়েছে মহেশ্বরী ও মহাকালী দুইএরই চরিত্র, মহালক্ষ্মীর ভাব তার মধ্যে নেই। কৃষ্ণ ও মহাকালীর মিলন এই যোগের পক্ষে খুবই ফলপ্রদ শক্তিদায়ক, সুতরাং তোমার চেতনাতে যদি দুই মিলে থাকে, তা খুব ভালো লক্ষণ।

২১-৩-১৯৩৮

×

দুর্গার সিংহ হলো দিব্য চেতনার প্রতীক, তা ক্রিয়া করে দেহ-প্রাণের দিব্যত্বপ্রাপ্তির মাধ্যমে ও প্রাণ-প্রবেগের শক্তিতে।

×

সিংহ হচ্ছে দেবী দুর্গার শক্তি, জগন্ময়ী মাতার বিজয়ী রক্ষাকর্ত্রী রূপ।

দৈবশক্তির দ্বারা পরাজিত, বিনষ্ট অসুরের (দেবতাদের শত্রু) প্রতীক হচ্ছে নরমুণ্ড।

মহাকালী ও কালী

মহাকালী ও কালী এক নন। কালী নিকৃষ্টতর রূপ। উচ্চতর স্তরে মহাকালী সাধারণতঃ সোনার রংয়ে আবির্ভূত হ'ন।

×

কালী, শ্যামা প্রভৃতি হলো প্রাণসত্তার স্তরে মায়ের সাধারণ রূপ; অধিমানসের স্তরে যিনি আসল মহাকালী তিনি কালো কিংবা ভীষণা মূর্তি নন, তাঁর সে মূর্তি অতীব সুন্দর ও স্বর্ণাভা মণ্ডিত, যদিও অসুরদের কাছে তিনি ভয়াবহ।

১০-২-১৯৩৪

×

প্র ঃ আজ প্রার্থনায় বসে মা কালীর মূর্তি দেখলাম। তিনি কালো বর্ণা এবং নগ্নমূর্তি, শিবের উপর পা দিয়ে রয়েছেন, যেমন কালীমূর্তি হয়ে থাকে। কালীকে এ ভাবে দেখা যায় কেন, কোন স্তরে তিনি এইরূপে থাকেন?

উঃ প্রাণের স্তরে। সেখানে তিনি বিনাশিনী শক্তি, প্রকৃতিশক্তির

প্রতীক, চারিদিকে অজ্ঞানতা ও নানা বিপত্তি, তারই বিরুদ্ধে ভেঙেচুরে তিনি সংগ্রাম করতে করতে অন্ধ হয়ে শেষে ভগবানেরই বুকে পা দিয়েছেন/-- তখন তাঁর সম্বিৎ ফিরে এসেছে এবং সংগ্রামও শেষ হয়েছে। এই হলো ঐ প্রতীকের তাৎপর্য।

৯-২-১৯৩৪

মিত্র

মিত্র হলেন দুই শক্তির সহযোগে--মহালক্ষ্মী ও মহাসরস্বতী।

মহাসরস্বতীর স্পর্শ

প্র ঃ মানুষের মস্তিষ্কের মধ্যে যে গভীর খাঁজ কাটা হয়েছে, মানুষের হৃৎপিণ্ডের মধ্যে যে সুস্পষ্ট দেয়াল দেওয়া আছে, এই সব আশ্চর্য-কারিগরির কাজ কি মহাসরস্বতীর প্রভাবে হয়েছে?

উ ঃ হাঁ--সমস্ত সূক্ষ্ম কাজের মধ্যেই মহাসরস্বতীর স্পর্শ আছে।

১৯-৯-১৯৩৩

সাধনার বর্তমান ক্রিয়া

প্র ঃ এটা কি সত্য যে এখানে আমাদের সাধনাতে মায়ের মহাসরস্বতীর দিকটাই বেশির ভাগ ক্রিয়া করছে?

উ ঃ বর্তমানে সাধনা নেমেছে দৈহিক চেতনার স্তরে--কাজেই এখন এখানে মহেশ্বরী ও মহাসরস্বতীর যুগ্ম ক্রিয়া হচ্ছে।

২৫-৮-১৯৩৩

জগন্মাতার নামে একটি মন্ত্র

ওঁ আনন্দময়ি চৈতন্যময়ি সত্যময়ি পরমে

শ্রীঅরবিন্দ

৩

মাকে নানা আলোতে ও নানা রূপে দেখা

মাকে নানা আলোতে ও নানা রূপে দেখা

মায়ের আলো

মা তাঁর নিজের ভিতর থেকে সকল রকম আলোরই প্রকাশ করেন।

বিভিন্ন প্রকারের আলো

আলো একটা সাধারণ কথা। আলো মানে জ্ঞান নয়, একটা দীপ্তি যা উপর থেকে এসে মানুষের সত্তাকে অন্ধকারমুক্ত করে।

কিন্তু এই আলো হয় বিভিন্ন প্রকারের, যেমন সাদা আলো মায়ের, মৃদু নীল আলো শ্রীঅরবিন্দের, সোনালি আলো সত্যের, চৈত্য আলো গোলাপী, ইত্যাদি।

১৩-১০-১৯৩৪

মায়ের সাদা আলো

আলোগুলি হলো মায়ের শক্তির আলো——বহু সংখ্যাতে। সাদা আলো তাঁর আপন বিশিষ্ট শক্তির, মূল দিব্য চেতনার আলো।

১৫-৭-১৯৩৪

×

সাদা আলো হলো মায়ের আলো, যা তাঁকে সর্বদাই ঘিরে থাকে।

২২-৮-১৯৩৩

×

মৃদু নীল আলো হলো আমার, আর সাদা আলো মায়ের (কখনো সোনালিও হয়)। লোকে অনেকেই সাধারণত দেখে মাকে ঘিরে আছে সাদা আলো কিংবা সাদা ও মৃদু নীল আলো দুই রকমই।

৪-৯-১৯৩৩

×

সাদা আলোটি মায়ের আলো। যেখানেই তা নামে বা প্রবেশ করে সেখানে আনে শান্তি, পবিত্রতা, নীরবতা, উচ্চশক্তির দিকে উন্মীলন। নাভির নিচে যদি আসে, তার মানে তা নিম্ন প্রাণসত্তাতে কাজ করছে।

৩১-৭-১৯৩৪

×

হৃদয়ের মধ্যে সাদা আলোর রশ্মি অনুভব করার বিশেষ গুরুত্ব আছে—কারণ তা মায়ের সাদা আলোর রশ্মি যা হৃদয়কে আলোকিত করে, আর এই সাধনাতে তার শক্তি খুব বেশি। আর যে বোধির কথা সে বলেছে তা আভ্যন্তর চেতনা জাগার লক্ষণ—ঐ চেতনা জাগা যোগের পক্ষে বিশেষ প্রয়োজন।

২৮-৭-১৯৩৭

×

আভ্যন্তর পুরুষে মায়ের আলো সর্বদাই বিরাজ করে।

×

ওটি হলো দিব্য চেতনার আলো (সাদা আলো, মায়ের চেতনা) প্রাণসত্তার মধ্যে। নীল হলো উচ্চমানস, সোনালি হলো দিব্য সত্য। সুতরাং ওর অর্থ প্রাণসত্তা উচ্চমানস ও দিব্য সত্যকে নিয়ে মায়ের আলোতে বিকাশ পাচ্ছে।

×

তুমি হয়তো দেখেছো সাদা আলোতে মণ্ডিত মায়ের অতিভৌতিক দেহ, সাদা আলোটি দিব্য চেতনার ও শক্তির (চিৎশক্তির) যা বিশ্বের পিছনে কাজ করছে।

৩০-১-১৯৩৫

×

প্র ঃ আজ দেখলাম যে মা যেমন প্রণামের ঘরে এসে বসলেন অমনি তাঁর ডাইনে বাঁয়ে সাদা আলোর লীলা। এর কি বিশেষ কিছু কারণ আছে?

উ ঃ না। ও মায়েরই সাদা আলো, সর্বদাই তাঁকে ঘিরে থাকে।

৮-৮-১৯৩৩

×

প্র ঃ আজ প্রণামের ঘরে ধ্যানে বসে দেখলাম এক পর্বত-শ্রেণী, তার থেকে সাদা আলো বিচ্ছুরিত হচ্ছে। এর অর্থ কি? এরূপ স্বপ্ন কোন স্তরের?

উ ঃ মনের। পর্বত হলো নিচে থেকে উপরে ওঠার প্রতীক। সাদা আলো হলো মায়ের আলো, অর্থাৎ দিব্য চেতনার আলো উপর থেকে আসছে।

৭-৮-১৯৩৩

শ্বেত পদ্ম

শ্বেত পদ্ম মায়েরই প্রতীক পুষ্প, দিব্য চেতনার ফুল।

১৫-৪-১৯৩৩

মায়ের হীরক জ্যোতি

(১) ঐ হীরক জ্যোতি মানে মায়ের মূল তেজদীপ্তি।

(২) হীরক জ্যোতি আসে দিব্যচেতনার বুকের ভিতর থেকে এবং যেখানে তা বিচ্ছুরিত হয় সেখানে দিব্য চেতনার উন্মীলন আনে।

(৩) হীরক জ্যোতি নিয়ে মায়ের আসা মানে ভগবৎ শক্তি তোমার মধ্যে তা ঘটতে দিলেন।

(৪) মায়ের হীরক জ্যোতি হলো পূর্ণ বিশুদ্ধি ও শক্তির জ্যোতি।

(৫) হীরক জ্যোতি হলো ভগবানের কেন্দ্রস্থ চেতনা ও শক্তির জ্যোতি।

×

হীরা হলো মায়ের শক্তি ও জ্যোতির প্রতীক—তার আলোর বিচ্ছুরণ মানে তাঁর চেতনার তীব্রতম অবস্থা।

১৩-১১-১৯৩৬

মায়ের মহাকালী রূপের স্বর্ণাভা

মায়ের আলো হলো সাদা, বিশেষত হীরার মতো সাদা। মহাকালীর আকৃতি সাধারণত সোনালি, অতি উজ্জ্বল স্বর্ণাভাযুক্ত।

১২-১০-১৯৩৫

×

সোনালি আলো দিব্য সত্যের, সাধারণ মনের উপরকার স্তরের—যা অতিমানস থেকে আসে। এটি মহাকালীরও আলো, মনের উপরে। মায়ের সাদা আলোর মতো এই সোনালি আলোও প্রায়ই মায়ের দেহ থেকে নির্গত হতে দেখা যায়।

১৭-৯-১৯৩৩

×

প্র ঃ শুনতে পাই যে কালীর গায়ের রং কালো এবং তাঁর চারটি হাত। কিন্তু আমার ভিতরের দৃষ্টিতে দেখলাম তাঁর উজ্জ্বল সাদা রং আর দুটি মাত্র হাত। এমন কেন দেখলাম ?

উ ঃ কালো রংএর কালী হলেন প্রাণের স্তরে মহাকালীর বিকাশরূপ—কিন্তু নিজে মহাকালী অধিমানসের স্তরে যখন আছেন তখন সোনালি বর্ণের। তুমি মাকে দেখেছ তাঁর নিজের রংএ এবং মহাকালী শক্তিতে, কিন্তু মহাকালীর প্রকৃত রূপটি দেখনি।

২৬-৯-১৯৩৩

সোনালি ও হীবক আলোব ক্রিয়া

সোনালি আলোর রেখায় ঘেরা মানে তা উচ্চ দিব্যসত্যের আলো হৃদয়াকাশ জুড়ে আছে, আর মায়ের হীরক আলো সেই আকাশে প্রবেশ করছে। এর থেকে বোঝায় যে ঐসব শক্তি কাজ করছে চৈত্য-ভাবময় কেন্দ্রে।

১৭-১২-১৯৩৬

মাকে নানারূপে দশন ও অনুভূতি

প্র ঃ কাল সন্ধ্যায় মা যখন দর্শন দিতে নামলেন, তখন তাঁর মুখ দেখলাম উষাকালের সূর্যোদয়ের মতো লাল ও উজ্জ্বল জ্যোতির্ময়। এই লাল আলোর অর্থ কি ?

উ ঃ লাল আলো মানে বাস্তবের পরিস্থিতিতে তাঁর প্রেমের বিকাশ।

৫-৬-১৯৩৩

×

প্র ঃ আজ প্রণামের ঘরে মা নেমে আসার আগে ধ্যানে বসে দেখলাম, মা যেন গোলাপী শাড়ি পরে মাথায় "দিব্য প্রেমের" ফুল গুঁজে উপর থেকে নামছেন। এর তাৎপর্য কি?

উ ঃ এ হলো দিব্য প্রেমের অবতরণের প্রতীক রূপ।

৫-৬-১৯৩৩

×

প্র ঃ দুদিন আগে স্বপ্নে দেখলাম আমি ঘরের বিছানাতে শুয়ে আছি, তখন মা ঐ ঘরে ঢুকলেন একটি গোলাপী রং এর ঘোড়াকে নিয়ে। আমি ভয় পেয়ে মাকে বললাম যে ঘোড়াটা কামড়ে দেবে, মা বললেন ও কামড়াবে না। এ স্বপ্নের মানে কি হবে?

উ ঃ গোলাপী হলো চৈত্য প্রেমের রং——আর ঘোড়া হলো সক্রিয় শক্তি। গোলাপী ঘোড়ার মানে হলো মা চৈত্য প্রেমের সক্রিয় শক্তি এনে দিলেন।

৩-৮-১৯৩৩

×

প্র ঃ আজ প্রণামের ঘরে ধ্যানে বসে দেখলাম, নীল আলোতে ভরা আকাশ থেকে মসৃণ ও সুন্দর একটি রাস্তা নেমে এসেছে পৃথিবীতে আর মা ধীরে ধীরে ঐ রাস্তা দিয়ে নামছেন। মায়ের দেহ থেকে সাদা ও সোনালি আলো চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ছে। পৃথিবীতে যখন তিনি নামলেন তখন তাঁর দেহ পৃথিবীর সঙ্গে মিশে গেল। আমি হঠাৎ জেগে উঠলাম। এ কি ঠিক দেখেছি?

উ ঃ হাঁ, এ হলো মনের স্তরের দেখা (সাধারণ মন নয়, উচ্চ মানস)। ওর মানে মা জড়ের রাজ্যে নেমে আসছেন তাঁর বিশুদ্ধি ও সত্যের আলো

নিয়ে (সাদা এবং সোনালি)।

৫-৮-১৯৩৩

×

প্র ঃ দুদিন আগে স্বপ্নে দেখেছি মা খুব উঁচু জায়গাতে দাঁড়িয়ে, আর তাঁর সামনে রয়েছে একটা থাম, তার মাথাতে একটি তুলসী গাছ। এতে কি বোঝায়?

উ ঃ বোধ করি এই বোঝায় যে মা এখানে ভক্তির গাছ এনে রোপন করলেন।

৫-৬-১৯৩৩

×

সাপ এক রকমের তেজের প্রতীক---প্রাণরাজ্যের অমঙ্গল শক্তির তেজ, যা লোকে স্বপ্নে সাধারণত দেখে। কিন্তু দিব্য শক্তিও তা হতে পারে, যেমন কুণ্ডলিনী শক্তি, যা সাপের মতো গুটিয়ে থাকে। মায়ের মাথা ঘিরে সাপ দেখা বরং শিবমূর্তিকেই স্মরণ করিয়ে দেয়, যার মানে অসংখ্য তেজরাশি একই মূল অনন্ত তেজকে জড়িয়ে আছে, তারই বিভিন্ন দিক হয়ে।

২৮-১০-১৯৩৬

×

প্র ঃ স্বপ্নে দেখলাম মা আমার কাছে দাঁড়িয়ে। একবার যেমনি তিনি হাসলেন অমনি দেখলাম যে সকল ভুবন তাঁর মুখের মধ্যে, যশোদা যেমন দেখেছিলেন কৃষ্ণের মুখের মধ্যে। আর আমি যেন তার সাক্ষী হয়ে সকল জগতের উপরে উঠে গেলাম। একি সত্যিকারের স্বপ্নানুভূতি, না অন্য কিছুর প্রভাব?

উ ঃ অন্য কোনো প্রভাব নয়, খাঁটী অনুভূতির মতোই মনে হয়।

১০-৬-১৯৩৫

×

প্র ঃ মা যখন বারান্দায় এলেন, হঠাৎ দেখি তাঁর কোলে একটি শিশু, অনেকটা যীশুখ্রীষ্টের মতো দেখতে। খোলা চোখে এক মিনিট ধবে তাই দেখলাম। এ দেখা কি সত্য?

উ ঃ হতে পারে—যীশুখ্রীষ্ট তো মায়েবই সন্তান ছিলেন।

২৫-১১-১৯৩৩

×

তুমি হয়তো উঠেছিলে উচ্চ আধ্যাত্মিক মানসের স্তরে যেখানে মহেশ্বরী তাঁর দিব্য সত্যের শক্তিকে নামিয়ে আনলেন। তাতে স্থূল চেতনাতে বোধ এলো সকল বস্তুতে অদ্বিতীয় চেতনা ও জীবনের অস্তিত্ব, আর দেহকোষ-গুলিতে উচ্চ সত্যেব স্বর্ণালোকের দীপ্তি।

অক্‌টোবর ১৯৩৩

×

প্র ঃ গত রাত্রে স্বপ্ন দেখলাম যে মায়ের দেহজ্যোতি আমার দেহে ঢুকে তার রূপান্তর ঘটাচ্ছে। দুই দেহই স্বাভাবিকের চেয়ে লম্বা আর তার ধোঁয়াটে পাথরের মতো রং। এর তাৎ-পর্য কি?

উ ঃ ভালো তাৎপর্য, ওর মানে মায়ের দিকে দেহচেতনার উন্মীলন। যা দেখেছ তা বোধ হয় অবচেতনের রূপ—তাই ধোঁয়াটে, আর পাথর

মানে জড় প্রকৃতি।

৩০-৯-১৯৩৩

×

প্র ঃ সম্প্রতি লক্ষ্য করেছি সন্ধ্যাতে মা চাতাল থেকে নামবার আগে অনেকক্ষণ সেখানে দাঁড়িয়ে থাকেন। ঐ সময়ে তিনি যেন আমাদের বিশেষ কিছু দেন, আমি একাগ্র হয়ে তা নিতে চেষ্টা করি। কিন্তু আজ হঠাৎ দেখি যে ওখানে মায়েব দেহ অদৃশ্য হয়ে গেল---যেন তিনি নেই। কয়েক সেকেণ্ড পরে আবার দেখতে পেলাম। ঐ সময়ে যেন তিনি আকাশে মিলিয়ে সব কিছুর সঙ্গে এক হয়ে গেলেন। এমন কেন দেখ-লাম ?

উ ঃ মা ঐ সময়ে দাঁড়িযে থেকে কিছু প্রার্থনা বা আস্পৃহা করেন। কাল তিনি কিছুক্ষণের জন্য দেহচেতনাকে ছাড়িয়ে গিয়েছিলেন, তাতেই হয়তো অমন দেখে থাকবে।

২৯-৮-১৯৩২

×

প্র ঃ আজ প্রণাম ঘরে ধ্যানে বসে দেখি মা গভীর একাগ্রতায় নিমগ্ন। এমন কেন দেখলাম ?

উ ঃ মা তাঁর আভ্যন্তর সত্তাতে সর্বদাই নিমগ্ন চেতনাতে থাকেন--তাই অমন দেখা স্বাভাবিক।

৫-৬-১৯৩৩

×

প্র ঃ আজ সন্ধ্যায় মা দর্শন দিতে এলে দেখলাম তাঁকে মেঘের

মতো ঘিরে আছে শ্রীঅরবিন্দের আলো। এ কি সত্য দেখা কিংবা মনের ভুল গড়া কিংবা মিথ্যা স্বপ্নের মতো?

উঃ যদি মায়ের আলো দেখা মিথ্যা বা মনেব ভুল হয়, তাহলে ভগবৎ উপলব্ধি ও সব কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতিকেও মনের ভুল বা মিথ্যা বলতে হয়, আর তাহলে যোগও হয় অসম্ভব ব্যাপার।

৬-৯-১৯৩৩

মায়ের দেহচ্ছটা

লোকে যা মাকে ঘিরে আছে দেখেছে তা প্রথমত যাকে বলে তাঁব দেহচ্ছটা, দ্বিতীয়ত তিনি যখন একাগ্র হন তখন তাঁর ভিতর থেকে যে তেজজ্যোতি বেরিয়ে আসে তাই, যেটা তিনি ছাদে উঠলে প্রায়ই হয়। (দেহ-প্রভা একটা সকলেরই আছে কিন্তু তা অধিকাংশই এমন মৃদু যে কোনো ঔজ্জ্বল্য থাকে না; মায়ের বেলাতে তাঁর প্রভা আলো এবং শক্তি নিয়ে পুরোপুরি দেখা দেয়)। সকলে তা দেখতে পায় না কারণ তা সূক্ষ্মদেহের জিনিস, স্থূলের নয়। তারা তা দেখতে পাবে যদি তাদের সূক্ষ্ম দৃষ্টি কিছু খোলে, আর দ্বিতীয়ত যদি সেই প্রভা যথেষ্ট তীব্র হয়ে বাইরের স্থূল খোলস ভেদ ক'রে আসে। মা অবশ্য নিজে জানেন না যে কেউ তা দেখেছে—কিন্তু আশ্রমের প্রায় ২০।৩০ জন একের পর এক এসে বলেছে তাদের ঐরূপ ছটা দেখার কথা। উচ্চ শক্তি যে জড়ের মধ্যে এসে তাকে প্রভাবিত করছে এ নিশ্চয় তারই লক্ষণ (তাকে অতিমানস বা যে নামই দাও)।

১৫-১১-১৯৩৩

মায়ের প্রতীকচিহ্নের অর্থ

প্রঃ মায়ের প্রতীক চিহ্ন "চক্রটির" অর্থ নিয়ে অনেক ভেবেছি। তার এই অর্থ দাঁড়িয়েছে—ভিতরের কেন্দ্র চক্রটি=পরাৎপর শক্তি। চারটি ভিতরের পাপড়ি=মায়ের

চার শক্তি, অতিমানস থেকে অধিমানস পর্যন্ত। বারোটি বাইরের পাপড়ি-চারটিকে বারো শক্তিতে ভাগ করা অধি-মানস থেকে বোধি ও মন পর্যন্ত। এ কি ঠিক অর্থ হয়েছে?

উঃ মূলতঃ (সাধারণ ভাবে) ঐ বারো শক্তি হলো অভিব্যক্তির জন্য তার প্রয়োজনীয় স্পন্দন। এই বারোটিকে প্রথম থেকেই দেখা যাবে মায়ের মাথার উপর দিকে। বস্তুত সূর্যের রশ্মি ১২টি, ৭টি নয়, ১২টি উপগ্রহ প্রভৃতি নয়।

আর শক্তিগুলির সম্বন্ধে যে বিশ্লেষণ তুমি করেছ তার বিরুদ্ধে আমার বলবার কিছু নেই। যেমন বলেছ তাই ঠিক বলে মেনে নেওয়া যেতে পারে।

১৫-৪-১৯৩৪

×

প্রঃ কাল সন্ধ্যায় দেখলাম মা যখন ছাদে বেড়াচ্ছেন তখন তাঁর দেহ থেকে একটা আলো বেরিয়ে আসছে। সেটা কি জিনিস?

উঃ মায়ের দেহ আলোতে ঘেরা, অনেকেই দেখেছে। সে আলো সর্বদাই আছে।

২৬-৭-১৯৩৩

×

প্রঃ আমি মাকে দেখলাম "অনাসক্তি" ফুলের বর্ণে। তার কি অর্থ হবে?

উঃ তার অর্থ ঐরূপ শক্তিই তিনি তোমাকে দিতে চান কিংবা মায়ের কাছ থেকে ঐরূপ শক্তি পাওয়া তোমার প্রয়োজন।

১০-১-১৯৩৪

×

প্র ঃ দেখলাম মা বসে আছেন বরফঘেরা পাহাড়ের চূড়াতে, আর সেখানে উঠে গেছে একটা সংকীর্ণ রাস্তা, আমি সেই রাস্তায় চলেছি।

উ ঃ ও হলো উচ্চতর চেতনার শুদ্ধতা ও নীরবতার প্রতীক, সেখানে পৌঁছতে হবে সাধনার পথে। পাহাড় মানেই তা বিপজ্জনক জায়গা, খুব সাবধানে সোজা পথ ধরে চলতে হবে যাতে এদিক ওদিক হয়ে পা পিছ্‌লে না পড়ে যাও।

×

প্র ঃ দুপুরে ঘুমিয়ে দেখলাম যে আমি মায়ের কোলে আছি। তিনি আমার মাথাতে হাত রেখে আঙুলেব চাপে আমাব মাথার ব্রহ্ম কেন্দ্র খুলতে চেষ্টা করছেন। আমি যেন সেখান থেকে কিছু পেলাম। তারপর চেতনা হঠাৎ যেন অন্য রাজ্যে চলে গেল। দেহের কোষগুলির মধ্য পর্যন্ত আলোকময় হয়ে উঠেছিল। এর কি ব্যাখ্যা হতে পারে বলবেন?

উ ঃ ব্যাখ্যার কিছু নেই। যা বর্ণনা করেছ তাই: তোমার চেতনা উচ্চ স্তরে উঠে গিয়েছিল, তারপর দৈহিকেব স্তরে নেমে গেল।

৫-৯-১৯৩৪

×

প্র ঃ আমি দেখি মাথার উপর অনন্ত শান্তি প্রসারিত। মা ঐ স্তরের রাণী। সেখান থেকে আলোর বন্যা নেমে আসছে আমার দিকে। আমার উচ্চ সত্তাকে তা ভেদ ক'রে যাচ্ছে বিনা বাধায়। কিন্তু নিচের দিকে তা সংকীর্ণ ধারাতে ঢুকছে ব্রহ্মরন্ধ্র ভেদ ক'রে। এ বর্ণনাতে কি মনে করেন?

উঃ ঠিকই বলেছ। অনেকের বেলা কিন্তু তা ব্রহ্মরন্ধ্রের ভেতর দিয়ে না হয়ে সমগ্র মস্তকের উপরে হয়।

১৩-২-১৯৩৬

×

> প্রঃ মা বসে আছেন তাঁর আসনে। মাথার পিছনে বহু ফনা ধরে আছে এক গোখুরা সাপ, তার সোনালি রং, প্রত্যেক ফনার কেন্দ্রস্থলে ঘোর লাল দাগ।

উঃ গোখুরা সাপ হলো প্রকৃতি-শক্তি; সোনালি মানে সত্য-প্রকৃতি। অনেক ফনা মানে অনেকরকম শক্তি। সম্ভবত মহাকালী শক্তির প্রতীক। ফনার উপর লাল বর্ণ রাজকীয়তার প্রতীক।

২৩-১-১৯৩৭

×

> প্রঃ আমি দেখলাম এক রুক্ষ পাহাড়। সূর্যালোক পড়ে তার কেন্দ্রে একটা গোল ফাঁক দেখা গেল, সেই ফাঁকের মধ্যে দেখলাম পাথরের শিবমূর্তি প্রায় দুই ফুট উচ্চ, সেই শিবমূর্তির ভিতর থেকে মা বেরিয়ে এলেন, তিনি ধ্যানমগ্না। সূর্যালোক পড়লো মায়ের পিছনে। এর অর্থ কি হবে?

উঃ রুক্ষ পাহাড়—দৈহিক সত্তা (স্থূল)।

তার মধ্যে ফাঁক জায়গা হলো সেখানে অধ্যাত্ম চেতনা আসবে বলে।

পাথরের শিবমূর্তি—নীরব ব্রহ্মের বা আত্মার প্রতীক (শান্তি, নীরবতা, বিশালতা, সাক্ষী পুরুষের বিশুদ্ধতা)।

তার ভিতর থেকে ভগবতী শক্তি হলেন ধ্যানমগ্না বাস্তবের রূপান্তরের জন্য।

সূর্যালোক—সত্যের আলোক।

১২-১০-১৯৩৬

×

প্র ঃ বিকালে ঘুমের মধ্যে দেখলাম এক পরমাসুন্দরী রমণী বসে আছেন সূর্যালোকে। সূর্যালোক তাঁকে ঘিরে আছে অথবা সে আলো তাঁর দেহ থেকেই বেরোচ্ছে তা বলতে পারি না। চেহারা ও পোষাক ভারতীয় নয়, ইউরোপীয়ের মতো।

উ ঃ সে কোনো রমণী নয়। রমণীর দেহ থেকে আলো বেরোয় না বা তার উপর আলো পড়ে না। সম্ভবত সবিতা দেবী কিংবা কোনো আলোর শক্তি, মায়েরই বিভিন্ন শক্তিদের মধ্যে কেউ।

২০-১২-১৯৩৫

×

প্র ঃ ক বলছিল যে দুর্গাপূজার দিনে মা দুর্গার ব্যক্তিত্বকে পৃথিবীতে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করেছিলেন।

উ ঃ চেষ্টা নয়, তা নামিয়ে আনা হয়েছিল।

×

প্র ঃ যখন প্রণামে এলাম তখন মাকে দেখলাম স্বয়ং দুর্গা রূপে। জানি না, সেদিন দুর্গাপূজার দিন বলে তাই মনে হলো, অথবা বাস্তবিক এমনি মনে হলো।

উ ঃ এসব হলো দৈহিক মনের চালাকি, সে ভাবে সে খুব চালাক তাই ভিতরকার অনুভূতিকে ঐরূপ ব্যাখ্যা দিয়ে উড়িয়ে দিতে চায়।

প্র ঃ এসব অনুভব এত অস্পষ্ট ও ক্ষণস্থায়ী, আদৌ স্পষ্ট দেখা যায় না।

উ ঃ প্রথম দিকের স্পর্শ ওর চেয়ে আর কি হতে পারে!

×

প্রঃ যেমন দেখুন, আমি শুনলাম ভগবতী মা আমাকে বলছেন, "আমি আসছি", এবং আরো কি কি যেন বললেন তা স্মরণ নেই।

উঃ এতে অন্তত প্রমাণ হচ্ছে যে তোমাব আভ্যন্তবীণ মন প্রাণ বাস্তবোত্তর জিনিসের দিকে উন্মীলিত হচ্ছে। কিন্তু একে যদি তুচ্ছ ক'বে দাও তবে তা বাড়বে কেমন করে!

মাকে দেখা এবং উপলব্ধি

প্রঃ মাকে অন্তরে দেখা বা স্বপ্নে দেখা, তাকে কি উপলব্ধি বলা চলে?

উঃ উপলব্ধি নয়, অনুভূতি। উপলব্ধি হবে যখন ভিতরে মায়ের উপস্থিতি বোধ করবে, তাঁর শক্তি কাজ করছে বোধ করবে--কিংবা সর্বত্র শান্তি ও নীরবতা, বিশ্বময় প্রেম ও সৌন্দর্য ও আনন্দ প্রভৃতি বোধ করবে। দর্শন হলো অনুভূতির অন্তর্গত, তবে যদি উপলব্ধির অঙ্গরূপে সে দর্শন বরাবর স্থায়ী হয়, যেমন তিনি সর্বদা হৃদয়ে বা মাথার উপরে রয়েছেন বোধ হয়, তখন তা উপলব্ধি।

১২-৩-১৯৩৪

দর্শন ও আধ্যাত্মিক উন্নতি

প্রঃ অনেকে মায়ের চারিদিকে আলো দেখে কিন্তু আমি তা দেখি না। কিসে আমাকে তাতে বাধা দিচ্ছে?

উঃ বাধা নয়, এ হলো আভ্যন্তরীণ অনুভবের প্রশ্ন। এর সঙ্গে আধ্যাত্মিক উন্নতির কোনো সম্পর্ক নেই। এমন কেউ কেউ আছে যারা উন্নতির পথে অনেক এগিয়েছে অথচ এমন দর্শন পায় না। আবার অনেকে

আছে যারা সামান্য মাত্র আধ্যাত্মিক পথে চলে গোড়াতেই এমন দর্শনশক্তি পেয়ে যায়।

১-১২-১৯৩৩

×

> প্রঃ ক আমাকে বললে, "পণ্ডিচেরিতে আসার অনেক আগের থেকেই আমি মায়ের নিত্য সংস্পর্শ পেয়েছি। কেবল ধ্যানের মধ্যে নয়, খোলা চোখেও আমি মাকে দেখেছি স্বরূপে, তাঁর সঙ্গে কথা বলেছি, দুঃখের সময় তাঁব সহায়তা পেয়েছি। কিন্তু এখানে আসাব আগে আমি জানতাম না যে এই আশ্রমের মা-ই সেই মা, তিনিই এই মায়ের দেহ ধারণ করেছেন।" এসব কথা আমার বিশ্বাস হয় না, বিশেষত খোলা চোখে মাকে দেখাব কথা, যা কেবল উচ্চ সাধনাতেই হতে পারে।

উঃ কিন্তু এতে অসম্ভব কিছু নেই। এর মানে কেবল এই যে সে তার অন্তর্দৃষ্টিকে বাইরে প্রক্ষেপ ক'রে বাইবের চোখেও দেখছে, কিন্তু সে দেখা এবং কথা শোনা স্থূল চোখের বা স্থূল কানের নয়, তা হলো ভিতরকার দেখা এবং শোনা। এটা প্রায়ই হয়। তাব জন্য "উচ্চ" সাধনার দরকার করে না, বিশেষ গুণ মাত্র।

২-৭-১৯৩৬

×

আপন ইষ্টদেবতাকে দেখা এবং কথা বলা যারা যোগ অভ্যাস করে তাদের পক্ষে খুবই সাধারণ। এই আশ্রমের যারা সাধক তারা অতি বুদ্ধিমান ও সন্দিগ্ধচিত্ত ও বাস্তবধর্মী বলে তাদের তা হয় না। যাদের বেলা হতে পারতো তারাও বাহ্যমনা ও স্থূলমনা হয়ে থাকে বলে এখানকার আবহাওয়া অমনি হয়ে থাকে।

২-৭-১৯৩৬

×

প্রঃ গত রাত্রে মায়ের মূর্তি স্বপ্নে দেখলাম। তা কি সত্য অথবা কল্পনা?

উঃ সত্য মানে কি? মায়ের মূর্তি দেখেছ স্বপ্নের অনুভূতিতে। জাগ্রত অবস্থাতে হলে তাকে বলা যেতো কল্পনা।

৩-৭-১৯৩৩

×

প্রঃ মিথ্যা শক্তিরা কি মায়ের রূপ নিয়ে দেখা দিতে পারে না?

উঃ মিথ্যা শক্তিরা মায়ের রূপ নিতে পারে খারাপ উদ্দেশ্য নিয়ে। তোমার মধ্যে যদি মিথ্যা ভাব না আসে তাহলে তা মনে করবার দরকার নেই।

অবশ্য তোমার চেতনার ক্রিয়াতে তুমি মায়ের সম্বন্ধে স্বপ্ন গড়ে তুলেছ এবং মাকে দেখেছ যদিও তিনি সেখানে ছিলেন না। স্বপ্নের ক্ষেত্রে এমন হয়, মনের অনেক কিছু ধারণা ভাবনা একত্রে জড়িয়ে তাই হয়, যদিও অনুভূতি নয়।

৫-৭-১৯৩৩

×

মা অবশ্য অনেক রকম রূপে দেখা দিতে পারেন, আমিও কিছু কিছু পারি। কিন্তু তাই বলে যে কোনো ভদ্রলোককে আমি বা মহিলাকে মা বলে ধরে নিতে পারো না। স্বপ্নের দেখাকে বিচার ক'রে নিতে হবে। প্রাণের বিচার নয়, তা বোধিমূলক হওয়া চাই।

২৩-৫-১৯৩৫

×

প্রঃ "যোগের ভিত্তি" বইটিতে আপনি বলেছেন, "মা সর্বদা তোমার কাছে থাকেন, মায়ের সঙ্গে তুমি কথা বলো।" মায়ের সঙ্গে কথা বলা কেমন ভাবে হতে পারে?

উঃ ভিতরে ভিতরে কথা বা চিন্তা শোনা যায় ও ভিতরেই জবাব দেওয়া যায়। তবে যে সাধকের মধ্যে অহং, কামনা, দম্ভ, উচ্চাকাঙ্খা প্রভৃতি রয়েছে তার পক্ষে সে কথা নয়, কারণ সে নিজের মনে কথা বা চিন্তা গড়ে তা মায়ের বলা বলে ধরে নিতে পারে অথবা অন্যের কথাকেও মায়ের কথা বলে ভুল করতে পারে।

২-৭-১৯৩৬

×

প্রঃ ভিতরে মায়ের কথা শুনে চিনতে পারা কি খুব সহজ নয়?

উঃ না, মায়ের কথা শুনে চিনতে পারা সহজ নয়।

৮-৭-১৯৩৩

×

প্রঃ কখন নিজেকে মায়ের কণ্ঠ ভিতরে শোনার উপযুক্ত মনে করতে পারি?

উঃ যখন তোমার মধ্যে সমতা, বিচারণা ও যথেষ্ট যোগানুভূতি আসবে—নতুবা যে কোনো কণ্ঠকে মায়ের বলা বলে মনে করতে পারো।

৭-৭-১৯৩৩

×

প্রঃ প্রণামের সময় মায়ের কোলে মাথা রেখে যেন আমি

একটি কণ্ঠের কথা শুনলাম। মনে হলো যেন মা-ই কিছু বললেন। মা কি সত্যই আমাকে ভিতরে ভিতরে কিছু বলেছেন অথবা ওটা আমার মনের মোহ মাত্র?

উঃ মা-ই হয়তো কিছু ভিতরে বলে থাকবেন। এখন সে কথা মা স্মরণ করতে পারলেন না।

২৭-৪-১৯৩৩

হরিদ্রা বর্ণের ঠিক স্বরূপটিব উপর নিভর করে। এ যদি সুবর্ণ বর্ণের মত শুভ্র হয়, তাহলে এ আসে মনেরও উপরের স্তর থেকে, এবং এ দ্বয়ের একত্র সমাবেশ মহেশ্বরী-মহাকালী শক্তির সমন্বয় বোঝায়। উচ্চতর মনের রং হচ্ছে সামান্য রকমের নীল।

×

প্রঃ আমার ঠিক মনে নেই——এটা ঘটেছিল হয় ঘুমের, না হয় ধ্যানের সময়। আমি মা'র কাছে নানা রকমের ফুলে সজ্জিত একটি পাত্র নিয়ে আসছিলাম। প্রণাম করবার আগে আমি মার হাতে দিলাম "দৈবী ভালবাসার" তিনটি ফুল। আমার সাধনার সঙ্গে কি এর কোনও সম্পর্ক আছে?

উঃ এই সম্পর্কে 'তিন' সংখ্যাটির কি মানে বোঝা যায় না। সম্ভবতঃ এর মানে তোমার সত্তার তিন অংশের ভগবানের ভালবাসা পাওয়ার জন্য আকুতি।

×

প্রঃ সেদিন আপনি আমায় বলেছিলেন যে সমাধি অবস্থাতেও যেন সচেতন থাকি। আমি খুব চেষ্টা করেছিলাম, আর তার ফল হচ্ছে এই! একটি জায়গায় যেখানে সাধকরা

সমবেত হয়েছেন তাঁর দর্শনের জন্য, সেখানে একটি পুণ্যবতী মহিলাকে ঢুকতে দেখলাম। তিনি একটি বন্ধ ঘরে ঢুকলেন, যেখানে আমাদের একে একে যেতে হবে। যেমন আমাদের দর্শন দিনে হয়, সেইরকম ভাবে, প্রত্যেকেই সেই ঘরে ২।১ মিনিট থাকতে পেল। সব শেষে এল আমার পালা।

ঘরের ঠিক মাঝখানে সেই পুণ্যবতী মহিলা বসে আছেন অতি সাধারণ পোষাক পরে। তাঁর মুখের দিকে না তাকিয়ে আমি তাঁর কোলে আমার মাথা রাখলাম। তিনি আমার মাথায় হাত রাখলেন, আস্তে আস্তে আদর করতে লাগলেন, আর নিজের মনে বলতে লাগলেন "ও যেন পায়..." ; শেষের কথাটা আমি তখন ঠিক বুঝতে পেরেছিলাম, কিন্তু এখন আর মনে নেই। আধ্যাত্মিক কোনও ক্ষমতার নাম সেটা। তিনি ঐ কথাটা উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গেই আমার মাথার ভিতর দিয়ে সেই শক্তি হঠাৎ আমার মধ্যে প্রবেশ করল।

কয়েক মুহূর্ত পরে তিনি আর এক শক্তির নাম করলেন। ঐ শক্তি খুব জোরে আমায় ধাক্কা দিল—অতি প্রবল ছিল এর বেগ।

কিছুক্ষণ পরে আমি মাথা তুললাম—এই সেই প্রথম, সেই পুণ্যবতী মহিলার মুখের দিকে তাকালাম। তাঁর মুখ ঠিক মায়ের মত। আমি তখন তাঁকে বললাম, "আপনাকে একটি প্রশ্ন করতে পারি কি"? মনে হ'ল তিনি সেটা ঠিক পছন্দ করলেন না, তবুও প্রশ্নটি আমি আবার করলাম। তখন তিনি বললেন, "প্রশ্ন আমি পছন্দ করি না"। (যে দুটি শক্তি তিনি আমায় দিলেন, সেই সম্বন্ধেই প্রশ্ন করতে চেয়েছিলাম।) আমার মনে নেই তার পর আমি কি বললাম। অনেকক্ষণ পরে আমরা দুজনেই চেতন অবস্থায় ফিরলাম—আমরা একসঙ্গেই সমাধি অবস্থায় গিয়েছিলাম। যখন আমরা দ্বার-রক্ষীকে জিজ্ঞাসা করলাম কটা বেজেছে তখনই বুঝলাম কতক্ষণ সময় আমরা এক সঙ্গে কাটিয়েছি। পরে তাঁকে আমি বললাম, "আপনি সমাধিস্থ হয়েছিলেন আর আমি আপনার পিছু পিছু গিয়েছিলাম।

সমস্ত ব্যাপারটা আমার বুদ্ধিগম্য নয়।

১। কে ঐ পুণ্যবতী মহিলা?

২। কেন তিনি তাঁর শক্তি আমায় দিলেন?

৩। সমাধির মধ্যে সমাধি!! নতুন ব্যাপার বটে।

উঃ ঐ পুণ্যবতী মহিলা যে মা, জড়াতীত রূপে, সেটা সহজেই বোঝা যায়। তিনি যে প্রশ্ন পছন্দ করেন না এটা স্বাভাবিক। মা কোনও সময়েই মনের স্তর থেকে করা প্রশ্ন বিশেষ পছন্দ করেন না--বিশেষতঃ যখন তিনি ধ্যানে নিমগ্ন থাকেন, যেমন এই অনুভূতির সময় ছিলেন। উচ্চতর শক্তি কেন দিলেন, এ প্রশ্নটা (তোমার চিরন্তন "কেন") হাস্যকর। শক্তি যা দেন লোকে তা নিয়ে প্রশ্ন করে না, বা কেন দিলেন সে নিয়েও প্রশ্ন তোলে না--পেয়েই সন্তুষ্ট থাকে। সমাধির মধ্যে সমাধি ঘটেছিল, সমাধির নিয়ম অনুসারে--কেননা তোমার সাধনা সমাধির অবস্থাতেই চলছিল। ঘুমের অবস্থায়ও সচেতন থাকলে, এই ভাবে সাধনা চলতে পারে।

×

প্র ঃ অন্তর থেকে আসা কথার উপর কি সম্পূর্ণ ভাবে নির্ভর করা, আর সেইভাবে মায়ের দ্বারা পরিচালিত হওয়া যায়?

উঃ যদি ওটা মায়ের কথা হয়, নিশ্চয়ই। কিন্তু সে বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নিশ্চিত হওয়া দরকার।

৪

মায়ের উপস্থিতি

মায়ের উপস্থিতি

নিরন্তর উপস্থিতি

সর্বদা এই ভাবে থাকবে যেন তুমি ভগবান এবং মায়ের চোখের সামনে রয়েছ। এমন কিছু করবে না, এমন কিছু ভাববে না বা অনুভবে আনবে না যা ঐ উপস্থিতির সামনে আসার উপযুক্ত নয়।

সর্বত্র মায়ের ব্যক্তিগত উপস্থিতি

> প্রঃ আপনি লিখেছেন: "সর্বদা এমনি আচরণ করবে যেন মা সব দেখতে পাচ্ছেন, কারণ বস্তুত তিনি সবক্ষণই আছেন।" আপনি অবশ্য বুঝিয়ে দিলেন যে তার মানে সবত্র তাঁর দৈহিক উপস্থিতি নয় কারণ তা কখনো সম্ভব হয় না। কিন্তু মাকে একথা জিজ্ঞাসা করাতে তিনি বললেন যে বাস্তব ভাবেই তিনি সর্বত্র থাকেন। এই দুই রকম বিরুদ্ধ উক্তির মীমাংসা কি হবে?

উঃ বাস্তব রূপে মানে যদি তুমি চর্মচক্ষে দেখার মতো স্থূল জড়দেহে বলে ধরে নাও, তা অবশ্য হতে পারে না। মাকে যখন তুমি প্রশ্ন করেছ তখন তুমি যে অমন রকমই ভেবে নিচ্ছ তা তিনি বোঝেন নি---তাই তিনি বলেছেন যে তিনি সর্বত্রই আছেন, তার মানে অবশ্য এই যে তিনি তাঁর চেতনাতে সর্বত্র আছেন। দেহটা তো নয়, চেতনাই হলো প্রকৃত সত্তা, সেই হলো ব্যক্তি, দেহটা কেবল আধার এবং ঐ চেতনার কাজ করবার যন্ত্র। মা তাই ব্যক্তিগত ভাবে তাঁর চেতনাতে সর্বত্রই থাকেন। বিশ্বগত উপস্থিতি তো আছেই, তা ছাড়া ব্যক্তিগতও আছে, একই সত্তার দুরকম দিক।

২৫-৮-১৯৩৬

মা লোকের চিন্তা ও কর্ম জানতে পারেন

প্র ঃ আপনি বলেছেন : "সর্বদা এমন আচরণ করবে যেন মা সবই দেখছেন, কারণ বস্তুত তিনি সর্বদাই আছেন"। তার মানে কি এই হবে যে মা আমাদের তুচ্ছ চিন্তাগুলোর কথাও সর্বদা জানছেন, কিংবা কেবল যখন তিনি একাগ্র হন তখনই জানেন?

উ ঃ বলা হয়েছে যে মা সর্বদা উপস্থিত থেকে তোমাকে দেখছেন। তার মানে এই নয় যে তাঁর দেহস্থ মন দিয়ে তিনি সর্বদা তোমার কথা ভাবছেন বা তোমার চিন্তাগুলোকে দেখছেন। তার কোনো প্রয়োজন হয় না, কারণ তিনি তাঁর বিশ্বময় জ্ঞানের দ্বারা সর্বত্র থাকেন ও সর্বত্র কাজ করেন।

১২-৮-১৯৩৩

×

প্র ঃ কোন অর্থে মা সর্বত্র আছেন? বাস্তবের স্তরে যা কিছু ঘটছে সবই কি তিনি জানছেন?

উ ঃ অর্থাৎ লয়েড জর্জ আজ কি কি খেয়েছে বা রুজভেল্ট তার স্ত্রীকে চাকরদের কথা নিয়ে কি বললে তাও পর্যন্ত? বাস্তবের স্তরে এসব ঘটনার কথা মানুষদের জানার মতো "জানতে" তিনি যাবেন কেন? দেহ-ধারণ ক'রে এসে তাঁর কাজ হচ্ছে বিশ্ব শক্তিদের ক্রিয়া সম্বন্ধে জেনে তাঁর কাজের পক্ষে সেগুলিকে কাজে লাগানো; তা ছাড়া আর যা কিছু জানার দরকার তা তিনি ঠিকই জেনে নেন। কখনো বা অভ্যন্তর থেকে কখনো বা দেহস্থ মন থেকে। তাঁর বিশ্বসত্তার মধ্যে সব কিছু জ্ঞানই আয়ত্তে রয়েছে, যখন যেটা দরকার তখন সেটাকে বাইরে এনে তাঁর কাজ সম্পূর্ণ করেন।

১৩-৮-১৯৩৩

×

প্র ঃ একজন বললে মা নাকি আমাদের দৈহিক কাজগুলোও দেখতে পান। কেমন ক'রে তা হতে পারে? তাঁর মনে কি সকল কাজের ছবি ওঠে আর তাই তিনি দেখেন, কিংবা আমরা যখনই যা করছি তা সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চেতনাতে গোচর হয়? কিন্তু সেটা কি তাঁর পক্ষে বিভ্রান্তিকর ও প্রাণান্ত-কর হয়ে দাঁড়াবে না? আর তা কি নেহাৎ স্থূল রকমের টেলি-প্যাথির মতো?

উ ঃ তাহলে ওর কোনো দামই হবে না। সূক্ষ্ম অবস্থাতে, যেমন ঘুমের মধ্যে বা একাগ্রতার মধ্যে ছবির মতো দেখলে কিংবা সাধারণ ভাবে খবর পেয়ে মা অবশ্য দেখতে বা জানতে পারেন কে কি করছে। কিন্তু তার মধ্যে অনেক কিছু, যা আপনা হতে আসে তাও জানবার তাঁর দরকার হয় না, আর সব কিছুকে গ্রহণ করতে থাকলে ব্যাপারটা বিরক্তিকর ও অসহ্য হয়ে ওঠে, আর তাঁর চেতনাকে ঐসব লক্ষ রকমের তুচ্ছ বিষয় নিয়ে অযথা ভারাক্রান্ত হয়ে থাকতে হয়; সুতরাং অমন কাজ কিছুই হয় না। যা জানা দরকার তা হলো তাদের আভ্যন্তরিক অবস্থার কথা, যা তিনি ঠিকই জানতে পারেন।

২৯-৬-১৯৩৭

×

তুমি কএর সম্বন্ধে যা লিখেছ তা ঠিক কথা...মেয়েটি জানে না যে মা অন্যরূপ উপায়ে এসব বিষয়ে জানতে পারেন, আর পরে তাঁর কাছে প্রত্যক্ষে সেই খবর এলে তাঁর সেই জানা কথার বাস্তব সত্যতা প্রমাণ হয়। কিন্তু মায়ের সম্বন্ধে তার এমন বিপরীত ধারণা থাকলে কেমন ক'রে তার উন্মীলন আসবে? ওতে মায়ের সকল প্রভাব থেকে তাকে বঞ্চিত করেই রাখবে।

মা তাকে এই কথা লিখেছেন যে খ তাঁকে কোনো কথাই বলেনি, তিনি আপনা থেকেই ওর আভ্যন্তর সত্তার ভিতরের খবর জেনেছেন, এমন ভিতরের খবর তাঁর কাছে নিত্যই আসে।

মা তাঁর অন্তর্দৃষ্টিতে অনেক কিছু দেখেন আর প্রণামের সময় বা

অন্যান্য সময়ে সাধকদের চিন্তাগুলো তাঁর কাছে পৌঁছয়।...কিন্তু মা সেই সব অদৃশ্য খবরের উপর নির্ভর ক'রে কোনো কিছু করেন না, যতক্ষণ পর্যন্ত তা বাস্তবের খবরে সুনিশ্চিত না হয়, যেমন ঐ চিঠিখানি আসাতে। মা কোন কাজটি কেন করলেন তা কেউই বুঝতে পারে না––যে সব সাধক বাহ্য মনেই থাকে তারা অনুযোগ করে যে মা অন্যায় করলেন, আর যাদের সেটা গায়ে লাগে তারা জোর গলায় তাদের গোপন চিন্তা বা ক্রিয়াগুলির কথা সম্পূর্ণ অস্বীকার করতে থাকে,––এমন অনেকবারই হয়েছে। এটা তোমাকে চুপি চুপি জানিয়ে দিচ্ছি এইজন্য যে তুমি তাহলে বুঝবে যে মায়ের ক-কে অমন চিঠি লেখার মূলে কি আছে।

১০-৯-১৯৩৬

ভিতরে মায়ের উপস্থিতি বোধ

ওকে বলবে যে নিজের অন্তরের মধ্যে ঢুকে সেখানে মায়ের উপস্থিতি বোধ করতে হবে আর হৃদয়ের পিছনে চৈত্যকে জানতে হবে, জ্ঞান ঐখান থেকেই আসবে আর ভিতরকার যা কিছু বাধা তাকে নষ্ট করবার শক্তি ওখান থেকেই মিলবে।

×

মায়ের নিত্য উপস্থিতি বোধ আসে অভ্যাসের দ্বারা। সাধনাতে সাফল্যের জন্য ভগবৎ কৃপা অবশ্যই চাই, কিন্তু সাধনার অভ্যাসই কৃপা অবতরণের রাস্তা তৈরি করে।

তোমার পক্ষে দরকার কেবল বাইরের জিনিস নিয়ে না থেকে ভিতরে প্রবেশ করতে শেখা, মনকে নীরব করা, আর মা তোমার ভিতরে কাজ করছেন তা জানবার জন্য আস্পৃহা করতে থাকা।

সামনে উপস্থিতি

প্র ঃ সন্ধ্যার ধ্যানে আমার হৃদয় থেকে সমর্পণের তীব্র ক্রিয়া হচ্ছিল। তখন দেখলাম মা আমার ঠিক সম্মুখে দাঁড়িয়ে। তাই দেখে আমার পায়ের তলা থেকে, পা থেকে, মূলাধার কেন্দ্র থেকে আস্পৃহার বেগ এলো, আর হৃদয় ও সমগ্র সত্তা থেকে একটা প্রেমপূর্ণ আকূতিপূর্ণ আত্মসমর্পণ পরিপূর্ণ হয়ে উঠতে চাইল। হয়তো চৈত্যসত্তা সামনে চলে এসেছিল, কিন্তু মাকে আমার সামনে দেখলাম কেন, ভিতরে নয় কেন?

উ ঃ তখন চৈত্য ভাব এসেছিল, তার মানে চৈত্যসত্তার একটা প্রভাব সামনে চলে এসেছিল। চৈত্য উন্মীলন পুরোপুরি হলে তখন ভিতরে দেখা যায়। মাকে সামনে দেখার মানে তোমার কাছে তিনি আছেন কিন্তু ভিতরে ঢোকা এখনও বাকী আছে।

১৩-৭-১৯৩৭

হৃৎ-স্পন্দনের মধ্যে উপস্থিতি অনুভব

কিন্তু কেনই বা বলব যে তোমার অনুভব কেবল ভাবাবেগ মাত্র, কিংবা কেনই বা ভাববো যে হৃৎ-স্পন্দনেতে মায়ের উপস্থিতি বোধ করা প্রভৃতি অবাস্তব। ওগুলি তোমার চৈত্য বলেছে আর তাতে তুমি সাড়া দেওয়াতে প্রমাণ হচ্ছে যে তোমার চেতনা প্রস্তুত হয়েছে। মা জানতে পেরেছেন যে তোমার মধ্যে কিছু একটা হচ্ছে, আর তা প্রকৃত উপলব্ধির শুরু—তিনি ওতে নিরুৎসাহ না ক'রে উৎসাহই দিয়েছেন। ভুল জিনিস হলে তিনি কখনই তা বোধ করতেন না।

১৩-৮-১৯৩৪

দিনের মধ্যে উপস্থিতি

দিনের মধ্যে অনেক সময় যদি মায়ের উপস্থিতি বোধ করো, তার মানে তোমার চৈত্যসত্তা সক্রিয় হয়েছে এবং সে তাই বোধ করছে; কারণ চৈত্যের ক্রিয়া ছাড়া এমন সম্ভব হয় না। সুতরাং চৈত্য সামনেই রয়েছে, বহু দূরে নয়।

১৪-৩-১৯৩৫

ঘুমের মধ্যে উপস্থিতি

ঘুমের মধ্যে মায়ের উপস্থিতি বোধ করা আসে জাগ্রতাবস্থায় তা বোধ করার পরে, কিন্তু তার জন্য কিছু সময় লাগে।

১১-১-১৯৩৫

কাজের মধ্যে উপস্থিতি

কাজ করতে করতে মায়ের উপস্থিতি বোধ করা অধিকাংশের পক্ষেই সহজ নয়,—তারা কাজের সময় কাজ করাটাই বোধ করতে থাকে আর মন তাই নিয়েই ব্যস্ত থাকে, ওর জন্য যে নির্লিপ্ততা ও নীরবতার দরকার তা আসে না।

মাকে লেখা ও তাঁর উপস্থিতি বোধ করা

তুমি মাকে কিছু লেখো কিংবা নাই লেখো, মায়ের উপস্থিতি বা নৈকট্য বোধ করা তার উপর নির্ভর করে না। অনেকে মাকে প্রায়ই লিখে থাকে কিন্তু কখনো তা বোধ করে না, আবার কেউ কেউ দৈবাৎ লেখে কিন্তু নিত্য নিকটে বোধ করে।

১১-৬-১৯৩৬

মায়ের উপস্থিতি ও একাত্মতা বোধ

এমন কোনো পারম্পর্যের নিয়ম নেই যে আগে মায়ের উপস্থিতি বোধ আসবে তার পরেই নিজেকে মায়ের বলে বোধ কববে; বরং বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এর উল্‌টোটাই হয়, পরের অনুভবটা খুব প্রবল হলেই তখন আসে উপস্থিতির অনুভূতি। কারণ এ অনুভূতি আসে চৈত্য চেতনা থেকে; আর চৈত্য চেতনার সম্যক স্ফুরণেই নিত্য উপস্থিতি অনুভব করা সম্ভব হয়। চৈত্য থেকে এমন অনুভূতি আসা সত্তার ভিতরকার সত্য বস্তু---এখনও তা সম্পূর্ণ হয়নি বলে তাকে কল্পনা বলে ধরে নেওয়া ঠিক নয়; বরং যতই ওটা বাড়বে ততই সমগ্র সত্তা ঐ সত্যে পূণ হয়ে উঠবে; ভিতরকার ভাব তখন বাইরের চেতনাকে অধিকার করবে এবং তার ছাঁচ বদ্‌লে দিয়ে সেখানেও ঐ সত্যের প্রতিষ্ঠা করবে। যৌগিক রূপান্তরের এই হলো মূল সূত্র---ভিতরের সত্য বাইরে এসে মনকে ও হৃদয়কে ও ইচ্ছাকে অধিকার করে এবং তার মাধ্যমে বাহ্য যন্ত্রাদির অজ্ঞানতাকে অভিভূত ক'রে সেখানেও আভ্যন্তরীণ সত্যের প্রতিষ্ঠা করে।

১৬-৯-১৯৩৬

মায়ের উপস্থিতি ঢাকা পড়া

মায়ের উপস্থিতি সর্বক্ষণই আছে; কিন্তু তুমি যদি নিজের মতলবে চলতে যাও---নিজের মত, নিজের ধারণা, নিজের ইচ্ছা, নিজের দাবীকে ধরেই চলতে থাকো, তাহলে খুবই সম্ভব যে মায়ের উপস্থিতি আড়াল পড়ে যাবে; সেখানে তিনিই তোমার থেকে সরে যাবেন না, কিন্তু তুমিই তাঁর থেকে পিছিয়ে যাবে। কিন্তু একথা তোমার মন ও প্রাণ স্বীকার করতে চায় না, কারণ তারা তাদের কাজের ন্যায্যতা বরাবরই সমর্থন ক'রে যাবে। যদি চৈত্যকে প্রাধান্য দিতে তাহলে এমন জিনিস হতে পারত না; তখন সে যদিও এই আড়াল হওয়া বোধ করতো, তথাপি তৎক্ষণাৎ বলতো: "নিশ্চয় আমারই কোথাও কিছু দোষ হয়ে গেছে, তাই হঠাৎ আমার মধ্যে এমন কুয়াশা ঢেকেছে", এবং তখনই সে এর প্রকৃত কারণ আবিষ্কার করতো।

২৫-৩-১৯৩২

×

মায়ের উপস্থিতি বোধ সরে যাওয়াতে তুমি দুঃখিত হয়েছ, কিন্তু সে বোধ নিশ্চয় বজায় থাকবে যদি তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তা বরাবর নিবেদিত হয়ে থাকে এবং বাহ্য প্রকৃতির মধ্যে তার সঙ্গে সঙ্গতি রক্ষিত হয় কিংবা অন্তত তার সঙ্গে কিছু যোগ থাকে।

কিন্তু যদি তুমি এমন সব কাজ করতে থাকো যাতে তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তার কোনো সায় নেই, তাহলে ঐ সংযোগের অবস্থাটি ক্ষুণ্ণ হবে, আর তার প্রত্যেক দফাতেই তোমার ভিতরকার উপস্থিতির অনুভূতি হ্রাস পেতে থাকবে। বিশুদ্ধি আনবার জন্য দৃঢ়চিত্ত হতে হবে, আর জ্বলন্ত আস্পৃহা রাখতে হবে যা কোনোমতে নিভবে না, তবেই মায়ের কৃপা গিয়ে তার কাজ সফল করবে।

মায়ের উপস্থিতি বোধ

প্র ঃ আমাদের মনের চিন্তা মা জানতে পারেন, কিন্তু তার কথাগুলোও কি জানেন?

উ ঃ মনের সুস্পষ্টতা থাকলে তাও জানেন; নতুবা মোটামুটি চিন্তা-টাই জানেন।

১৯-৫-১৯৩৩

×

প্র ঃ আপনি বলেছেন, "সবদা এমন আচরণ করবে যেন মা তোমার সম্মুখে আছেন, কারণ তিনি সর্বদাই তাই থাকেন",—এ কথার তাৎপর্য কি?

উ ঃ মায়ের একটি বিভূতি সর্বদাই থাকে সাধকের কাছে। আগেকার কালে মা রাত্রে যখন আশ্রমের কাজ না ক'রে সমাধিতে থাকতেন তখন তিনি সকল সাধকের সকল কথাই জেনে নিতেন। এখন আর তার সময় হয় না।

১৬-৭-১৯৩৫

×

প্রঃ এ খুব আশ্চর্যের কথা। আপনারও বোধ হয় তাই হয়। আমাদের রক্ষা করতে।

উঃ আমার বিভূতি হয় কিনা জানি না। আর মায়ের বিভূতি রক্ষা করবার জন্য নয়, সাধকের সঙ্গে মায়ের সম্পর্ক বজায় রাখার জন্য, এবং সে যেমন সাহায্য নিতে চাইবে সেই ভাবে কাজ করবার জন্য।

১৬-৭-১৯৩৫

×

প্রঃ আরো একটু পরিষ্কার করে বলুন কিভাবে মায়ের বিভূতি সম্পক রাখে। আমি তো জানতাম মায়ের সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্পকের কথা, কোনো কিছুর মাধ্যমে নয়। ক যখন বলে যে সে মায়ের স্পশ পায়, তখন কি সে স্পর্শ স্বয়ং মায়ের না বিভূতির? আর মাকে যে নানারূপে স্বপ্নে দেখি, সে কি সব বিভূতি?

উঃ এসব কথা লিখে বোঝানো খুব মুশকিল, কারণ তোমরা এমন অজ্ঞ যে পদে পদেই ভুল বুঝবে। বিভূতি কোনো মাধ্যম নয়, স্বয়ং মা-ই। মা তো আপন দেহেই সীমাবদ্ধ নয়, তিনি নিজেকে বিভূতি রূপে যেমন খুশি বাইরে প্রক্ষেপ করতে পারেন। প্রত্যেক সাধকের সঙ্গে তিনি এইভাবে ব্যক্তিসম্পর্ক রাখেন কিন্তু সে তিনি নিজেই। সাধকের নিজের জানার উপর তা নির্ভর করে না। সাধক যদি তা জানতো তাহলে সে যেমন কীট বা যেমন গর্দভ তেমনি থেকে যেতো। কারণ ভগবান যদি তার পিছনে পর্দার আড়ালে না থাকতেন তাহলে সে যেমন ছিল চিরদিন তেমনি থেকে যেতো। (ক যে মায়ের স্পর্শ পায় তা মায়েরই স্পর্শ, বিভূতির সাহায্যে)।

১৯-৭-১৯৩৫

×

প্রঃ আমরা কখনো কখনো স্বপ্নে মাকে দেখি। সে কি স্বয়ং

তিনি না বিভূতি?

উঃ তাঁর বিভূতি। মা তাঁর স্থূল দেহে কেমন ক'বে স্বপ্নে দেখা দেবেন?

৭-৭-১৯৩৩

×

প্র ঃ বিকেলের ঘুমে আমি প্রায়ই মায়েব সংস্পর্শে আসি। তিনি কি তাঁর বিভূতি পাঠান?

উ ঃ হাঁ, কারণ তাঁর কিছু বিভূতি সবদাই তোমার সঙ্গে থাকে।

১৪-১২-১৯৩৩

মায়ের উপস্থিতি ও দিব্যচেতনা

প্র ঃ মায়ের উপস্থিতি ও দিব্যচেতনা প্রাপ্তির মধ্যে কি কোনো তফাৎ আছে?

উ ঃ দিব্যচেতনা নির্ব্যক্তিকভাবে বোধ কবা যায় নতুন চেতনা রূপে। মায়ের উপস্থিতি তার চেয়ে বেশি কিছু—তিনি থাকেন ভিতরে বা উপরে বা সর্বদেহ ঘিরে সর্বতোভাবে।

৮-৭-১৯৩৫

×

প্র ঃ আমরা মনে করি যে মা-ই আমাদের মধ্যে সাধনা করছেন, হৃদয়ের ভিতর দিয়ে; কিন্তু আমরা তা বোধ করি না কেন? তার জন্য আমাদের ইচ্ছা থাকা চাই।

উঃ পর্দা থাকে, তা যখন সরে যায় তখন মায়ের উপস্থিতি ও তাঁর ক্রিয়া সর্বদাই অনুভব করা যায়।

৭-১-১৯৩৫

×

প্রঃ কখন আর কেমন ক'রে মায়ের উপস্থিতি সর্বদা অনুভব করব?

উঃ প্রথমত, তার জন্য চৈত্যসত্তার নিত্য সক্রিয়তা থাকা চাই, দ্বিতীয়ত দৈহিকসত্তার রূপান্তর ও আধ্যাত্মিক অনুভূতি চাই। প্রাণসত্তার বিপত্তি ছাড়াও দৈহিকের বিপত্তিই প্রধান বাধা যোগচেতনা ও অনুভূতি আসার পক্ষে। দৈহিকের পুরো রূপান্তর হলে এবং উন্মীলন হলে তখন স্থায়ী অনুভূতি সহজ হয়ে যাবে।

১৬-১০-১৯৩৩

×

প্রঃ হৃদয়ে যখন মায়ের উপস্থিতি (ছবি) দেখবো তখন কি নিম্ন প্রকৃতির সব অভ্যাস ও ক্রিয়া বদ্‌লে যাবে?

উঃ ছবি দেখা আর উপস্থিতি বোধ করা এক জিনিস নয়। ছবি না দেখেও উপস্থিতি বোধ করা যায়। কিন্তু কেবল হৃদয়েই নয়, সমগ্র চেতনাতেই উপস্থিতির বোধ আসবে এবং প্রকৃতির সকল ক্রিয়া মায়ের শক্তিতে পরিচালিত হতে থাকবে।

×

প্রঃ (একটি ঘটনা যেটি কিছুদিন আগে ঘটেছিল, সেই সম্বন্ধে) আমার ধারণা ছিল যে মা সঙ্গেসঙ্গেই এই সব জিনিস জানতে পারেন। কেউ কেউ বলেন যে তিনি সব

কিছুই তা স্থূল জগতের বা আধ্যাত্মিক জগতের হোক না কেন, জানতে পারেন। আবার অপরে বলে যে তিনি চেতনা-সংক্রান্ত ঘটনাই জানেন–যেমন যৌন গতি প্রভৃতি কিন্তু স্থূল জিনিস নয়।

উ : হায় ভগবান––তুমি নিশ্চয়ই আশা কর না যে তাঁর মন সারা জগতে সকল রকম স্তরে যা ঘটছে, তারই একটি বিশ্বকোষ? বা এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে––যেমন ধর না কেন, লয়েড জর্জ কাল ডিনারে কি খেয়েছিলেন?

চেতনা-সংক্রান্ত ব্যাপার তিনি অবশ্যই জানেন এমন কি তাঁর বাইরের মন দিয়েও স্থূল জগতের ঘটনা তিনি জানতে পারেন, কিন্তু জানতে বাধ্য নন। এই কথাটাই সত্য, যে তিনি যদি সেদিকে মন দেন, বা যদি তাঁর দৃষ্টি সেদিকে আকষণ করা হয় এবং তিনি জানতে ইচ্ছুক হন, তাহলে জানতে পারেন। কোনও ঘটনা সম্বন্ধে অন্য কেউ কিছু বলবার আগেই, অনেক সময় তাঁর কাছ থেকেই আমি আগে জেনেছি। কিন্তু সাধারণ তাতে সে ক্ষমতা তিনি প্রয়োগ করতে চান না।

১৬-৭-১৯৩৫

×

প্র : মায়ের এইভাবে জানার সম্বন্ধে আমার কৌতূহল বেড়ে গেছে আজকের একটি ঘটনায়। তিনি আমায় একটি ফুল দেন যার মানে "নিয়মানুবর্ত্তিতা"। এই ফুলটাই কেন দিলেন, আমি সেটা ভাবতে লাগলাম। শেষে আমার মনে পড়ল যে গতকাল 'ক' ও 'খ'র সঙ্গে খাওয়ার ব্যাপারে আমি নিয়ম মানিনি।

উ : কোন মুহূর্তে কোন ফুলটা প্রয়োজনীয় বা কার্যকরী হবে সে বিষয়ে মা তাঁর বোধিশক্তি দ্বারা পরিচালিত হন। কখনও এর সঙ্গে চেতনার কোনও বিশেষ অবস্থা বা বাইরের কোনও ঘটনা দেখেও তিনি স্থির করেন, কিন্তু শুধু সেই ঘটনাটুকুই আর কিছু নয়––যেমন ঠিক কি জিনিসটা

করা হয়েছিল বা 'ক' 'খ' কিভাবে এসেছিল, সেটা দেখে নয়। এটা অসম্ভব নয়, কিন্তু এর প্রয়োজন নেই, আর দরকার না থাকলে এটা ঘটে না।

১৬-৭-১৯৩৫

×

মা যখন জড়াতীত স্তরে কাজ করেন বিভিন্ন বিভূতির রূপে বিভিন্ন সাধকের কাছে যান।

×

তোমার অন্তর মাকে চাইবে, তুমি তাঁর দর্শন বা উপস্থিতি উপলব্ধি করতে চাইবে, এটা সাধনার পথে ঠিকই চেতনা। কিন্তু এই মনোভাবের সঙ্গে অধৈর্য্য না আসে। এই মনোভাব স্থির ভাবে দৃঢ় হবে। তাহলে মায়ের উপস্থিতির চেতনা আসা সহজ হবে আর সেটা আরও বাড়বে।

×

প্র ঃ নিদ্রিত অবস্থাতেও কি মায়ের উপস্থিতি সম্বন্ধে সচেতন হওয়া যায়।

উ ঃ যায়, কিন্তু সাধারণতঃ যখন চৈত্য সত্তা প্রবলভাবে কাজ করতে থাকে।

×

প্র ঃ মায়ের কাছে ফ্রেন্‌চে একটি প্রার্থনা জানিয়েছিলাম। মা উত্তর দিলেন "তোমার অন্তরের দ্বার খুলে দাও—–আমাকে সেখানে দেখতে পাবে"। এর ঠিক মানে কি?

উ ঃ মা এটাই বোঝাতে চাইছেন যে অন্তরের দ্বার যদি কিছুটাও খুলে

যায়, তাহলে তুমি বুঝতে পারবে যে সেখানে সব সময়ই এই মিলন ঘটে আছে (যে অনুভূতি তুমি সব সময় পাও উচ্চতর সত্তায়)।

২-৭-১৯৩৫

৫

মায়ের কাছে সমর্পণ

মায়ের কাছে সমর্পণ

সাধনার কেন্দ্রস্থ গুহ্য সূত্র

মায়ের দিকে চৈত্যভাবে উন্মীলিত হয়ে থাকলে কাজের জন্য বা সাধনার জন্য যা কিছু দরকার তা আপনা হতে ক্রমশ আসবে, এই হলো সাধনার অন্যতম প্রধান কেন্দ্রগত গুহ্য সূত্র।

১৩-২-১৯৩৩

×

এ সাধনা উপদেশের দ্বারা হয় না। কেবল যারা আস্পৃহা ও ধ্যানের দ্বারা মায়ের দিকে উন্মীলিত হয়ে ভিতরের দিকে মায়ের কাজ হতে দেবে তারাই এ যোগে সফল হবে।

২১-৬-১৯৩৭

×

এসব জিনিস নিয়ে মনকে উচাটন করা ও সাধারণ মনের দ্বারা সু-ব্যবস্থা আনতে চেষ্টা করা ভুল। মায়ের প্রতি নির্ভরতা ও আস্থা নিয়ে থাকলে চেতনা যখন প্রস্তুত হয়ে উঠবে তখনই উন্মীলন ঘটবে। আপাতত কাজের সময় ও ধ্যানাদির জন্য স্বতন্ত্র সময়ের ব্যবস্থা ক'রে নিতে কোনো ক্ষতি নেই, কিন্তু কেবল ধ্যানেতেই কিছু হয় না। চাই মায়ের প্রতি আন্তরিক আস্থা ও উন্মীলন।

৯-১০-১৯৩৪

তোমার পক্ষে দরকার শুধু আস্পৃহা আর মায়ের দিকে নিজেকে খুলে রাখা, তোমার মধ্যে তাঁকে কাজ করতে দেওয়া, তাঁর ইচ্ছার বিপরীত সব কিছুকে বর্জন ক'রে--আর সকল কাজই করবে মায়ের জন্য এই বিশ্বাস নিয়ে যে তাঁরই শক্তিতে তুমি সব কিছু করতে পারছ। এই ভাবে নিজেকে খুলে রাখলে জ্ঞান ও উপলব্ধি ঠিক সময়ে এসে যাবে।

×

যোগ করতে হলে এই ইচ্ছাটি থাকা চাই যাতে সকল আসক্তি বর্জন ক'রে কেবল ভগবৎমুখী হতে পারো। এই যোগের প্রধান কথা হলো ভগবৎ কৃপার উপরে বিশ্বাস রাখা প্রতি পদে, সর্বক্ষণ ভগবানের দিকে চিন্তাকে নিয়োজিত করা, এবং নিজেকে নিবেদিত করতে থাকা, তাহলে দেখবে সত্তার উন্মীলন হয়ে মায়ের শক্তি আধারের মধ্যে কাজ করছে।

মায়ের দিকে উন্মীলন

মায়ের দিকে উন্মীলিত হওয়া মানে এই যে তোমার মধ্যে মায়ের শক্তি যেন অবাধে কাজ করতে পারে। কিন্তু মন যদি তার আপন ধারণাকে আঁকড়ে থেকে মায়ের আলো ও সত্যকে সেখানে আসতে না দেয়, প্রাণ যদি তার কামনাদি নিয়ে মায়ের সত্য প্রেরণাকে আমল না দেয়, দেহ যদি তার অভ্যস্ত ক্রিয়াদি ও জড়তাকে বজায় রেখে সেখানে মায়ের আলো ও তেজকে ঢুকতে দিতে না চায়,--তাহলে সেখানে উন্মীলন হলো না। অবশ্য সকল দিক দিয়ে অকস্মাৎ এককালে উন্মীলন পুরো হতে পারা সম্ভব নয়, কিন্তু প্রত্যেক অংশে কিছু কেন্দ্রগত উন্মীলন থাকা চাই এবং প্রবল আস্পৃহা বা ইচ্ছা থাকা চাই (কেবল মনেই নয়), যাতে কেবল মায়ের কাজই সেখানে শুরু হতে পারে, তাহলে বাকী যা কিছু তা ক্রমে ক্রমে হবে।

২৮-১০-১৯৩৪

×

মায়ের দিকে উন্মীলিত থাকা মানে সর্বদা শান্ত ও আস্থাবান হয়ে প্রফুল্ল ভাব নিয়ে থাকা—অর্থাৎ কোনো অস্থিরতা বিষণ্ণতা বা আশাহীনতা যেন না থাকে, যাতে মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করতে ও তোমাকে পরিচালিত করতে পারে, যাতে তিনি তোমাকে জ্ঞান ও শান্তি ও আনন্দ দান করতে পারেন। যদি এই ভাবে উন্মীলিত হতে অপারগ হও, তাহলে নিত্য নীরবে আস্পৃহা করতে থাকো যাতে উন্মীলন আসে।

উন্মীলিত হবার সঠিক উপায়

প্রঃ উন্মীলনের প্রকৃত অর্থ কি?

উঃ গ্রহিষ্ণুতা, মায়ের উপস্থিতিকে ও শক্তিকে যাতে গ্রহণ করতে পারো।

এপ্রিল ১৯৩৩

×

প্রঃ উন্মীলিত হবার সঠিক ও অভ্রান্ত উপায় কি?

উঃ আস্পৃহা, প্রশান্তি নিয়ে গ্রহিষ্ণু হয়ে নিজেকে বিস্তার করা, যা কিছু তোমার ভগবানের দিকে যেতে বাধাস্বরূপ হচ্ছে তাকে প্রত্যাখ্যান করা।

এপ্রিল ১৯৩৩

×

প্রঃ কেমন ক'রে জানবো যে মায়ের দিকে ছাড়া অন্য শক্তির দিকে উন্মীলন হচ্ছে না?

উঃ সতর্ক থেকে দেখতে হবে যে কোনো অস্থিরতা বা কামনা বা

অহং তোমার মধ্যে ঢুকছে না।

এপ্রিল ১৯৩৩

×

প্র ঃ মায়ের দিকে প্রকৃত উন্মীলনের কি লক্ষণ?

উ ঃ তখনই তা দেখতে পাবে—বোধ করতে থাকবে একটা দিব্য শান্তি, সমতা, বিস্তার, আলো, আনন্দ, জ্ঞান, শক্তি, আর তখনই টের পাবে মায়ের নৈকট্য বা উপস্থিতি, তাঁর শক্তির ক্রিয়া, ইত্যাদি। এই সব জিনিসের মধ্যে কোনোটিকে বোধ করলেই জানবে যে উন্মীলন হয়েছে—সে বোধ যত বেশি হবে উন্মীলন ততই সম্পূর্ণ হবে।

এপ্রিল ১৯৩৩

সাধনাতে অগ্রগতি

প্র ঃ কোনো সাধক যদি তার প্রকৃতির বাধার জন্য দীর্ঘ-কালেও মায়ের দিকে উন্মীলন আনতে না পারে, তাহলে মা কি তাকে গ্রহণ করবেন না?

উ ঃ এ প্রশ্নের কোনো মানে হয় না। এখানে যারা এই যোগকে অনু-সরণ করছে তাদের সকলকেই মা গ্রহণ করেছেন—কারণ "গ্রহণ" মানে "শিষ্য রূপে এই যোগের সাধনার মধ্যে গ্রহণ"। তবে সাধকের এই যোগে অগ্রগতি ও সিদ্ধিলাভ নির্ভর করবে যতটা পর্যন্ত সে উন্মীলিত হয়েছে তার উপর।

২৪-৬-১৯৩৩

উন্মীলন ও রূপান্তর

প্র ঃ ক বলছে যে মা নাকি তাকে বলেছেন যে ঐকান্তিকতা পুরোপুরি থাকলে একদিনেই রূপান্তর ঘটতে পারে। বুঝতে পারছি না যে পরিবর্তন আনার সুদীর্ঘ প্রক্রিয়া কেমন ক'রে একদিনের মধ্যেই সংক্ষেপে সারা হতে পারে!

উ ঃ ঐকান্তিকতা অর্থে মা বলতে চেয়েছেন অন্য সব প্রভাবকে বাদ দিয়ে কেবল ভগবানের দিকে পূর্ণ উন্মীলন। তেমনভাবে যদি সমগ্র সত্তার সমস্ত দেহকোষগুলি পর্যন্ত ঐকান্তিক হয় তবে দ্রুত রূপান্তর হতে বাধা কি আছে? তা অবশ্য কারো হয় না, যতই কেন কারো আলোকদীপ্ত অংশ সচেষ্ট হোক, কারণ তার সাধারণ অজ্ঞান প্রকৃতি তাতে অন্তরায় হয়—সেই কারণেই প্রয়োজন হয় এত সুদীর্ঘ প্রচেষ্টার।

২৬-৭-১৯৩৪

ক্রমিক উন্মীলন

উন্মীলন সব সময়েই প্রথম থেকে পুরোপুরি ভাবে হয় না—সত্তার একটা অংশ যদি খোলে তো চেতনার অন্যান্য অংশগুলি থাকে তখনও বন্ধ বা অর্ধ-খোলা হয়ে—আস্পৃহা করতে করতে তবে সব খোলে। এমন কি খুব উৎকৃষ্ট শক্তিমান সাধকদেরও পুরো উন্মীলন হতে সময় লাগে; এমনও কেউ নেই যে বিনা সংগ্রামে সব কিছু তৎক্ষণাৎ ছাড়তে পেরেছে। সুতরাং একথা মনে করার কোনো কারণ নেই যে তোমার ডাক কেউ শুনবে না—মা মানব প্রকৃতির ত্রুটিগুলির কথা যথেষ্টই জানেন, তিনি বরাবর তোমাকে সাহায্য করবেন। অধ্যবসায় নিয়ে সর্বদাই মাকে ডাকো, তাহলে দেখবে প্রত্যেক বাধাবিপত্তির পরে কিছু উন্নতি হয়েছে।

২০-৪-১৯৩৫

আভ্যন্তরীণ ও উচ্চতর উন্মীলন

নিত্য স্মরণ মনন করতে করতে তবে সত্তাটি পূর্ণ উন্মীলনের জন্য প্রস্তুত হয়। হৃদয়ের উন্মীলন হলে তখন মায়ের উপস্থিতি অনুভব হতে থাকে, আর উপরে মায়ের শক্তির দিকে উন্মীলন হলে তখন উচ্চ চেতনার শক্তিধারা দেহের মধ্যে নেমে এসে সমগ্র প্রকৃতির পরিবর্তন আনতে কাজ করে।

৭-৮-১৯৩৪

×

এই সাধনাতে মন্ত্র বলতে কেবল মায়ের মন্ত্র কিংবা আমার ও মায়ের নাম। আর একাগ্রতা আনা হৃদয়ে কিংবা মাথায় দুই স্থানেই হতে পারে—প্রত্যেকটির ফল হয় তার নিজস্ব। প্রথমটিতে আসে চৈত্যের উন্মীলন এবং ভক্তি, প্রেম ও মায়ের সঙ্গে মিলন, হৃদয়ে মায়ের উপস্থিতি বোধ এবং প্রকৃতির মধ্যে তাঁর শক্তির ক্রিয়া। দ্বিতীয়টিতে হয় আত্মোপলব্ধির দিকে মনের উন্মীলন, মনের উপরকার চেতনাতে ও দেহোত্তর চেতনাতে উত্থান, আর দেহেতে উচ্চতর চেতনার অবতরণ।

১৩-১০-১৯৩৪

×

এই যোগের পদ্ধতি বলতে তেমন কিছু নেই, কেবল একাগ্রতা আনা, সাধারণত হৃদয়ে, আর মায়ের উপস্থিতি ও শক্তিকে আহ্বান করতে থাকা, যেন তিনি সত্তাটির ভার নিয়ে তাঁর শক্তির ক্রিয়াতে চেতনার রূপান্তর ঘটান। মাথায় কিংবা ভ্রূমধ্যেও একাগ্রতা আনা যায়, কিন্তু অনেকের পক্ষে তা কঠিন হয়। মন যখন নীরব হয়ে যায় আর একাগ্রতা ও আস্পৃহা প্রবল হয় তখন অনুভূতি আসতে শুরু হয়। বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা যত বেশি তার ফলও তত শীঘ্র আসতে পারে। তা ছাড়া কেবল নিজের চেষ্টার উপরে নির্ভর করাই যথেষ্ট নয়, ভগবানের সঙ্গে কিছু সংস্পর্শ স্থাপন করা চাই, মায়ের শক্তিকে ও উপস্থিতিকে পাবার মতো গ্রহিষ্ণু হওয়া চাই।

×

চৈত্য কেন্দ্রের সরাসরি উন্মীলন তখনই সহজ হতে পারে যখন অহং-কেন্দ্রিকতা একেবারে কমে যায় আর যখন মায়ে' প্রতি ভক্তি খুব প্রগাঢ় হয়। একটা আধ্যাত্মিক দীনভাব এবং আনুগত্য ও নির্ভরতা থাকা খুব দরকার।

১৬-৭-১৯৩৬

×

হাঁ, মনকে নীরব করলে তবেই তুমি মাকে ভালোভাবে ডাকতে পারবে আর মায়ের দিকে নিজেকে উন্মীলিত করতে পারবে। তোমার চৈত্য থেকেই অমন শান্তিময় স্পর্শ ঘটেছিল, ওতে তোমাকে প্রস্তুত ক'রে দেয় চৈত্যের উন্মীলন ও সেই সঙ্গে আভ্যন্তরীণ শান্তি ও প্রেম ও আনন্দের আগমন।

১৭-৯-১৯৩৪

×

মায়ের শান্তি রয়েছে তোমার উপর দিকেই—তোমার মধ্যে তা নেমে আসবে আস্পৃহা ও নীরব আত্মোন্মীলনের ফলে। যখন তা প্রাণসত্তা ও দেহকে অধিকার করবে, তখন সমতা আনা সহজ হবে ও পরে তা আপনা আপনি হবে।

২৮-৮-১৯৩৩

অন্য শক্তিদের এড়িয়ে মায়ের শক্তির দিকে উন্মীলন

মায়ের শক্তির দিকে নিজেকে খুলে দাও, কিন্তু সকল শক্তিকে বিশ্বাস কোরো না। এই ভাবে সোজা পথে যদি চলতে থাকো তাহলে এক সময় চৈত্য আরো সক্রিয় হয়ে উঠবে আর উপরের আলো এসে এমন জোর দীপ্তি দেবে যে তখন খাঁটি অনুভূতির সঙ্গে মন ও প্রাণের তৈরি কোনো কিছু মিশ্রণের সম্ভাবনাই থাকবে না। আগেই বলেছি যে এগুলি অতিমানস শক্তি হতে পারে না; কেবল প্রস্তুতির কাজ হচ্ছে ভবিষ্যৎ যোগসিদ্ধি আনার

জন্য।

১৮-৯-১৯৩২

×

মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করুক, কিন্তু সতর্ক থেকো যেন তার জায়গাতে মিশ্রণ বা অন্য কিছু না আসে, অহং-ক্রিয়া যেন বেড়ে না ওঠে কিংবা অজ্ঞানতার শক্তি নিজেকে সত্য বলে জাহির না করে। বিশেষ ক'রে আস্পৃহা রাখো যাতে প্রকৃতির ভিতরকার অন্ধকার ও অচেতনা দূর হয়।

মায়ের প্রতি বিশ্বস্ততা ও আনুগত্য

বিরোধী শক্তি কিছু এলে তাকে নেবে না, তার পরামর্শ শুনবে না, কেবল মায়ের দিকে ফিরে থাকবে, কিছুতে মুখ ফেরাবে না। উন্মীলন হোক বা নাই হোক, মায়ের প্রতি সর্বদা বিশ্বস্ত ও অনুগত হয়ে থাকবে। এসব গুণের জন্য যোগ দরকার হয় না। যে কোনো পুরুষ বা স্ত্রী, যারা সত্য কিছু চায়, তারা অনায়াসে এই মনোভাব আনতে পারে।

সাফল্যের একমাত্র উপায়

তোমার প্রকৃতির একটা প্রধান অংশে রয়েছে একটা অহং-ব্যক্তিত্বের সুদৃঢ় সংগঠন, যা তোমার আধ্যাত্মিক আস্পৃহার সঙ্গে মিশিয়ে রেখেছে আপন গর্ব ও আধ্যাত্মিক উচ্চাকাঙ্খার মনোভাব। এই দৃঢ় মনোভাবটি ভেঙে গিয়ে তার বদলে কিছু সত্য ও দিব্য জিনিসকে ঢুকতে দিতে কখনই সে রাজী হয়নি। তাই যখন মা তোমার মধ্যে কিছু তাঁর শক্তি দিয়েছেন, কিংবা তুমিই নিজের মধ্যে সেই শক্তিকে টেনেছ, তখন তোমার ঐ জিনিসই তাকে তার আপন রাস্তায় কাজ করতে দেয়নি। তোমার ঐ অংশটি চেয়েছে নিজের মনের ধারণা বা অহংএর দাবী অনুযায়ী একটা নিজের মনোমত জিনিস গড়ে তুলতে, "নিজের রাস্তায়", নিজের জোরে, নিজের সাধনা ও

তপস্যার দ্বারা। তার কারণে প্রকৃত সমর্পণ তোমার কখনই হয়নি, নিজেকে মায়ের হাতে মুক্ত ও সরলভাবে কখনই ছেড়ে দাওনি। অথচ এই অতি-মানস যোগে তাই হলো একমাত্র উপায়। যোগী হওয়া, বা সন্ন্যাসী হওয়া, বা তপস্বী হওয়া এখানকার উদ্দেশ্য নয়। উদ্দেশ্য হলো রূপান্তর আনা, আর সে রূপান্তর আসতে পারে কেবল এমন শক্তির দ্বারা যা তোমার শক্তির চেয়ে অনন্তগুণে বৃহৎ; এবং তা হতে পারে কেবল মায়ের হাতে নিজেকে প্রকৃতই একটি শিশুর মতো সঁপে দিলে।

×

কারো বুদ্ধিজনিত জ্ঞান বা মনের বিচার বা প্রাণের কামনা প্রবল থাকার জন্য যদি সে নতুন চৈত্য জীবন পেতে অস্বীকাব করে, যদি মায়ের কোলের নবজাত নিতান্ত শিশুর মতো থাকতে সে না চায়, তাহলে তার সাধনা ব্যর্থ হয়ে যাবে।

×

প্র : আমাদের সাধনাতে কোনো কোনো সময় যখন শান্তি, শক্তি, আনন্দ প্রভৃতি বৃহৎরূপে নেমে আসে তখন আমাদের ক্ষুদ্র অহং তাকে দখল ক'রে নিয়ে জানাতে থাকে যে এবার তবে আমরা মায়ের অতিমানব গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত হবো। এ কি ভুল কাজ নয়?

উ : অতিমানব হতে চাওয়া ভুল কাজ। ওতে কেবল অহংটাই ফেঁপে ওঠে। ভগবান যাতে অতিমানস রূপান্তর এনে দেন তার জন্য তুমি আস্পৃহা করতে পারো, কিন্তু যতক্ষণ মায়ের শান্তি, শক্তি, আলো ও বিশুদ্ধি নেমে এসে তোমার সত্তাকে চৈত্যগত ও আধ্যাত্মিক ক'রে না তুলছে ততক্ষণ তাও পারো না।

২২-২-১৯৩৬

×

প্র ঃ অতিমানসের অবতরণের জন্য আমরা কেমন ভাব বা ধারাধরণ নিয়ে থাকতে পারি?

উ ঃ কেমন রকম ধরন নিয়ে থাকতে হবে তাই নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার নেই। পুরোপুরি বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা, উন্মীলন, মায়ের কাছে আত্মদান, বরাবর শুধু এইগুলোই চাই।

২৩-৯-১৯৩৫

মায়ের কৃপা গ্রহণ

প্র ঃ মায়ের কৃপা কি কেবল সাধারণ ভাবে?

উ ঃ সাধারণও হয় বিশিষ্ট রকমও হয়।

৮-২-১৯৩৪

×

প্র ঃ মা সাধারণ ভাবে যা দেন তা কেমন ক'রে গ্রহণ করব?

উ ঃ কেবল নিজেকে খুলে রাখবে, তাহলে উপযুক্ত সময় এলে যখন যতটা পাওয়া তোমার দরকার ততটা তুমি পাবে।

১০-২-১৯৩৪

×

প্র ঃ ভিতরকার পুরুষই কি মায়ের কৃপার কাজ সমগ্র সত্তাতে গ্রহণ করে?

উ ঃ হাঁ। এপ্রিল ১৯৩৩

×

প্রঃ পুরুষ যদি সমর্থন না করে তাহলে কি অন্যান্য সত্তাও সাধককে মায়ের কৃপা গ্রহণের জন্য সম্মুখবর্তী ক'রে প্রস্তুত করে দিতে অপারগ হয়?

উঃ তা নয়। পুরুষ তখন পিছিয়ে থাকে এবং অন্যান্য সত্তাকে তার স্থানে থেকে কৃপাকে গ্রহণ বা বর্জন করার জন্য ছেড়ে দেয়।

এপ্রিল ১৯৩৩

×

প্রঃ মায়েব কৃপা যখন সাধকের মধ্যে নেমে আসে, তা কি হয় পুরুষের সমর্থনে?

উঃ "পুরুষের সমথন" কাকে বলছ? মায়ের কৃপা নেমে আসে মায়েরই ইচ্ছাতে, পুরুষ তাকে নিতেও পারে বা না নিতেও পারে।

এপ্রিল ১৯৩৩

মায়ের কাছে সমর্পণের প্রয়োজন

সমর্পণ যদি না করো তাহলে মায়ের কাছে উন্মীলনের কোনো মানে হয় না। এই যোগের সাধনাতে আত্মদান বা সমর্পণ করতে বলা হয় এই কারণে যে তা নইলে লক্ষ্যের ধারে কাছে যেতে পারাও অসম্ভব হবে। উন্মীলিত হয়ে থাকার অর্থ যাতে মায়ের শক্তি তোমার উপর কাজ করতে পারে, কিন্তু যদি তুমি নিজেকে সমর্পণ না করো, তখন তার অর্থ এই দাঁড়ায় যে তুমি সেই শক্তিকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দিলে না, কিংবা দিতে রাজী আছো এই শর্তে যে তোমারই নির্দিষ্ট মতে তার কাজ হোক, তার নিজের দিব্যসত্যের মতে নয়। এমন মতলব ঢুকিয়ে দেয় সাধারণত বিরুদ্ধ শক্তিরা কিংবা মনের বা প্রাণের কিছু অহং, যা কৃপা কিংবা দিব্য-শক্তিকে পেতে চায় কেবল নিজের স্বার্থে তাকে প্রয়োগ করতে কিন্তু ভগবৎ উদ্দেশ্যে নয়, ভগবানের কাছে যা নিতে পারে তা নেবে কিন্তু নিজেকে ভগ-

বানের হাতে ছেড়ে দেবে না। কিন্তু প্রকৃত যে ভিতরকার আত্মা সে চায় ভগবানের দিকে যেতে, খুশি হয়ে সমর্পিত হতে সে আগ্রহী।

এই যোগে সমস্ত মানসিক আদর্শ ও উৎকর্ষের অতিক্রম ক'রে যেতে হবে। আদর্শ ও আদর্শবুদ্ধি হলো মনের জিনিস, অর্ধ-সত্য মাত্র; মন নিজের সেই আদর্শকে নিয়েই খুশি থাকে, আদর্শবাদ করছি ভেবে সুখ পায়, এদিকে জীবন যেমন ছিল তেমনি থাকে, অপরিবর্তিত কিংবা কেবল বাহ্য-ভাবে সামান্য পরিবর্তিত। কিন্তু আধ্যাত্মিক সাধক উপলব্ধির প্রয়াস ছেড়ে দিয়ে কেবল আদর্শবাদ নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে না; তার লক্ষ্য কোনো আদর্শের দিকে নয় কিন্তু দিব্য সত্য উপলব্ধির দিকেই তার বরাবরের লক্ষ্য, জীবনপারেও এবং জীবনের মধ্যেও—কিন্তু জীবনেব মধ্যে তা পেতে হলে দরকার মন ও প্রাণের রূপান্তর, যা দিব্যশক্তি বা মায়ের ক্রিয়ার কাছে সমর্পণ ছাড়া আর কোনো উপায়ে হতে পারে না।

নির্ব্যক্তিকের সাধনা তাদেরই পক্ষে যারা জীবন থেকে নিজেকে সরিয়ে নিতে চায়, এবং সাধারণত তারা কোনো উচ্চশক্তির কাছে উন্মীলিত না হয়ে বা সমর্পণ না ক'রে নিজেদের প্রয়াসেই সাধনা করে; কাবণ নিব্যক্তিক কখনো কিছু সাহায্য বা নির্দেশ দেয় না, প্রত্যেককে সে ছেড়ে দেয় যে যেমন পারে আপন প্রকৃতির সামর্থ্য অনুযায়ী চেষ্টা করুক। অপরপক্ষে মায়ের কাছে সমর্পিত ও উন্মীলিত হলে তার ফলে নির্ব্যক্তিকেরও উপলব্ধি আসে আর সত্যেব অন্যান্য সকল দিকেরও উপলব্ধি আসে।

সমর্পণ ক্রমিক বর্ধমান ভাবেই হবে। গোড়া থেকে কেউই পারে না পুরোপুরি সমর্পিত হতে, সুতরাং এটা খুবই স্বাভাবিক যে নিজের ভিতরের দিকে চাইলে দেখতে পাবে তার অভাব রয়েছে। তাই বলে সমর্পণের সংকল্প ও মন্ত্র না নেবার কোনো কারণ নেই, তাই ধরে রেখে অবস্থার পর অবস্থা, ক্ষেত্রের পর ক্ষেত্র পার হতে হবে, প্রকৃতির সর্বাংশে তাকে ক্রমিক প্রয়োগ করতে থেকে।

×

তাহলে তোমার সমর্পণের সংকল্প মাত্র। কিন্তু এই সমর্পণটি হওয়া চাই মাকে—এমনকি তাঁর শক্তির কাছেও নয়, মায়ের নিজেরই কাছে।

৪-১০-১৯৩৬

×

চৈত্য জাগলে সে তারই কাছে সমর্পিত হতে বলবে না, বলবে কেবল মায়ের কাছে সমর্পণ করতে।

×

সব চেয়ে ভালো হয় চৈত্য সত্তার মধ্যে থাকলে, কারণ চৈত্য সর্বদাই মায়ের কাছে সমর্পিত আর অন্য সকল অংশকেই সে ঠিক ভাবে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে। ঠিকভাবে চলবার জন্য একটা কোথাও কেন্দ্রীভূত হওয়া দরকার——কেউবা মনেতে হয় কেউবা মনের উপরদিকে হয়, আবার অন্যেরা হৃদয়ে কেন্দ্রীভূত হয়ে তার মাধ্যমে চৈত্য কেন্দ্রে চলে যায়।

১১-৬-১৯৩৩

কেমন প্রয়াস চাই

সাধকের প্রয়াসের মধ্যে তিনটি জিনিস দরকার, আস্পৃহা, পরিবর্জন, ও সমর্পণ। এই তিনটি যদি করা হয় তাহলে আর যা কিছু তা আপনা হতে এসে যাবে মায়ের কৃপাতে ও তোমার মধ্যে মায়ের শক্তি'র ক্রিয়াতে। কিন্তু এই তিনটির মধ্যে সব চেয়ে বড়ো জিনিস হলো সমর্পণ, যার প্রথম স্বরূপ হবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আর বিপদে ধৈর্য। আস্পৃহা থাকলেই তবে শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস আসবে এমন কোনো নিযম নেই। বরং যদি জড়তার চাপে আস্পৃহা না জাগে তথাপি থাকতে পারে শ্রদ্ধা, বিশ্বাস ও ধৈর্য। আস্পৃহার অভাবে যদি শ্রদ্ধা বিশ্বাস ও ধৈর্য কাজ না করে, তার মানে সাধক তার নিজের চেষ্টার উপরেই একান্ত নির্ভর করেছিল, তার বক্তব্য তখন এই হবে, "ওহো, আমার আস্পৃহাই যখন এলো না তখন আর আমার কোনো আশা নেই, তাহলে মা আর আমার কি করবেন?" কিন্তু এর বদলে তার এই কথা মনে করা উচিত, "হোকগে, আস্পৃহা না থাকলেও আবার এসে পড়বে। কিন্তু তবুও মা রয়েছেন আমার সঙ্গে যদিও আমি তা বোধ করতে পারছি না, এই গভীর অন্ধকারের ভিতর দিয়েও মা-ই আমাকে টেনে নিয়ে যাবেন।" এই হবে সঠিক মনোভাব। যাদের তা থাকে, হতাশা তাদের কোনো ক্ষতি করতে পারে না, এলেও তা ব্যর্থ হয়ে

যায়। একে তামসিক সমর্পণ বলে না। তামসিক সমর্পণের বেলাতে তুমি বলবে, "আমি নিজে কিছুই করব না, যা কিছু করবার তা মা-ই করে দিন। এমন কি আস্পৃহা, পরিবর্জন, সমর্পণেরও কোনো দরকার নেই। ওগুলো আমার মধ্যে মা-ই করে দিন।" দুরকম মনোভাবের মধ্যে বিস্তর তফাৎ। একটা হলো কিছু না করে এড়িয়ে যাবার মনোভাব, আর অন্যটিতে থাকে সাধকের যথাসাধ্য প্রচেষ্টা, কিন্তু যখন বিরুদ্ধ ভাব এসে সব কিছু সাময়িক ভাবে থেমে যায়, তখনও সে বিশ্বাস রাখে যে ওর পিছনেও রয়েছে মায়ের শক্তি এবং উপস্থিতি, আর এই বিশ্বাসের জোরে বিরোধী শক্তিকে ব্যর্থ ক'রে দিয়ে আপন সাধনার গতি ফিরিয়ে আনে।

২৬-১০-১৯৩৬

প্রকৃত আনুগত্য

সাধনাতে অগ্রসর হতে চাইলে তুমি যে আনুগত্য ও সমর্পণের কথা বলেছ তা হওয়া চাই খাঁটী, ঐকান্তিক ও সম্পূর্ণ। আধ্যাত্মিক আস্পৃহার সঙ্গে তোমার কামনাকে যতক্ষণ মিশিয়ে ফেলছ ততক্ষণ তা হবার নয়। যতক্ষণ তুমি নিজের পরিবার, সন্তান, বা অন্য কিছু বা অন্য কারো প্রতি আসক্তি পোষণ করছ ততক্ষণ তা হবার নয়। এই যোগ করতে হলে কেবল একটিমাত্র বাসনা ও আস্পৃহা থাকা চাই, তা হলো আধ্যাত্মিক সত্যকে লাভ ক'রে তোমার চিন্তায়, কর্মে, ভাবে ও প্রকৃতিতে তাকে অভিব্যক্ত করা। কারো সঙ্গে সম্পর্ক স্থাপন করতে উৎসুক হবে না। অপরের সঙ্গে যা কিছু সম্পর্ক তা স্থাপিত হওয়া চাই ভিতর থেকে যখন তুমি প্রকৃত চেতনা পেয়ে আলোর মধ্যে থাকবে। সাধকের মধ্যে তার ব্যবস্থা করা হবে মায়ের ইচ্ছাতে ও শক্তিতে, দিব্য জীবন ও দিব্য কর্মের অতিমানস সত্য অনুযায়ী; তার মনের ও প্রাণের কামনা অনুযায়ী নয়। এই কথাটি নিশ্চয় স্মরণ রাখবে। তোমার চৈত্য সত্তা মায়ের কাছে সমর্পিত হয়ে সত্যের মধ্যে বিকাশের জন্য প্রস্তুত; কিন্তু তোমার নিম্ন প্রাণসত্তা যত কিছু আসক্তি ও সংস্কার ও অশুদ্ধ কামনার মধ্যে আবদ্ধ, আর এদিকে তোমার বাহ্য দৈহিক মন তার অজ্ঞান অভিমত ও অভ্যাসকে ঝেড়ে ফেলে সত্যের দিকে উন্মীলিত হতে পারেনি। সেই কারণে তোমার উন্নতি হতে পারছে না,

যেহেতু ঐ সব জিনিসকে থাকতে দেওয়া চলে না; দিব্য জীবনের পক্ষে যা থাকা দরকার ওগুলি ঠিক তার বিপরীত। এগুলির প্রভাব থেকে মা তোমাকে মুক্ত করে দিতে পারেন, কেবল যদি তা তুমি যথার্থই চাও, কেবল চৈত্যসত্তার দ্বারাই নয় কিন্তু দৈহিক মন ও প্রাণগত প্রকৃতির দ্বারাও। তার লক্ষণ তখন এই হবে যে তুমি আর নিজের ব্যক্তিগত ধারণা কামনা ও আসক্তিকে পোষণ করবে না, আর যত দূরে যেখানেই থাকো নিজেকে খোলা রেখে বোধ করতে থাকবে যে মায়ের উপস্থিতিতে মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে তার কাজ করে চলেছে সুতরাং সর্বদা তুষ্ট নীরব ও আস্থাবান থেকে অন্য কিছু না চেয়ে কেবল চাইবে মায়ের যা ইচ্ছা তাই হোক।

×

সব কিছু মায়ের সামনে ফেলে দাও আপন হৃদয়েব মধ্যে, তাহলে সব চেয়ে যা ভালো তারই জন্য মায়ের আলো সেখানে কাজ কববে।

২১-৪-১৯৩৫

×

সংসার জীবন স্বভাবতই অস্থিরতার জীবন—ওরূপ জীবনের ভিতর দিয়ে ঠিকভাবে অতিক্রম ক'রে যেতে হলে তোমার সমগ্র জীবন ও কর্মকে ভগবানের কাছে নিবেদন ক'রে প্রার্থনা করতে থাকবে যেন ভিতরে ভগবানের শান্তি প্রতিষ্ঠিত হয়। মনকে যখন নীরব ক'রে থাকবে তখন নিজেই বোধ করবে যে মা তোমার জীবনকে সমর্থন দিচ্ছেন আর তখন সব কিছু তাঁকেই সমর্পণ করবে।

১৬-৪-১৯৩৩

মায়ের কোলে

প্র ঃ আমি ঠিক ভাবে একাগ্রতা আনতে পারছি না। তা যখন যথোচিত ভাবে করা যাচ্ছে না, তখন কেবল এই যদি

মনে করতে থাকি যে আমি সর্বদা মায়ের কোলে শুয়ে আছি, তাই কি আমার পক্ষে ভালো হবে না?

উঃ তাই হবে সব চেয়ে উৎকৃষ্ট রকমের একাগ্রতা।

১২-৮-১৯৩৫

সমর্পণে প্রাণের বাধা

আমি বলেছি যে মানবের প্রাণসত্তা কারো দ্বারা প্রভুত্বে পরিচালিত হতে চায় না, এবং আরো বলেছি যে সেইজন্য সাধকদের আত্মসমর্পণ করা মুশকিল হয়। কারণ প্রাণসত্তা তার নিজের দাবি, নিজের ধারণা কামনা ও পছন্দকে বজায় রাখতে চায় নিজের ইচ্ছামত, অন্য কোনো শক্তির দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হতে চায় না। কিন্তু সমর্পণের বেলা মায়ের কাছে সমস্ত ব্যক্তিগত জিনিসকে সমর্পণ ক'রে দিতে হবে, তাঁরই শক্তির দ্বারা উচ্চতর সত্যের ক্ষেত্রে নিয়ন্ত্রিত হতে হবে, যদিও তা তোমার নিজের পন্থা নয়। কাজেই প্রাণসত্তা সেখানে প্রতিবন্ধক হয়, সে চায় তার আপন স্বাধীন মতে চলতে, কাজেই সমর্পণে সে রাজী হয় না। ভেঙে পড়া কিংবা ব্যর্থ হওয়ার ধারণাও তোমার ভ্রান্ত, মায়ের উপর অসন্তোষ হওয়া যত খারাপ নিজের উপর অসন্তোষ হওয়াও তত খারাপ। এতে নিজের উপর আস্থা ও সাহস চলে যায়, যা সাধনার পথে বিশেষ দরকার। এই সব ধারণা ও প্রস্তাবকে তুমি প্রত্যাখ্যান করবে।

৮-১০-১৯৩৬

×

প্রঃ কোনো কোনো সাধক বলে যে মায়ের সঙ্গে তাদের মিলন হয়েছে। আমার মনে হয় সেটা ঠিক মিলন নয়, নৈকট্য বোধ।

উঃ তারা হয়তো মায়ের উপস্থিতি অনুভব করতে চেষ্টা করে, সেই-

জন্য তাদের নৈকট্য বোধকে তারা মিলন বলে। অবশ্য তা মিলনের দিকে একটা ধাপ বটে। কিন্তু মিলন মানে তার চেয়ে আরো অনেক কিছু।

৫-৩-১৯৩৪

×

প্র ঃ আপনি লিখেছেন "কেবল অন্তর্দৃষ্টি পেলেই উন্মীলন হয় না"। ঠিক কথা। কিন্তু যেখানে সূর্য ও চন্দ্রের রশ্মি দেহের দুই দিকে এবং তার মধ্যে মায়ের অবতরণ ও উপস্থিতি অনুভব করা যায়, সেটা কি অসাধারণ অন্তর্দৃষ্টি ও অনুভূতি নয়? মায়ের দিকে যথেষ্ট উন্মীলন না থাকলে কি তা হতে পারে?

উ ঃ অসাধারণ কেন হবে? অনেক সাধকেরই ঐরূপ বা ঐরূপ ধরনের অনুভূতি ঘটেছে। সর্বদা মায়ের উপস্থিতি অনুভব করাই অসাধারণ বলা যেতে পারে। মাঝে মাঝে তা অনুভব করা অনেকেরই হয়।

১৫-৯-১৯৩৬

×

প্র ঃ ধ্যানের সময় মায়ের চেতনার সঙ্গে আমি একরূপ ঐক্য বোধ করি, কিন্তু আজকাল ধ্যান খুব গভীর হচ্ছে না। ধ্যানে ছাড়া কি ঐক্য বোধ করা যায় না?

উ ঃ সব চেয়ে দরকার হলো চেতনার রূপান্তর, ঐক্যবোধ তারই একটা অঙ্গ। গভীর ধ্যান হওয়া একটা উপায় মাত্র, ধ্যান ছাড়াও যখন সহজে বড়ো রকমের অনুভূতি আসবে তখন ধ্যানেরও দরকার হবে না।

প্রচেষ্টা থাকা চাই

সাধনা সম্বন্ধে ঠিক কথাই বলেছ। বিনা সাধনাতে দিব্যশক্তি কেবল শূন্যে কিছু করতে পারে না, সেই শক্তি সাধকের প্রকৃতি অনুযায়ী এমন ভাবে নেয় যাতে সে ভিতরে মায়ের ক্রিয়া অনুভব করে এবং জানে যে তিনিই সব করছেন। ততক্ষণ পর্যন্ত সাধকের আস্পৃহা, আত্মনিবেদন, মায়ের কাজে সমথন, অন্য সকলকে প্রত্যাখ্যান ও সকল বিরুদ্ধ প্রভাবকে বর্জন করা অপরিহার্য।

২৫-৯-১৯৩৬

×

মায়েব দিকে নিজেকে খুলে রাখো——সম্পূর্ণভাবে তাঁর সঙ্গে যুক্ত হয়ে থাকো। তাঁর ডাকে সাড়া দাও, নিখুঁতভাবে গড়তে দাও।

৯-৩-১৯৩৪

×

প্র ঃ উন্মীলনের মানে কি? 'মায়ের কাছ থেকে কিছুই লুকিয়ে না রাখা' এটাই কি মানে?

উ ঃ উন্মীলনের পথে এটাই প্রথম পদক্ষেপ।

×

প্র ঃ চিন্ময়ী মার দিকে কি করে উন্মীলন করা যায়?

উ ঃ বিশ্বাস আর শান্ত মনে সমর্পণের দ্বারা।

×

প্রঃ আমার অন্তর মায়ের দিকে উন্মীলিত হচ্ছে, কিন্তু কিছু কিছু অসন্তোষ আসছে আর বাধা দিচ্ছে।

উঃ এই সব অসন্তোষ দূর করে দাও—চৈত্যের সম্পূর্ণ উন্মীলনকে এরা বাধা দেয়।

×

প্রঃ বোধ হয় চৈত্য সবে মাত্র উন্মীলিত হতে আরম্ভ করেছে তাই এই সব অসন্তোষ তার উপর প্রভাব বিস্তার করবার চেষ্টা করছে?

উঃ চৈত্য সব সময়ই এটা মানে যে "মা যা করছেন তা সব চেয়ে ভালোর জন্যই, আর সব কিছুই আনন্দের সঙ্গে গ্রহণ করে। ভিতরের প্রাণের অংশই এই সব অসন্তোষ দিয়ে প্রভাবান্বিত হয়।

×

প্রঃ অন্তঃসত্তা কি আপনা থেকেই মায়ের দিকে উন্মীলিত হয়?

উঃ সাধনা ব্যতিরেকে বা চৈত্যের পরশ ছাড়া অন্তঃসত্তা উন্মীলিত হয় না।

৩০-১১-১৯৩৩

×

প্রঃ লেখার ভিতর দিয়ে মায়ের দিকে উন্মীলিত হতে চায় কোন অংশটি, যদিও সেই একই জিনিসের পুনরাবৃত্তি ঘটে?

উ ঃ ভিতরের মন বা চৈত্য হতে পারে।

২৮-১১-১৯৬৩

৬

মায়ের শক্তির ক্রিয়া

মায়ের শক্তির ক্রিয়া

মায়ের শক্তি

মায়ের শক্তির ভিতর দিয়ে ছাড়া কোনো কিছুই হবার নয়।

×

সব কিছুই করতে হবে মায়ের শক্তির ক্রিয়াতে আর তোমার নিজের তরফের আস্পৃহা ও ভক্তি ও সমর্পণের সাহায্যে।

৩০-১০-১৯৩৪

প্রকৃতি শক্তি ও মায়ের শক্তি

যখন আমি মায়ের শক্তির কথা বলি তখন তা প্রকৃতির এই অজ্ঞানতা-পূর্ণ অন্ধশক্তি নয়, তা হলো ভগবানের উচ্চতর শক্তি যা উপর থেকে আসে প্রকৃতির পরিবর্তন ঘটাতে।

না, মা ইচ্ছা ক'রে কিছু করেননি। নিজেই তুমি মায়ের কাছে এসে নিজের ভুল বুঝলে।

মায়ের উচ্চ শক্তির অবতরণ ও ক্রিয়া

এমন এক শক্তি আছে যা নতুন চেতনা বাড়বার সঙ্গে সঙ্গেই বেড়ে উঠে তার সহায়ক হয়ে তাকে আরো পরিণত ক'রে তোলে। তার নাম যোগ-শক্তি। এখানে তা থাকে আমাদের আভ্যন্তর সত্তার চক্রগুলির মধ্যে গুটিয়ে নিদ্রিত অবস্থায়, যার নিম্ন চক্রের অবস্থানকে তন্ত্রশাস্ত্রে বলে কুণ্ড-

লিনী শক্তি। কিন্তু এ শক্তি আমাদের মাথার উপরেও আছে দিব্যশক্তি রূপে—সেখানে কুণ্ডলিত ও নিদ্রিত নয়, কিন্তু জাগ্রত, প্রস্তুত, সর্বজ্ঞাত ও ব্যাপক; অভিব্যক্ত হবার জন্য সে প্রস্তুত হয়ে অপেক্ষা করতে থাকে—এ হলো মায়ের শক্তি, এরই দিকে আমাদের উন্মীলিত হতে হবে। মনের মধ্যে এটি দিব্য মনঃশক্তি রূপে বা বিশ্বগত মনঃশক্তি রূপে প্রকাশ পায়, আর সে শক্তি সব কিছুই করতে পারে যা ব্যক্তিগত মনের পক্ষে করা অসাধ্য—এ হলো যোগার্জিত মনঃশক্তি। আবার যখন তা ঐভাবে প্রাণের বা দেহের মধ্যে কাজ করে তখন তা হয় যোগগত প্রাণশক্তি বা যোগগত দেহশক্তি। এই সকল রূপে জাগ্রত হয়ে তা উপরদিকে ও বাহিরদিকে ঠেলে বেরিয়ে আসে, নিচের থেকে বিস্তার নিয়ে ছড়িয়ে পড়ে; কিংবা ভিতরে নেমে বিশিষ্ট শক্তি রূপে সঞ্চিত হয়; আবার দেহের মধ্যে নেমে সেখানে আপন প্রভুত্ব স্থাপন করে সর্বত্র বিস্তারলাভ ক'রে আমাদের নিম্নতম সত্তার সঙ্গে উচ্চতম সত্তাকে এক ক'রে মিলিয়ে দেয়, ব্যক্তিকে নিয়ে যায় জগৎ ব্যাপকতায় কিংবা পরমতম পরাৎপরতায়।

×

নিশ্চয়, সব কিছু উচ্চ শক্তির অবতরণ মানে বলতে গেলে স্বয়ং মায়েরই অবতরণ—কারণ ওর ভিতর দিয়ে তিনিই নেমে আসেন।

×

শান্তি যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন এই উচ্চ বা দিব্য শক্তি উপর থেকে আমাদের মধ্যে নেমে এসে কাজ করে। প্রথমে সাধারণত মাথায় নেমে তা আভ্যন্তরীণ মনের কেন্দ্রগুলিকে মুক্ত করে দেয়, তার পর হৃদয় কেন্দ্রে নেমে চৈত্য ও ভাবসত্তাকে সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করে, তার পর নাভি চক্রে ও অন্যান্য প্রাণকেন্দ্রে নেমে আভ্যন্তর প্রাণসত্তাকে মুক্ত করে, শেষে মূলাধারে এবং তারও নিচে নেমে আভ্যন্তর দেহসত্তাকেও মুক্ত ক'রে দেয়। কেবল মুক্ত নয়, সেই সঙ্গে অপূর্ণতাও দূর করে; সমগ্র প্রকৃতিকে নিয়ে সেই শক্তি তখন তার বিভিন্ন অংশে কাজ করতে থাকে, যা বর্জিত হবার তাকে বর্জন, যা সংশোধিত হবার তাকে সংশোধন, আর যা নতুন সৃষ্ট হবার তাকে

সৃষ্টি করাই তার কাজ হয়। প্রকৃতির মধ্যে সে একটা নতুন পূর্ণতা, নতুন সঙ্গতি ও ছন্দ নিয়ে আসে। এমন কি সে তার নিজের চেয়ে আরো উচ্চ থেকে উচ্চতর শক্তি ও প্রকৃতিকে পর্যন্ত সেখানে নামিয়ে আনতে পারে, আর শেষ পর্যন্ত সাধনার যদি তাই লক্ষ্য হয় তাহলে তখন অতিমানস শক্তিকেও নামিয়ে আনা সম্ভব হয়। এর জন্য পূর্বপ্রস্তুতি ও সহায়কতার কাজ হয় হৃদয় কেন্দ্রে চৈত্য সত্তার দ্বারা; চৈত্য যতই সম্মুখবর্তী, উন্মীলিত ও সক্রিয় হতে পারে ততই সেই দিব্য শক্তির কাজ সহজ হয়ে আসে। আর হৃদয়ে প্রেম ভক্তি ও সমর্পণ যতই স্ফুরিত হয় ততই সাধনার বিবর্তন ত্বরান্বিত ও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়। কারণ তার অবতরণ ও রূপান্তর ক্রিয়ার সঙ্গে একত্রেই জড়িত থাকে ভগবৎ সংস্পর্শ ও মিলন।

এই হলো সাধনার মূল ধারা। এর মধ্যে দুটি জিনিস সব চেয়ে বেশি দরকারী, হৃদয় কেন্দ্রের এবং মনের কেন্দ্রের উন্মীলন সব কিছু ছাড়িয়ে উপরের দিকে। হৃদয় কেন্দ্র খোলে চৈত্যের দিকে আর মনের কেন্দ্রগুলি খোলে উচ্চ চেতনার দিকে, আর দুইএর একত্র সংযোগই হলো সিদ্ধির প্রধান উপায়। প্রথম উন্মীলনটি হতে পারে হৃদয়ে একাগ্রতা এনে ভগবানকে ডাকার দ্বারা, যেন তিনি ভিতরে অভিব্যক্ত হয়ে চৈত্যের মাধ্যমে সমগ্র প্রকৃতিকে পরিচালিত করুন। সাধনার এই বিভাগটির অন্তর্গত ক্রিয়া হলো আস্পৃহা, প্রার্থনা, প্রেম, ভক্তি এবং সমর্পণ, এবং সেই সঙ্গে যা কিছু বাধাস্বরূপ সেগুলিকে পরিবর্জন। আর দ্বিতীয় রকমের উন্মীলন আসবে চেতনাকে মস্তকে একাগ্র করে (পরে মাথার উপরদিকে) নিত্য এই আস্পৃহা করতে থাকা ও ডাকতে থাকা যে সত্তার মধ্যে নেমে আসুক ভগবানের শান্তি, শক্তি, আলো, জ্ঞান, আনন্দ––প্রথমে শান্তি কিংবা শান্তি ও শক্তি একত্রে। কেউ কেউ প্রথমে আলো বা আনন্দ পায়, কেউ বা হঠাৎ জ্ঞানের প্রবাহ। কেউ বা প্রথম উন্মীলনে দেখতে পায় উপরে রয়েছে অসীম নীরবতা, তেজ, আলো বা আনন্দময়তা, অতঃপর তারা সেখানে উঠে যায় অথবা ওগুলি তাদের নিম্ন প্রকৃতির মধ্যে অবতরণ করে। আবার অন্যেদের বেলা সেই অবতরণ ঘটে প্রথমে মাথায়, তার পর হৃদয়ে, তার পরে নাভি হয়ে তারও নিম্নে সর্ব দেহে। কখনো বা অবোধ্য রকমের উন্মীলন হয়ে শান্তি আলো শক্তি প্রভৃতির অবতরণের সম্বন্ধে কিছু জানা যায় না; আবার সমতল ভাবে উন্মীলন এসে বিশ্ব চেতনা বা মানসিক ব্যাপকতা বা জ্ঞানের স্ফুরণও হঠাৎ ঘটে যেতে পারে। যেমন ভাবেই আসুক তাকে আবাহন

ক'রে নিতে হবে—কারণ এর কোনো ধরাবাঁধা নিয়ম নেই—কিন্তু শান্তি যদি প্রথমে না আসে, তাহলে খুব সতর্ক থাকতে হবে কেউ যাতে উৎফুল্ল হয়ে নিজেকে ফাঁপিয়ে তুলে ভারসাম্য না হারায়। কিন্তু সব চেয়ে বড়ো জিনিস হবে যখন ভগবৎ তেজ বা মায়ের শক্তি নেমে এসে তোমার ভার গ্রহণ করবে, কারণ তখন সমগ্র চেতনা সুব্যবস্থিত হয়ে যোগের বৃহত্তর ভিত্তি প্রতিষ্ঠার শুরু হবে।

×

তোমার ভিতর দিয়ে যে প্রবাহ নেমে যাওয়া অনুভব করেছ তা নিশ্চয় মস্তকোপরিস্থ মায়ের শক্তিপ্রবাহ। মাথার উপর থেকে প্রবাহিত হয়ে প্রথমে এই শক্তি কাজ করে মনের কেন্দ্রগুলিতে (মাথা ও গলাতে), তার পরে বুকে ও হৃদয়ে নেমে শেষে সমগ্র দেহের ক্রিয়াতে কাজ করে।

এরই ফল তুমি অনুভব করেছ মাথা থেকে কাঁধ পর্যন্ত। উপব থেকে আসা এই শক্তিই চেতনার রূপান্তর ঘটিয়ে তাকে আধ্যাত্মিক চেতনাতে পরিণত করার জন্য কাজ করে। তার আগে মায়ের শক্তি চৈত্য, মন, প্রাণ ও দেহে কাজ ক'রে ওগুলিকে বিশুদ্ধ ও চৈত্য চেতনাযুক্ত করে।

×

মাথার চারিদিকে মায়ের শক্তির স্পন্দন অনুভব করা কেবল মনের ধারণা কিংবা মানসিক বোধের চেয়েও বেশি কিছু, ওটি এক অনুভূতি। মায়ের শক্তি ঐ ভাবেই কাজ করে আর তা প্রথমে জানা যায় মাথাকে ঘিরে বা মাথার উপরে, তার পর মাথার মধ্যে। তার চাপ অনুভব করা মানে মনকে ও তার কেন্দ্রগুলিকে উম্ঘাটিত করে তার মধ্যে ঢোকবার জন্য সে চাপ দিচ্ছে। মনের কেন্দ্রগুলি হলো মাথার চাঁদিতে ও তার উপরে একটি, ভ্রূমধ্যে একটি, আর কণ্ঠে একটি। সেইজন্যই তুমি ঐরূপ স্পন্দন বোধ করেছ মাথাতে এবং কখনো কখনো কণ্ঠ পর্যন্ত, কিন্তু তার নিচে নয়। সাধারণত তাই হয়, আগে মনের মধ্যে ঢুকে তাকে অধিকার ক'রে তার পরে নামে প্রাণ ও ভাবসত্তার অংশগুলিতে (হৃদয়, নাভি, ইত্যাদি)—

আবার কখনো বা সমস্তটা ঘিরে নিয়ে তার পর দেহের মধ্যে প্রবেশ করে।

২৪-৩-১৯৩৭

×

তোমার অনুভূতিগুলির এই অথ:

(১) মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে নামছে, মাথাতে যে চাপ বোধ করছ সে তাঁরই চাপ। পূর্ণ বিশ্বাসে নিজেকে মায়েব হাতে একেবারে ছেড়ে দাও, সযত্নে লক্ষ্য কবো কখন কি হচ্ছে আব এখানে তা জানাও। আর কোনো নির্দেশের দরকার নেই, তোমার জন্য যা করবার দরকার তা করা হচ্ছে।

(২) প্রথম চাপ হয়েছে তোমাব মনের উপর। মনের কেন্দ্রগুলি হলো (ক) মাথা ও তাব উপবে, (খ) দুই চোখের মাঝখানে কপালের কেন্দ্র-স্থলে, (গ) কণ্ঠে, তাব পব প্রাণ-মনেব ভাবগত ও সংবেদনগত কেন্দ্রগুলি বুক থেকে নিচের দিকে। এইখানেই প্রথম প্রাণ-চেতনা তুমি অনুভব করেছ। শক্তি কাজ করছিল তোমার এই দুই অংশের বিস্তার ক'রে সেগুলিকে মাথার উপরকার উচ্চতর চেতনাব নিম্ন কেন্দ্রে উঠিয়ে নিয়ে যেতে, যাতে অতঃপর ওগুলি তার দ্বারাই সচেতন ভাবে পরিচালিত হয় আর দুই অংশই দেহাতীত উদার বিশ্ব চেতনাতে ক্রিয়াশীল হয়।

(৩) অপর যে অস্থির প্রাণের সম্বন্ধে জেনেছ তা হলো প্রাণসত্তা, যার কাজ কামনা ও প্রাণ-তৎপরতা। মায়ের শক্তি তাকে শান্ত ক'রে মনের ন্যায় তাকেও উদার চেতনাযুক্ত করবার জন্য ক্রিয়া করছিল। যে বৃহৎ দেহ দেখেছ তা স্থূল শরীব নয়, তা হলো প্রাণময় দেহ।

(৪) তোমার সাধনার ভিত্তি হওয়া চাই নীরবতা ও স্থিরতা।

উত্তরোত্তর আরো নীরব, আরো গভীর ভাবে শান্ত হয়ে যাও নিজেরও মধ্যে এবং পারিপার্শ্বিক জগৎ সম্বন্ধে সমস্ত মনোভাবেরও মধ্যে। এই করতে পারলে তবে তোমার সাধনা সহজেই এগিয়ে যাবে ও বেড়ে যাবে, যতদূর কম বাধাবিঘ্নের ভিতর দিয়ে।

যে মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করছে তার প্রতি নীরব আস্থা রাখো।

×

মাথার উপর যে চাপ বা ভারবোধ হয় তাকে নিশ্চয় জানবে মায়ের শক্তি তোমাকে স্পর্শ করার লক্ষণ বলে, সেই শক্তি উপর থেকে চাপ দিচ্ছে তোমাকে অধিকার ক'রে আধারের মধ্যে ঢুকে তাকে আচ্ছন্ন ক'রে দিতে-- সাধারণত সকল কেন্দ্রের ভিতর দিয়ে ক্রমে ক্রমে নিচের দিকে নেমে যেতে। প্রথমে কখনো বা তার ফল আসে শান্তি রূপে, কখনো বা শক্তি রূপে, কখনো বা মায়ের উপস্থিতি ও চেতনা রূপে, কখনো আনন্দ রূপে।

আগে যে তুমি ওটা হারিয়ে ফেলেছিলে তার কারণ নিশ্চয় তোমার কোনো প্রাণগত অপূর্ণতা বা বাইরের কোনো আক্রমণ এসে পড়েছিল। অবশ্য ঐ চাপ সর্বদা থাকে না; কিন্তু তা বারে বারে আসে, যতক্ষণ পর্যন্ত আধারটি খুলে না যায় আর উচ্চ চেতনার নেমে আসার পক্ষে কোনো বাধা না থাকে।

১৮-৯-১৯৩৩

×

ওটা হলো মায়ের শক্তি উপর থেকে মেরুদণ্ডের ভিতর দিয়ে নামার সর্বজানিত ক্রিয়া। দুই তিন রকমের নেমে আসা আছে। এক রকম হয় কেন্দ্রগুলির মূলকে স্পর্শ ক'রে যা রয়েছে সেই মেরুদণ্ড ধরে। আর হয় মাথার ভিতর দিয়ে সর্ব দেহে ধাপে ধাপে, যতক্ষণ পর্যন্ত সর্বস্থানে চেতনার সকল কেন্দ্র খুলে না যায়। আর হয় বাহির থেকে সর্বদেহকে আচ্ছন্ন ও অভিভূত ক'রে।

১-২-১৯৩৪

×

মা তোমার ভিতরের অগ্নিকে প্রজ্জ্বলিত ক'রে দিয়েছিলেন--তা যে তুমি জানতে পারোনি তার কারণ তোমার বাহ্য খোলস ভেদ ক'রে তা বাইরের চেতনাতে এখনও আসেনি। কিন্তু তোমার ভিতরের সত্তাতে নিশ্চয় কোথাও সে জিনিস আছে এবং উন্মীলন ঘটিয়েছে--তার প্রমাণ তোমার স্বপ্নের অনুভূতি, সেটা ছিল তোমার ভিতরের সত্তাতে মায়েরই ক্রিয়া। মেরু-দণ্ডের মধ্যে প্রবাহ নেমে যাচ্ছে বোধ করা মায়েরই শক্তির প্রবাহ, যা কেন্দ্র-

গুলিকে খুলে দিতে চেষ্টা করছে, আর তুমি যে তার তীব্র বেগ অনুভব করেছ তাতেই প্রমাণ হয় যে সেখানে ভালো উন্মীলন ঘটেছে। তুমি অধ্যবসায়ের সঙ্গে যদি সাধনা চালিয়ে যাও তাহলে ঐ অগ্নির ও শক্তির দুইএরই ক্রিয়া তোমার বাহ্য চেতনাতে প্রকাশ পাবে--কারণ সর্বদাই আগে আভ্যন্তর সত্তাতে পর্দার আড়ালে প্রস্তুতিব কাজ হতে থাকে, তার পরে সে পর্দা পাতলা হয় বা সরে যায় আর তখন বাহ্য চেতনাকেও নিয়ে কাজ হতে থাকে।

২২-৪-১৯৩৭

×

কিছু একটা হচ্ছে তোমাব মধ্যে, কিন্তু তা ভিতব দিকে--তথাপি লেগে থাকতে থাকতে তা নিশ্চয় বেবিয়ে আসবে। যেমন ঐ চোখ ধাঁধানো সাদা আলোব তরঙ্গ যা দেখেছ, তা মায়েরই শক্তির অভ্রান্ত পরিচয় যা আধারের মধ্যে ঢুকে কাজ করছে, যদিও তা দেখেছ স্বপ্নে--অর্থাৎ আভ্যন্তরীণ সত্তায় এবং এখনও পর্দাব আডালে। তা বাইবে এলেই তখন শুষ্কতা ঘুচে যাবে।

৫-২-১৯৩৭

মায়ের চেতনাতে অহংএর বিলুপ্তি

খুব ভালো কথা, যা বলেছ অবচেতন ও পারিপার্শ্বিক সম্বন্ধে। মায়ের প্রভাব ঐখানেই পডা চাই, যাতে তোমার চেতনা উপরে উঠে উদার ভাবে ছড়িয়ে পড়ে শান্তি আলো ও আনন্দের মধ্যে এবং নিচেকার অবচেতনের সঙ্গে উচ্চতর চেতনার সংযোগ ঘটায়। তার ফলেই তখন মায়ের চেতনাতে নিজের অহংকে লোপ ক'রে দেওয়া সম্ভব হবে।

২৫-৯-১৯৩৫

মায়ের বিশ্বচেতনার সঙ্গে ঐক্য

প্রত্যেকেরই মন প্রাণ দেহের চেতনা নিজের মধ্যেই আবদ্ধ থাকে

সংকীর্ণ ভাবে, নিজেকে দেখে যেন সেই সব কিছুর কেন্দ্র--প্রকৃত সত্য কিছুই জানে না। কিন্তু যোগের দ্বারা যখন সত্য চেতনাতে উন্মুক্ত হতে শুরু করে তখন সেই সংকীর্ণতার বেড়া ভেঙে যায়। মনের বিস্তার বোধ হতে থাকে, শেষে দেহচেতনা পর্যন্ত বিস্তার পেতে থাকে, তখন দেখ যে সব কিছুই তোমার মধ্যে আর তুমিও সব কিছুর মধ্যে এক হয়ে আছো। তখনই মায়ের বিশ্বচেতনার সঙ্গে তুমি এক হয়ে যাও। তাতেই তুমি মনের বিস্তার বোধ করছ। কিন্তু মনের উপরেও অনেক কিছু আছে যাকে মাথার উপরকার জগৎ মনে করছ। এই সব আমাদের যোগের সাধারণ অনুভূতি আর এই প্রথম তার শুরু। একে আরো বাড়াবার জন্য তোমাকে আরো বেশি স্থির ও নীরব হতে হবে, ব্যগ্র বা উত্তেজিত না হয়ে আরো বেশি গ্রহিষ্ণু হতে হবে। শান্তি ও স্থিরতাই হলো প্রথম কথা, সেই সঙ্গে বিস্তার --সেই শান্তির মধ্যে যা কিছু প্রেম বা আনন্দ, যা কিছু শক্তি বা জ্ঞান আসে তা সহ্য করতে পারবে।

মায়ের বিশ্বগত ও রূপান্তরকারী শক্তি

প্র ঃ আমরা নিজেরা মায়ের আলো ও শক্তির দিকে যতই উন্মীলিত হতে পারবো ততই তাঁর শক্তি বিশ্বে প্রতিষ্ঠা পাবে-- তাই নয় কি?

উঃ প্রতিষ্ঠা পাবে রূপান্তরকারী শক্তি--বিশ্বগত শক্তি তো বরাবরই রয়েছে।

১৩-৮-১৯৩৩

মায়ের শক্তি ও ত্রিগুণ

প্র ঃ মায়ের শক্তি যখন কারো মধ্যে কাজ করতে থাকে তার নিজের বদলে, তখন তার ভিতরকার গুণগুলি স্তব্ধ থেকে কি কেবল মায়েরই শক্তিরই কাজ চলে?

উঃ না, গুণসকল স্তব্ধ থাকে না, তারই মাধ্যমে কাজ হয়। ভিতরে সেই শক্তি ও চেতনা যদি প্রবল হয়, তখন রজোগুণ হয়ে যায় অনেকটা নিম্ন ধরণের তপস্, আর তমোগুণ হয় নিষ্ক্রিয় শম ভাবাপন্ন। রূপান্তর এই ভাবে শুরু হয় কিন্তু তার গতি খুব মন্থর।

২৯-১-১৯৩৬

স্থূলদেহে মায়ের শক্তি

প্রঃ কখন বলা যাবে যে ভগবত্তার জন্য স্থূলদেহ প্রস্তুত হয়েছে?

উঃ স্থূল চেতনা যখন উন্মীলিত হয়ে মায়ের শক্তির ক্রিয়া অনুভব ক'রে তাতে সাড়া দিতে থাকবে, তখন সে প্রস্তুত হবে।

১১-৬-১৯৩৩

×

মায়ের চেতনা দেহের সকল অণু পরমাণুতে যেতে পারে কারণ তারা সকলই গুপ্তভাবে চেতন।

৫-১০-১৯৩৩

সক্রিয় মনের বাধা

মন যদি তার কাজে সক্রিয় থাকে তাহলে মা কি এনে দিচ্ছেন তা জানতে পারা কঠিন হয়। তিনি তো চিন্তা এনে দেন না, তিনি আনেন উপরের আলো, শক্তি, ইত্যাদি।

২২-৩-১৯৩৪

মায়ের শক্তিকে আত্তীকরণ

মায়ের শক্তিকে গ্রহণ করতে পারলে তখন স্থির থাকবে যতক্ষণ না তা তোমার মধ্যে খুব মিশে যায়। তার পরে ঠিকই থাকতে পারবে, তখন আর বাহ্য কাজে বা মেলামেশায় ক্ষতি হবে না।

×

ধ্যানে যদি স্থিতি, প্রশান্তি, একাগ্রতা বা প্রভাব বা চাপ মিলে যায়, তাকেও তোমার কাজের মধ্যে নেওয়া যায় যদি চেতনাকে বিক্ষিপ্ত বা শিথিল ক'রে না দাও। এই কারণেই মা তোমাদের বলেছেন যে কেবল প্রণামে ও ধ্যানে একাগ্রতা আনলেই যথেষ্ট হয় না, তার পরেও নীরব থেকে তাকে নিজের মধ্যে হজম করে নিতে হয়; আর বেশিরকম বিক্ষিপ্ত ও শিথিল করার মতো জিনিসকে প্রশ্রয় দিতে নিষেধ করেছেন--তা কেবল এই কারণে যে তিনি যা দিয়ে দিচ্ছেন তা যেন থেকে যায় আর মনোভাবের পরিবর্তন আসে। কিন্তু আমার বোধ হয় যে বেশির ভাগ সাধকই সে কথা বোঝেনি বা সে নির্দেশ পালন করেনি--তাঁর এ নির্দেশের হেতু তারা হৃদয়ঙ্গম করেনি।

×

নিজের মধ্যে স্থির ও অবিচল উন্নতির ইচ্ছাকে প্রতিষ্ঠালাভ করতে দাও; তোমার মধ্যে মা যা দিয়ে দিচ্ছেন তাকে নিজের মধ্যে নীরবে অঙ্গীভূত ক'বে নেবার অভ্যাসটি রপ্ত ক'রে নাও। এই হলো অগ্রগতির অভ্রান্ত উপায়।

মার্চ ১৯২৮

মায়ের শক্তিকে আকর্ষণ

কেউ যদি নিজেকে খুলে রেখে শক্তি, অনুভূতি প্রভৃতিকে নীরব শান্ত

গতিতে আসতে দেওয়ার পরিবর্তে অতি ব্যগ্র হয়ে জোর ক'রে নামিয়ে আনতে চায়, তাকেই বলে আকর্ষণ করা। অনেকে মায়ের শক্তিকে ঐভাবে টেনে নিতে চেষ্টা করে--যা সহজে হজম করতে পারবে তার চেয়ে বেশি নিতে চেষ্টা ক'রে কাজের বিঘ্ন ঘটায়।

এপ্রিল ১৯৩৫

মায়ের শক্তির দিকে চৈত্য উন্মীলন

বাধা দূর করার যে উপায় আবিষ্কার হলো তার সুযোগ নেওয়া দরকার ছিল। মা তোমাকে কেবল বাধাগুলি দেখিয়ে দেননি; তিনি পরিষ্কার দেখিয়ে দিয়েছিলেন যে কেমন ক'রে তাকে দূর করতে হয় এবং তুমিও তখন তা বুঝতে পেরেছিলে, যদিও এখন (তুমি চিঠি লেখার সময়) বোধ হয় সে আলো মেঘাচ্ছন্ন হয়ে গেছে, নিজেই তুমি তিক্ত বিষাদে ডুবে থেকে প্রাণসত্তাকে উত্তরোত্তর ঐভাবে প্রশ্রয় দেওয়াতে। তাই হওয়া স্বাভাবিক, কারণ বিষণ্ণতা নিয়ে থাকলে ঠিক ঐ ভাবই এসে পড়ে। সেইজন্যই যে সাধনাতে বিষাদের বিশেষ পালা থাকে (অভিমান, বিদ্রোহ, বিরহ) তার আমি পক্ষপাতী নই। কারণ বিষাদের দ্বারা কখনো পূর্ণতা আনে না, যে কথা স্পাইনোজা বলেছেন, ওটা সিদ্ধির পথ নয়; তা হতে পারে না, কারণ ওতে মনকে বিভ্রান্ত ও দুর্বল ক'রে দেয়, প্রাণশক্তিকে দমিয়ে দেয়, অন্তরাত্মাকে অন্ধকার করে। প্রফুল্লতা ও প্রাণস্ফূর্তি ও আনন্দ থেকে এইরূপ বিষাদ, আত্ম-অবিশ্বাস, হতাশা ও দুর্বলতার অবস্থাতে যাওয়া মানে উচ্চ চেতনা থেকে আবার নিম্ন চেতনাতে ফিরে যাওয়া--ঐরকম অভ্যস্ত মনোভাবের মধ্যে ফিরে যাওয়াতেই বোঝা যাচ্ছে যে প্রাণের কোনো অংশ অমনি ক্ষুদ্র ও তামসিক ক্লিষ্ট হতাশ ভাবকেই আঁকড়াতে চাইছে, যার থেকে বেরিয়ে আসাই হলো যোগের লক্ষ্য।

সুতরাং তুমি যে বলেছো যে মা তোমার কাছ থেকে পরীলোকে যাবার ভুল চাবিটা কেড়ে নিলেন কিন্তু কোনো চাবিই দিলেন না, একথা ঠিক নয়। কারণ তিনি তোমাকে ঠিক চাবিটা কেবল দেখিয়েই দেননি, তা তোমার হাতে তুলেও দিয়েছেন। প্রফুল্ল হতে বলায় অস্পষ্ট উপদেশ দেওয়া মাত্রই নয়, তিনি স্পষ্ট দেখিয়ে দিয়েছেন যে ধ্যানের সময় ঠিক কেমন ভাবটি অনুভবে

আনা দরকার—কোনো কষ্টপ্রয়াস নয়, ভিতরে বিশ্রামযুক্ত হয়ে নীরবে নিজেকে খুলে ধরা, ব্যগ্র হয়ে কোনো কিছু আকর্ষণ করতে যাওয়া নয়, দিব্যশক্তির ক্রিয়া হবার জন্য নিজেকে একভাবে তার হাতে ছেড়ে দেওয়া, এবং সেই সঙ্গে বোধ করতে থাকা যে সেই শক্তি তার কাজ করছে, আর অচঞ্চল আস্থা নিয়ে কোনোরূপ চাঞ্চল্য আসতে না দিয়ে চুপচাপ থেকে তাকে কাজ করতে দেওয়া। এ ছাড়া তিনি তোমাকে জিজ্ঞাসাও করেছেন যে এমন রকমের ভাবটি তোমার জানা আছে কিনা, তাতে তুমি বলেছিলে যে ভালোই জানা আছে। ঐটি হলো চৈত্য উন্মীলনের অবস্থা, তোমার যদি তা হয়ে থাকে তাহলে তুমি জানোই যে চৈত্য উন্মীলন কাকে বলে; তার পরে অবশ্য আরো অনেক কিছু আসে, কিন্তু এই প্রয়োজনীয় অবস্থা এলেই তবে অন্যগুলি সহজে আসতে পারে। তোমার উচিত ছিল মা তোমাকে ঐ যে চাবিটি দিয়েছিলেন তা আপন চেতনার মধ্যে রেখে তাকে প্রয়োগ করা—আবার সেই বিষাদ ও দুঃখের দৃষ্টিভঙ্গীতে ফিরে গিয়ে আগেকার অন্ধকার মনোভাবকে বাড়তে না দিয়ে। ঐ সঠিক চৈত্য অবস্থাটি এলে তখন তুমি ডাকতে পারো, প্রার্থনা করতে আস্পৃহা, একাগ্রতা, ভাব-তীব্রতা, সব কিছুই আনতে পারো, কিন্তু তা আপনা থেকেই আসবে, কষ্ট-প্রয়াস ক'রে নয় বা প্রকৃতির উপর জোর খাটিয়ে নয়। ভুল ক্রিয়া হলে তাকে প্রত্যাখ্যান করা, ত্রুটি থাকলে তা মেনে নেওয়া, এগুলি বাধা না দিয়ে সাহায্যই করবে, কিন্তু ঐ মনোভাব বজায় রাখলে প্রত্যাখ্যান, দোষ স্বীকার প্রভৃতি আপনা হতেই হবে এবং তা ঐকান্তিক ও কার্যকরী হবে। এমন মনোভাব যারাই নিতে পেরেছে তারাই সেটা অনুভব করেছে।

আর একটা কথা বলে রাখি, চেতনা আর গ্রহিষ্ণুতা এক জিনিস নয়; তুমি গ্রহিষ্ণু হতে পারো অথচ বাহ্য ভাবে কিছু না জেনে যে কেমন ক'রে কি কাজ হচ্ছে। উচ্চ শক্তি কাজ করে অন্তরাল থেকে, যে কথা বার বার লিখেছি। তার ফল আড়ালে সঞ্চিত হয়ে থাকে, পরে একটু একটু ক'রে বেরোয়, শেষে যখন খুব বেশি চাপ পড়ে তখন কেটে বেরিয়ে আসে বাহ্য প্রকৃতিতে। মন ও প্রাণের দ্বারা সচেষ্ট হয়ে টানতে থাকা আর আপনা হতে চৈত্যের উন্মীলন হওয়ার মধ্যে যে বিলক্ষণ তফাৎ আছে এ কথা আমরা এই প্রথম বারই বলছি না। মা আর আমি দুজনেই বহুবার বলেছি যে জোর ক'রে টেনো না, চৈত্য উন্মীলনের ভাবটি নিয়ে থাকো। এটা ঠিক চাবি কিংবা ভুল চাবির প্রশ্ন নয়, চাবিটা তালাতে লাগিয়ে সোজা

দিকে বা উল্‌টো দিকে ঘোরানোর প্রশ্ন। তুমি হয়তো কোনো বাধা পেয়ে চাবির ওপরে জোর লাগিয়ে কেবল এদিক ওদিক ঘোরাচ্ছো, তা না ক'রে নিশ্চিত বিশ্বাস নিয়ে ধীরেসুস্থে সোজা ভাবে ঘোরালেই দরজা খুলে যাবে।

৫-৫-১৯৩২

বিচাবণাব প্রয়োজন

"কোনো বিচার বিবেচনা না ক'বে যা তোমাব মধ্যে নেমে আসছে তাকে আসতে দেবে", এমন সিদ্ধান্ত করা খুব বিপজ্জনক। যদি সে জিনিস দিব্য সত্যের অনুকূল না হয়ে বরং প্রতিকূল হয়, তাহলে তার ফল কি হবে তা ভেবে দেখেছ কি? বিরোধী শক্তিরা সাধককে নিজেব কবলে আনতে এর চেয়ে ভালো আর কিছু চায় না। কোনো বাধা না রেখে কেবল মায়ের শক্তিকে ও দিব্য সত্যকেই আসতে দেওয়া চলে। আর সেখানেও বিচার-শক্তিকে সজাগ রাখতে হয়, পাছে কোনো মিথ্যা মায়া মায়ের শক্তি বা দিব্যসত্য বলে নিজেকে জাহির ক'রে ঢুকে পড়ে, আর কোনো মিশ্রণ ঢুকে পড়লেও তাকে ছেঁকে ফেলে বাদ দেবার জন্য তার দরকার হয়।

আপন আধ্যাত্মিক নিয়তির নিশ্চয়তা সম্বন্ধে মনে বিশ্বাস রাখো, ভুল করা থেকে সরে দাঁড়াও, মায়ের আলো এবং শক্তির দ্বারা সরাসরি নিয়ন্ত্রিত হবার জন্য চৈত্য সত্তাকে আরো উন্মীলিত করতে চেষ্টা করো। তোমার ভিতরকাব ইচ্ছা যদি ঐকান্তিক হয় তাহলে যতবার ভুল করবে তা স্বীকার ক'রে সাবধান হলেই সঠিক রাস্তায় চলে আরো উচ্চে উঠে যেতে পারবে।

শক্তি অবতরণে বিপদ আসার বিরুদ্ধে হুঁশিয়ারি

উপর থেকে কিছু নেমে এসে যাতে কাজ করে তার জন্য কেবল নিজের উপর নির্ভর ক'রে থাকাই ঠিক নয়, সেখানে গুরুর সাহায্য নেওয়া খুব দরকার, আর যা কিছু হচ্ছে তা গুরুকে জানিয়ে তাঁর মত ও উপদেশ নেওয়া দরকার। কারণ প্রায়ই এমন হয় যে নিম্ন প্রকৃতির শক্তিগুলি সেই উচ্চ জিনিসের অবতরণে উত্তেজিত হয়ে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে নিজের

মতলবে লাগাতে পারে। অদিব্য শক্তিরা প্রায়ই এই কাজ করে, তারা পরমেশ্বরের বা মায়ের ভেক নিয়ে এসে সাধকের কাছ থেকে সেবা ও সমর্পণ আদায় ক'রে নেয়। তাদের যদি মেনে নেওয়া হয়, তখন তার যা কুফল হয় তা অতি মারাত্মক। অবশ্য সাধক যদি তার সমপণ ও আনুগত্য নিয়ে কেবল ভগবৎ নির্দেশেই চলে তাহলে সবই নির্বিঘ্ন হয়। ভগবানের দিকে এই মতি আর অহংগত ও অহংজাত সকল শক্তিকে প্রত্যাখ্যান, এই হলো সাধনার রক্ষা কবচ। কিন্তু প্রকৃতির ক্রিয়ার মধ্যে নানারকমের ফাঁদ থাকে, অহংএর ছদ্মবেশও আছে অসংখ্য রকম, অন্ধকারের শক্তিদের রাক্ষসী মায়াও অসাধারণ রকমে চতুর; আমাদের বুদ্ধি ভালো পরিচালক নয় আর সে প্রায়ই বিশ্বাসঘাতক হয়ে দাঁড়ায়, তার উপরে প্রাণের কামনা সর্বদাই লোভ দেখিয়ে ডাকছে। এই সব কারণেই আমাদের যোগে সমর্পণের উপর এত জোর দিয়ে থাকি--যাকে ইংরেজীতে 'সারেণ্ডার' বলা হয়েছে। হৃদয় কেন্দ্র খোলা থাকলে আর চৈত্যের দখল থাকলে তখন আর কোনো প্রশ্ন নেই, সবই নিরাপদ। কিন্তু নিচেকার উৎক্ষেপে চৈত্য যে-কোনো মুহূর্তে ঢাকা পড়ে যেতে পারে। খুব কম লোকই এমন বিপদকে এড়াতে পারে আর তারাই পারে সহজে সমর্পিত হতে। সে ক্ষেত্রে যিনি ভগবানের প্রতিনিধি স্বরূপ এমন গুরুর সাহায্য নিয়ে এরূপ কঠিন সাধনাতে তাঁর উপর নির্ভর করা অপরিহার্য।

×

তোমার এবং মায়ের শক্তির মাঝখানে কাউকে বা কোনো কিছুকেই আসতে দিও না। সেই শক্তিকে মেনে এবং অন্তরে রেখে তারই প্রেরণাতে সাড়া দিতে থাকা এবং মনের ধারণাকে আমল না দেওয়া, এরই উপর সাফল্য নির্ভর করে। ধারণা বা পরিকল্পনা কাজ করতে পারে যদি তার পিছনে সত্যের ও সেই শক্তির সমর্থন থাকে, নতুবা তা ব্যর্থ হবে।

×

তুমি যদি তোমার আস্থাকে ফিরে পেয়ে তাকে বজায় রাখতে চাও, তাহলে আগে মনকে নীরব ক'রে তাকে মায়ের শক্তির দিকে খুলে রেখে

তার মধ্যে বাধ্যতা আনো। তোমার মন প্রত্যেক জিনিসের প্রভাব মেনে নিয়ে, যদি বার বার উত্তেজিত হয়ে উঠতে থাকে তাহলে পরস্পর বিরোধী শক্তির ক্রিয়াক্ষেত্র হয়ে তুমি একটুও অগ্রসর হতে পারবে না। মায়ের জ্ঞানকে নেওয়ার বদলে তুমি নিজেরই অজ্ঞানতাকে অনুসরণ করবে, তাতে সহজেই তোমাব আস্থা চলে যাবে আর কেবল ভুল অবস্থাতে অযথা মনোভাব নিয়ে থাকবে।

পবিবর্তনে মায়ের শক্তির সাহায্য

তুমি যখন এখানে মায়ের কাছে মায়ের আশ্রয়ে রয়েছ তখন এটা ধরেই নেওয়া যায় যে পারবর্তন তোমার মধ্যে আসবে। মায়ের শক্তির সাহায্য এবং চাপ সবক্ষণই রয়েছে। তোমার উন্নতি শীঘ্র হতে পারা সম্পূর্ণই নির্ভর করছে তার দিকে নিজেকে খুলে রাখার উপর এবং অন্যান্য সব শক্তির সব কিছু পরামর্শ ও আক্রমণকে নীরবে দৃঢ়চিত্তে প্রত্যাখ্যান করার উপর। বিশেষ ক'রে প্রাণের স্নায়বিক উত্তেজনাকে বর্জন করা চাই; স্নায়বিক সত্তাতে ও দেহেতে ধীরস্থির শক্তি সঞ্চিত রাখাই হলো সমুচিত ভিত্তি। তোমার গ্রহণের জন্য তা প্রস্তুত, যদি নিজেকে তুমি সর্বদা খুলে রাখো।

২৭-৮-১৯৩২

×

বাধাবিপত্তিতে বির্চালত বা নিরুদ্যম হবে না, নীরবে সম্পূর্ণ সরলভাবে নিজেকে মায়ের শক্তির অভিমুখে খুলে রাখবে, তাকে তোমার মধ্যে পরি-বর্তন আনতে দেবে।

×

মায়ের শক্তি কেবল সত্তার উপরদিকেই নয়, তা রয়েছে তোমার সঙ্গে তোমার কাছেই, তোমার প্রকৃতি কেবল সাড়া দিলেই সে প্রস্তুত। এখানকার

সকলের বেলাতেই এই কথা।

১৫-১১-১৯৩৬

×

মায়ের শক্তি সব কিছুই করতে পারে, কিন্তু তোমার নিজের সত্তাকেও এবং তার নিচে কি আছে তাকেও উত্তরোত্তর তোমার জেনে নেওয়া চাই।

এখানে মনের বিচারের প্রশ্ন নয়—এসব ব্যাপারে তার কোনোই মূল্য নেই, এখানে কেবল চেতনা ও তার অনুভব ও দেখতে পাওয়ার কথা।

অন্যান্য সব কিছু যেমন নিম্ন স্তরে এসে ক্রিয়াশীল হয় অতিমানসের বেলা তা নয়। এখানে কেবল তার প্রচ্ছন্ন প্রভাব। নতুবা অতিমানসের উপলব্ধি সহজই হতো।

২২-৫-১৯৩৪

×

অন্য কোনো কিছুর উপর নির্ভর করা নয়, তা যতই সাহায্যকারী হোক, কিন্তু প্রধানত এবং মূলতঃ নির্ভর করবে একমাত্র মায়ের শক্তির উপর। সূর্য এবং আলোর কাছেও সাহায্য মেলে যদি তা আসল সূর্য ও আসল আলো হয়, কিন্তু তবু তা মায়ের শক্তির স্থান নিতে পারে না।

×

যে স্থিরচিত্ততা তোমার এসেছে তা তোমার ব্যক্তিগত গুণে নয়, মায়ের সঙ্গে সংস্পর্শ রাখাতে তা এসেছে—কারণ তাঁরই শক্তি সব কিছুর পিছনে থেকে কাজ করছে এবং তারই জোরে তোমার যা কিছু উন্নতি হচ্ছে। ওরই উপর নির্ভর করতে শেখো, ওরই দিকে সম্পূর্ণ উন্মীলিত হয়ে আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য সাধনা করো, তাও তোমার নিজের জন্য নয় কিন্তু ভগবানের জন্য—তবেই তুমি আরো নির্বিঘ্নে যেতে পারবে।

×

ওদের উন্নতি আসছে না দুই কারণে: (১) ওরা হতাশা ও বিষণ্ণতা ও অক্ষমতার মিথ্যা মায়াতে সহজেই আবিষ্ট হয়; (২) ওরা কেবল আপন শক্তি নিয়েই কাজ করে, জানে না বা গ্রাহ্য করে না যে কেমন করে মায়ের শক্তির ক্রিয়াকে আহ্বান করতে হয়।

১০-৬-১৯৩৬

মায়ের শক্তিকে প্রতিরোধ

তোমার যে এই সব রোগ হচ্ছে তার থেকে বোঝায় যে তোমার দৈহিক চেতনা মায়ের শক্তিকে প্রতিরোধ করছে। আর তুমি যে সাধনাতে অগ্রসর হওনি তার কারণ নিজেকে তুমি ভাগ ক'রে কিছু অংশ দখলে রেখেছ, সবটা সমর্পণ করোনি। তুমি বলো যে মাকে তুমি সমস্তই সমর্পণ করবে, অথচ যেটি মা তোমাকে করতে বলেছেন এবং তুমিও একাধিক বার সম্মত হয়েছ, সেটাই তুমি করোনি। মায়ের শক্তির ক্রিয়াকে আহ্বান করেও যদি তুমি অন্যান্য প্রভাবকে আসতে দাও তাহলে সকল বাধাবিপত্তি থেকে মুক্ত হবে এ তুমি কেমন ক'রে প্রত্যাশা করতে পারো?

২০-১১-১৯২৮

মায়ের চাপ দেওয়া

আমি কেবল তোমারই কথা বলেছি––এ কথা বলতে চাইনি যে মা কখনই চাপ দেবার ক্রিয়াটি প্রয়োগ করেন না। কিন্তু চাপও নানারকম হয়। শক্তির একরকম চাপ লাগে যখন তা মনে প্রাণে বা দেহে প্রবেশ করতে যায়––সে চাপ ত্বরান্বিত করতে, আরো আছে যা গঠন করবার জন্য, আরো আছে যা কিছু ভাঙবার জন্য, আরো অনেক রকম আছে। তোমার বেলাতে যদি চাপ এসে থাকে তা হলো তোমাকে সাহায্য বা সমর্থন করতে বা আক্রমণ দূর ক'রে দিতে, যদিও তাকে রীতিমতো চাপ বলতে পারি না।

মায়ের মহাকালী শক্তির প্রয়োগ

> প্রঃ আপনার পুস্তক The Mother এর ৫৬ পৃষ্ঠাতে মায়ের মহাকালী শক্তির সম্বন্ধে বলেছেন যে "মায়ের বাহুগুলি প্রসারিত আছে আঘাত করা ও অভয় দেবার জন্য," এখানে আঘাত কথার অর্থ কি?

উঃ ওটা জগতে তাঁর সাধারণ ক্রিয়ার অর্থে। তিনি অসুরের উপরেও আঘাত হানেন, যা কিছু বর্জনীয় বা বিনাশযোগ্য তারও উপরে আঘাত হানেন, সাধনার পক্ষে যা কিছু বাধা তারও উপরে হানেন, ইত্যাদি। তবে এটা বলতে পারি যে তোমার বেলাতে মা কখনো মহাকালী শক্তি বা তার চাপ প্রয়োগ করেন না।

৫-৬-১৯৩৬

×

> প্রঃ মায়ের মহাকালী স্বরূপের সম্বন্ধে আপনি The Mother পুস্তকটিতে বলেছেন: "যখন তিনি তাঁর এই শক্তিকে প্রয়োগ করতে আদিষ্ট হন তখন যা কিছু প্রতিবন্ধক বা সাধকের যত কিছু শত্রুদল সব এক নিমেষে যেন অসহায় তৃণগুচ্ছের মতো ভেঙে গুঁড়িয়ে যায়"। মহাকালী শক্তির এই ক্রিয়া কেমন ক'রে অনুভব হবে?

উঃ তা বোধ হবে হঠাৎ একটা ক্ষিপ্র, সুনির্দিষ্ট, অবশ্যম্ভাবী ক্রিয়ার মতো। এ শক্তি যখন কাজ করে তখন তার পিছনে থাকে অতিমানসের সমর্থন, এবং তার হুকুমের বিরুদ্ধে কোনো আপীল চলে না। যা করা হয় তাকে আর রদ করা বা বদল করা যায় না। বিরোধী শক্তিরা চেষ্টা করে, এমন কি আক্রমণও করতে পারে, কিন্তু তাদের ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতে হয়, আর তারা চলে যাবার পরে দেখা যায় যে আক্রান্ত স্থান সম্পূর্ণ অবিকৃত আছে—আক্রমণের কালেও তাই থাকে। আর দেখা যায় যে আগে যে সকল বিপত্তি খুব প্রবল ছিল তার দাপট শিথিল হয়েছে, তার ভয়াবহতা

নষ্ট হয়েছে, কিংবা স্তিমিতভাবে জ্বলতে জ্বলতে নিভে যাবার মতো হয়েছে। "অদিষ্ট" হওয়া বলেছি এই কারণে যে মহাকালীর এরূপ শক্তিক্রিয়া অপেক্ষাকৃত বিরল, সাধারণত তাঁর অন্যান্য শক্তি বা মহাকালীর আংশিক শক্তিই কাজ করে।

২৪-৮-১৯৩৩

সাধনাতে কোন শক্তির ক্রিয়া

> প্রঃ এঁকি ঠিক কথা যে আমাদের সাধনাতে প্রধানত মায়ের মহাসরস্বতী অংশ কাজ করছে?

উঃ বর্তমানে সাধনা দৈহিক চেতনার স্তরে নেমে আসার পর থেকে—বরং বলা যায় যে মহেশ্বরী-মহাসরস্বতী শক্তি মিলিত হয়ে কাজ করছে।

২৫-৮-১৯৩৩

প্রাথমিক প্রস্তুতির চেতনাতে মায়ের ক্রিয়া

তোমার অনুভূতিগুলি উপলব্ধির প্রারম্ভ হিসাবে ভালোই। ওকে আরো গভীরতর দীপ্তির অবস্থাতে আনতে হবে যাতে তোমার মধ্যে উচ্চতর চেতনা নেমে আসবে। এখনকার যে চেতনাতে ওগুলি হয়েছে তা প্রথম প্রস্তুতি মাত্র—ওতে বর্তমান চেতনা ও তোমার কর্ম অনুসারে মায়ের কাজ হয় বিশ্বশক্তির মারফতে, যার কাজ সফল ও বিফল দুইই হতে পারে—তাতে সমান মনোভাব নিয়ে চেষ্টা চালাতে হবে। এরূপ চেতনার অবস্থাতেও অভ্রান্ত নির্দেশ মিলতে পারে যদি তুমি অন্যান্য সকল রকমের শক্তি বা তার প্রভাব থেকে সম্পূর্ণ রিক্ত হয়ে সরাসরি একমাত্র মায়েরই নির্দেশ পাবার অপেক্ষাতে সম্পূর্ণরূপে কেবল তাঁরই মুখ চেয়ে থাকো—কিন্তু অমন অবস্থা আনাও কঠিন আর রাখাও কঠিন—কারণ তার জন্য চাই বিশেষ রকমের একমুখী ও নিরন্তরের আত্মনিবেদন। উচ্চতর চেতনা যখন নেমে আসবে, তখনই হতে পারে আরো ঘনিষ্ঠতর মিলন, আরো আন্তরিক

উপস্থিতিবোধ এবং আরো দীপ্তিদায়ক বোধির উদয়।

১৭-১১-১৯৩৪

দূর থেকে মায়ের শক্তিকে গ্রহণ

তোমার বন্ধু যা জানতে চেয়েছে, সে এখানে না এসেও শক্তি পেতে পারে যদি ওখানে থেকেই তার হৃদয়ে মায়ের প্রতি তেমন ভক্তি জাগে ও তীব্র রকমের ডাক হতে থাকে।

২৫-৮-১৯৩৫

×

> প্র ঃ আমার ঐ বন্ধুটির সম্বন্ধে আপনি বলেছেন যে মায়ের শক্তিকে সে পাচ্ছে। এতে আমি একটু বিভ্রান্ত হচ্ছি, ঠিক বুঝতে পারছি না কোন মায়ের কথা বলছেন। আমাদের এই মা না সকলের জানা বিশ্বমাতা? একথা বলার কারণ সে তো কখনো মাকে চায়নি তবু সে মায়ের শক্তিকে পেয়ে গেল?

উ ঃ দিব্যশক্তি যা মায়েরই শক্তি তার "স্পর্শ পাওয়ার" কথাই বোধ করি আমি লিখেছিলাম। কিন্তু তুমি কি তার চিঠি এবং ফটো আমাদের কাছে পাঠিয়ে আমাদের সঙ্গে তার একটা সংস্পর্শ ঘটিয়ে দাওনি? আর খ-এর সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হওয়াতে তার কথাতেও সে কি বিশেষ প্রভাবান্বিত হয়নি---এও তো একটা তৃতীয় সংস্পর্শসূত্র? ওর মধ্যে প্রকৃত শ্রদ্ধা ও যোগের দিকে টান থাকলে তাতেই স্পর্শলাভের পক্ষে যথেষ্ট হয়।

১৯৩৬

×

মা তাকে জানিতভাবে শক্তি প্রেরণ করছেন কিনা জানি না; তাঁকে

জিজ্ঞাসা করিনি। তবে এখানে কথা এই, যারই মধ্যে শ্রদ্ধা ও ঐকান্তিকতা রয়েছে, যার চৈত্য জাগতে শুরু করেছে ও যে নিজেকে খুলতে পেরেছে, সেই পেতে থাকবে মায়ের শক্তিকে, নিজে সে তা জানুক কিংবা নাই জানুক। ঐ ক যদি কল্পনাও করে যে সে তা পাচ্ছে, তার থেকে প্রকৃত পাবার রাস্তা তার খুলে যাবে---আর তা যদি সে অনুভব ক'রে থাকে, সেটা সন্দেহ করার কারণ কি? সে নিশ্চয় পরিবর্তন আনতে খুব চেষ্টা করছে, আর গোড়াতে তাইই দরকার; চেষ্টা থাকলে তা আসবে অল্পবিস্তর সময়ের মধ্যে।

২৮-৬-১৯৪৩

×

তোমার পক্ষে ঘরে বসে আর আপন কাজে নিযুক্ত থেকে সাধনা করা খুবই সম্ভব---অনেকেই তাই করে। প্রথমে কেবল দরকার মাকে যত বেশি পারা যায় স্মরণ করতে থাকা, প্রত্যহ খানিকক্ষণ হৃদয়ে তাঁর প্রতি একাগ্রতা এনে থাকা, সম্ভব হলে তাঁকে আদ্যাশক্তি জগন্মাতা বলে জ্ঞান করা, তোমার মধ্যেই তিনি আছেন এটা অনুভব করতে আস্পৃহা করা, তোমার সব কাজ তাঁকে নিবেদন করে প্রার্থনা করা যে তিনি যেন তোমাকে নির্দেশ দেন ও রক্ষা করেন। এই হলো প্রাথমিক সাধনার অবস্থা যা প্রায়ই অনেকদিন পর্যন্ত চলতে পারে, কিন্তু ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় নিয়ে ওতে লেগে থাকলে মনের মধ্যে ধীরে ধীরে পরিবর্তন এসে সাধকের মধ্যে একটা নতুন চেতনা দেখা দেবে যা নিজের মধ্যে মায়ের উপস্থিতি এবং প্রকৃতিতে ও জীবনে তাঁর ক্রিয়া উত্তরোত্তর স্পষ্টভাবে জ্ঞাত হবে, তা ছাড়া আরো নানারকম আধ্যাত্মিক অনুভূতি আসবে যা প্রকৃত উপলব্ধির দ্বার খুলে দেবে।

×

মাকে স্মরণ করো, আর যদিও তুমি তাঁর থেকে অনেক দূরে আছো তবু এটা বোধ করতে চেষ্টা করো যে তিনি তোমার সঙ্গেই আছেন, আর তাঁরই ইচ্ছা রূপে তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তা যেমন বোধ করবে সেই অনু-

যায়ী কাজ ক'রে যাও। তাহলে তুমি সেখানে তাঁর এবং আমারও উপস্থিতি সব চেয়ে ভালো ভাবে অনুভব করতে পারবে, আর সেই উপস্থিতির আব-হাওয়াটি সর্বত্র তোমার সাথে সাথে রেখে নিজের চারিদিকে একটা নিরাপত্তা ও অচঞ্চলতার পরিবেষ্টনী নিয়ে তারই মধ্যে সর্বক্ষণ অবস্থান করবে।

১২-১২-১৯৩৬

মায়ের ফটো থেকে শক্তি লাভ

প্র ঃ মায়ের ফোটোর বা তাঁর চরণ চিত্রের সামনে যখন ধ্যানে বসি তখন শক্তি লাভ বোধ করি। এ কি ভাবাত্মক অনুভব?

উ ঃ না, কেবল তাই নয়। ওগুলির সামনে বসে ধ্যান করাতে তুমি ওর মাধ্যমে মায়ের সান্নিধ্যে গিয়ে পড়ো যেখানে তাঁর শক্তি ও উপস্থিতির কিছু অস্তিত্ব থাকে।

১৪-৭-১৯৩৪

মা ও তাঁর আরোগ্য শক্তির ক্রিয়া

প্র ঃ ক-এর সঙ্গে আমার খুব তর্ক হয়ে গেল মায়ের আরোগ্য শক্তি নিয়ে। তার মত এই যে ওটা যখন এখানে এসে গেছে তখন তা এর পর জগতের সর্বত্রই কাজ করবে, আর যে-কোনো টম, ডিক বা হ্যারির মাধ্যমে তা কাজ করবে, তারা আধ্যাত্মিক না হয়েও। এ কি ঠিক কথা?

উ ঃ তা অমন কাজ করতেও পারে, কিন্তু গোড়ায় অন্তত প্রত্যেক টম, ডিক, হ্যারির মাধ্যমে নয়।

৩-২-১৯৩৬

×

> প্রঃ আমি বলেছি যে আরোগ্য শক্তি কেবল মায়ের ভিতর দিয়েই কাজ করবে এবং যারা তাঁর সঙ্গে চেতনভাবে সহযোগিতা ক'রে তাঁর সঙ্গে প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে এসেছে তারাও তার প্রয়োগ করতে পারবে। এমন কেউ না হলে অন্য কেউই তা পারবে না। আপনি কি বলেন?

উঃ প্রথম দিকে অবশ্য তাই বটে, কিন্তু তা যদি সত্য শক্তি রূপে পার্থিব চেতনাতে স্থায়িত্বলাভ করে তখন তা সাধারণ ভাবে অতিভৌতিক একটি আরোগ্য শক্তি রূপে কাজ করতে পারা সম্ভব।

সহযোগিতা যে সব সময় চেতনভাবেই হবে, যেমন তুমি বলেছ, তা না হতেও পারে। যেমন, কুই লোকটি ছিল মায়ের এই ক্রিয়ার সহযোগী কিন্তু নিজে তা জানতো না। কিন্তু মা আমাকে অনেকদিন আগেই বলেছিলেন যে ঐ লোকটি তার কাজের প্রথম থেকেই এই শক্তির কিছু পাচ্ছে যখন কেউই তাকে চিনতো না (মা অবশ্য তখন তার নামও জানতেন না, কেবল তাকে ও তার কাজ সম্বন্ধে এমন বর্ণনা দিয়েছিলেন যে তার থেকে ওর পরিচয় স্পষ্টই জানা গেল)।

৩-২-১৯৩৬

×

> প্রঃ শরীরে যে গরম বোধ করছি, সেটা কি জ্বরের জন্যে, বা মায়ের শক্তির জন্যে যা আমার আধারে খুব জোরে ধাক্কা দিচ্ছে?

উঃ এটা বিবেচনা করে দেখতে হবে। খুব সম্ভব, এই গরম তপঃ-শক্তির ফলে। কিন্তু প্রশ্ন থেকে যায় যে এই গরম আংশিকভাবে শরীরে জ্বরে পরিণত হয়েছে কি না।

৭-৬-১৯৩৬

×

প্র ঃ আপনি প্রায়ই বলেন "মায়ের শক্তি'র" কথা। সেটা কি জিনিস?

উ ঃ তা হলো দিব্যশক্তি যার দ্বারা অজ্ঞানতা দূর হয় আর সাধারণ প্রকৃতি দিব্য প্রকৃতিতে পরিবর্তিত হয়।

১৮-৬-১৯৩৩

×

প্র ঃ আজ সন্ধ্যা থেকে আমার মধ্যে শক্তি'র কাজ শুরু হয়েছে। সন্ধ্যাতে মায়ের দর্শনে আমার চেতনা খুলে গেল তাঁর সামনে আপনা হতেই আগের চেয়ে অনেক ব্যাপক-ভাবে।

উ ঃ খুব ভালো কথা। বাধা প্রভৃতি সত্ত্বেও দিব্যশক্তি ঐভাবে কাজ করে এবং দফায় দফায় আরো জোরালো ও পূর্ণতর হয়ে ওঠে।

৪-৮-১৯৩৪

×

মায়ের শক্তি যাতে দেহের উপর পূর্ণরূপে কাজ করতে পারে সেজন্য কেবল মনই নয় কিন্তু দেহকেও শ্রদ্ধার সঙ্গে উন্মীলিত হতে হবে।

৯-১০-১৯৩৩

×

প্র ঃ মায়ের শক্তি কি দৈহিক প্রকৃতির উপর কাজ করতে শুরু করে আভ্যন্তরীণ অংশগুলি প্রস্তুত হয়ে ওঠার পরে?

উ ঃ সাধারণত তাই হয়, কিন্তু তথাপি ভিতরকার অংশে সব সময়েই মায়ের কাজ চলতে থাকে, কারণ দুই কাজেই একটা যোগাযোগ থাকে।

×

প্র ঃ টেনে আনার মানে কি? যখন প্রাণের কামনার তাগিদে মায়ের কাছে কিছু চাইতে থাকি তাকেই কি বলে টেনে আনা? তার ফলে কি হয়?

উঃ হাঁ, ওটা এক ধরনের টানা---তার ফলে চেতনা অন্ধ ও বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে। কিন্তু সঠিক কিছুর জন্য টানা খারাপ জিনিস নয়, যা অনেকেই করে---যেমন আলো, শক্তি, আনন্দের জন্য। কিন্তু শান্তভাবে খোলার চেয়ে ওতে প্রতিক্রিয়া হয়।

১-৬-১৯৩৩

×

না, সাধককে অসুস্থ ক'রে দিয়ে তার উন্নতি আনা মায়ের পদ্ধতি নয়। কিন্তু কখনো হয়তো মাথাধরা হতে পারে, যদি মস্তিষ্কের ক্রিয়া জোরালো হয় কিংবা মস্তিষ্ক নিতে না চায়। যোগের মাথাধরা স্বতন্ত্র রকম, মস্তিষ্ক সাড়া পেয়ে গেলে তা আর আসতে পারে না।

২০-৬-১৯৩৫

×

প্র ঃ আজ অনুভব করলাম, মা আমার মাথার মধ্যে আলো দিচ্ছেন। তা কি আমার কল্পনা, অথবা প্রকৃতই মা আলো দিলেন?

উঃ তিনি প্রত্যহই তাই করেন, কেবল আজই তুমি চেতনভাবে তা গ্রহণ করলে।

৮-৫-১৯৩৩

মায়ের ক্রিয়া বুঝতে পারা

প্র ঃ মায়ের শক্তি আমাদের মধ্যে কখন কি কাজ করছে আমাদের উন্নতির জন্য তা কি সব সময় বুঝে নেওয়া দরকার ?

উ ঃ বহুজন না বুঝেই তাড়াতাড়ি অগ্রসর হয়ে যায়, তারা কেবল লক্ষ্য করে আর বলে "মায়ের হাতে ছেড়ে দিলাম"। তারপর আসে জ্ঞান ও বোধ।

১৭-৭-১৯৩৩

×

প্র ঃ মায়ের সম্বন্ধে আপনি বলেছিলেন "মায়ের শক্তি সম্বন্ধে চেতনা চাও"। তার মানে কি আমি সেই শক্তিকে জানতে আস্পৃহা করব ?

উ ঃ হাঁ, কেবল মনের দ্বারা নয়, ভিতরে অনুভূতিতে বোধ করা।

১৮-৬-১৯৩৩

×

প্র ঃ মনে করুন কোনো বিভ্রাটে পড়ে উপর থেকে মায়ের শক্তিকে আহ্বান করছি। কেমন ক'রে জানবো সে শক্তি নামলো কিনা ?

উ ঃ তা বোধ ক'রে এবং তার ফল দেখে।

২৬-৬-১৯৩৩

×

প্র ঃ মনে করুন সে শক্তি নেমেছে, আমি আমার কাজ ঠিক করছি ; তখন কি আমি তাকে বলব আমাকে রক্ষা করতে বাহ্য প্রভাব থেকে আর মায়ের সঙ্গে সংযোগ রাখতে, যদিও তখন মন থাকবে অন্য কাজে ব্যাপৃত?

উ ঃ মায়ের শক্তিকে তুমি হুকুম করতে পারো না, কারণ মায়ের শক্তির অভিব্যক্তি মানে স্বয়ং মা-ই সেখানে।

২৬-৬-১৯৩৩

×

প্র ঃ শক্তি কেমন ভাবে কাজ করে তা আমি বুঝি না।

উ ঃ তুমি কি ভাবো যে শক্তি মানে তা ক্রিয়াশূন্য অথবা তা বলহীন? ক্রিয়া করা ছাড়া শক্তির কি অর্থ হয়?

২৬-৬-১৯৩৩

মায়ের শক্তির সঙ্গে নিম্ন প্রকৃতির মিশ্রণ

প্র ঃ আপনি বলেছেন, "মায়ের শক্তি মনের মধ্যে এবং সর্বত্রই তার আপন ক্রিয়া করে"। তাহলে মন ও অন্যান্য অংশ সেই অনুযায়ী নিজেদের প্রকাশ করবে।

উ ঃ সেটাই সমুচিত অবস্থা বটে, যদি সে শক্তি খাঁটী থাকে---কিন্তু প্রায়ই তার সঙ্গে প্রকৃতির যথেষ্ট মিশ্রণ হয়, বিশেষত সাধনার বর্তমান অবস্থাতে।

৩-৮-১৯৩৪

প্র ঃ তাহলে এটাই কি ঠিক কথা নয় যে আমার চেতনা

যাকে মায়ের শক্তি বলে জানছে, তা মায়ের খাঁটী শক্তি নয়?

উঃ আমি বলেছি যে মন প্রাণ দেহের বর্তমান ক্রিয়াতে তার মধ্যে মিশ্রণ হয়। তা তো হবেই, তারই উপর শক্তিকে কাজ করতে হয়। রূপান্তর হয়ে গেলে তখন মায়ের শক্তি বিনা মিশ্রণে পুরোপুরি কাজ করে। যদি গোড়া থেকেই তা বিনা মিশ্রণে কাজ করতো বর্তমান প্রকৃতিকে না নিয়ে, তাহলে সাধনার দরকারই হতো না, বিনা নিয়মে ও বিনা কারণে মানব প্রকৃতি ম্যাজিকের মতো দিব্য প্রকৃতিতে রূপান্তরিত হয়ে যেতো।

৪-৮-১৯৩৪

×

প্রঃ কেমন ক'রে জানবো যে কোনো বিশেষ চিন্তা বা বোধ বা প্রেরণা আসছে মায়েরই কাছ থেকে, অন্য কোনো শক্তির নয়? মিথ্যা শক্তি হলে তা অবশ্য টের পাওয়া যায়, কিন্তু আরো অনেক বিভিন্ন শক্তি আছে যার থেকে আসে, সেখানে মায়ের জিনিস না হলেও আমরা তাকে তাই মনে করি।

উঃ সেখানে দরকার বিচারণা, সতর্কতা, ঐকান্তিকতা, মনের ক্রিয়ার উপর একটা নিত্য সংযম, এবং চৈত্যের দক্ষতা যা মনের নকলকে অথবা মিথ্যা প্ররোচনাকে মায়ের নয় বলে ধরে ফেলতে পারে।

২৭-৪-১৯৩৩

৭

মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ

মায়ের সঙ্গে সম্বন্ধ

মায়ের সঙ্গে সাধকদের সম্বন্ধ

মাকে যারা মানে তাদের সঙ্গে মায়ের সম্বন্ধ হয় চৈত্য ও আধ্যাত্মিক মাতৃত্বের। তাই পার্থিব মা ও সন্তানের দৈহিক সম্বন্ধের চেয়ে এ সম্বন্ধ অনেক বেশি বড়ো; মানব মাতার থেকে যা মেলে তার সব কিছুই এতে মেলে আরো উচ্চতর ভাবে, তাছাড়া ওর মধ্যে অসংখ্য রকমে আরো অনেক কিছু থাকে। এতখানি বড়ো ও পূর্ণতর রকমের জিনিস হওয়াতে এ সম্বন্ধের কাজ পার্থিব সম্বন্ধের চেয়ে অনেক বেশি হয়, আভ্যন্তর ও বাহ্য জীবনে দুদিক দিয়ে। এর মধ্যে না বোঝবার মতো কিছু নেই, যার সহজ জ্ঞান ও অবিকৃত বুদ্ধি আছে সে অনায়াসেই বুঝবে। ঘরে মা আছেন, তাতে এই বৃহত্তর ও আধ্যাত্মিক সত্যের পক্ষে কোনোই বাধা হতে পারে না বা একে মিথ্যা করা যায় না। ক খুব ঠিক কথাই বলেছে যে ইনিই তার প্রকৃত মা; কারণ ইনি তাকে নবজন্ম দিয়েছেন আধ্যাত্মিক জীবনে আর দিব্য অস্তিত্বের জন্য তাকে নতুন ক'রে গড়ছেন।

আধ্যাত্মিক মাতৃত্ব জিনিসটা এ আশ্রমের নতুন আবিষ্কার নয়; এটি এক শাশ্বত সত্য যা যুগ যুগ থেকে ইউরোপ এবং এশিয়াতে স্বীকৃত হয়ে এসেছে; আর দৈহিক সম্বন্ধ ও চৈত্য আধ্যাত্মিক সম্বন্ধের যে পার্থক্য আমি বললাম তাও নতুন আবিষ্কার নয়; এটাও সর্বত্রই জানা আছে আর একথা যে সরল ও সহজবোধ্য তা সকলেই বলবে।

২৩-১০-১৯২৯

মায়ের সঙ্গে বিশেষ সম্বন্ধ

এ কথা ঠিকই যে ভগবানের কোনো পক্ষপাতিত্ব নেই, তাঁর কাছে সকলেই সমান, কিন্তু তাই বলে প্রত্যেকের সঙ্গে তাঁর বিশেষ রকমের কোনো

সম্বন্ধ হতে পারে না এমন নয়। তার জন্য যে কিছু একাত্মতা বা মিলন হওয়াই দরকার তাও নয়। যার আত্মা বিশুদ্ধ সে সহজেই ভগবানের কাছে পৌঁছে যায়। কিন্তু যাদের প্রকৃতি অত উন্নত নয় তারাও নানা রাস্তায় তাঁর কাছে যেতে পারে। একাত্মতা হলে আধ্যাত্মিক মিলন ঘটে, কিন্তু অন্যান্য কারণ থেকে তাঁর সঙ্গে অন্যান্য রকম ব্যক্তিগত সম্পর্কও স্থাপিত হতে পারে। একই কারণে সকল সম্পর্ক হলে তা জটিল হয়ে পড়ে।

যোগীরা যারা মায়ের সাহায্য চায় না তাদের পক্ষে মায়ের সঙ্গে ব্যক্তি-গত সম্পর্কের কোনো দরকার হয় না—দূর থেকে আধ্যাত্মিক সংযোগ মাত্রই থাকে। কারো কারো সাধনার বিশেষ অবস্থাতে বিশেষ কিছু সম্পর্কের প্রয়োজন হতে পারে। অপরপক্ষে মায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে অথচ সাধনার দিকে কিছু নেই, এমনও হয়। এ বিষয় নিয়ে অনেক রকম সম্ভাবনা হতে পারে।

যারা এখানে এসেছে চৈত্যের যথেষ্ট উন্নতি ঘটিয়ে তাদের সঙ্গে মায়ের যে বিশেষ সম্পর্ক ঘটেছে সে কথা তারা জানে। অন্যেদের পক্ষে উপলব্ধির চেয়ে সম্ভাবনাই বেশি।

মোটের উপর বলা যায় যে এখানে সত্তার অভিব্যক্তির তিন রকম অংশ নিয়ে কাজ হচ্ছে: (১) বিবর্তনপ্রাপ্ত চৈত্য সত্তা, যে তার পূর্ব জীবনের অনুভূতি ও বিগত কতকটা ব্যক্তিত্বও সঙ্গে এনেছে যাতে বর্তমান জীবনে তা সহায়ক হয়; (২) বর্তমানে গড়ে ওঠা সত্তা যা তার জন্মার্জিত জটিল উপাদানের মিশ্রণ; (৩) ভবিষ্যৎ সত্তা, আমাদের নিজেদের বেলাতে যার মানে বর্তমানের আরো উচ্চতর চেতনা, যা বর্তমানের সঙ্গে যুক্ত হয়ে বর্ত-মানের রূপান্তরের প্রচেষ্টাকে সফল করবে।

ঐ চৈত্য সত্তারাই এনেছে তার আগেকার সম্পর্ক তার পূর্বজন্ম ও ব্যক্তিত্বের ভিতর দিয়ে, অর্থাৎ যা মূলগত থেকে এখনও ক্রিয়াশীল।

কিন্তু ও ছাড়া এমন আরো চৈত্য সত্তা এখানে এসেছে ঐ উচ্চতর চেতনার কাজে যোগ দিতে প্রস্তুত হয়ে, যারা উচ্চ স্তরেরই সত্তা হওয়াতে মায়ের উদ্দিষ্ট কর্মের মধ্যে ঘনিষ্ঠভাবে যোগ দেবার পক্ষে বিশেষ রকমে উপযোগী। এদের সঙ্গে মায়ের বিশেষ সম্পর্ক, যা পূর্বজীবনেও ছিল।

আর যারা বর্তমান সংগঠন নিয়ে এসেছে তাদের মধ্যে এমন সব উপাদান আছে যার ফলে মায়ের সঙ্গে যোগ না থাকায় মায়ের থেকে নিজে-দের স্বতন্ত্র বোধ করতে পারে। এরাই নিজেদেরকে বাধাস্বরূপ মনে করতে

পারে; কিন্তু ওটা বাহ্য সংগঠনের ফল যার বর্তমান রূপের সঙ্গে অতীত বা ভবিষ্যৎ বিবর্তনের কোনো যোগ নেই, অতএব তা নিশ্চয় দূর হবে কিংবা বদ্‌লে যাবে।

১০-৬-১৯৩৫

×

সাধকটি যদি মায়ের প্রতি অবিশ্বস্ত হয়, তার মানে সে মাকে চায় না বা এই সাধনা চায় না, সে চায় কেবল আপন অহং ও কামনা পূরণ। এ কখনো যোগ নয়।

মা কাউকে "ঘন্টা যাবৎ" সাক্ষাৎ দেন না--কেউ যদি তাঁর কাছে অনেক ঘন্টা যাবৎ থাকে তাহলে তিনি ক্লান্ত হয়ে পড়বেন।

মা যে ক-কে বেশিক্ষণ কাছে রেখেছিলেন তা অন্যেদের চেয়ে তাকে বেশি ভালোবাসেন বলে নয়, তাকে দিয়ে এমন কিছু বিশেষ কাজ করাতে চাইছিলেন যা সম্পন্ন হলে সকলের পক্ষেই জয় হতো। কিন্তু সে এটিকে ভুল ভাবে নিয়ে মায়ের সঙ্গে ব্যক্তিগত দৈহিক সম্বন্ধ বলে আঁকড়ে আপন অহংজাত কামনার পরিতৃপ্তি ঘটাতে চাইলে, তাই ব্যর্থ হয়ে তাকে চলে যেতে হলো। তোমার ঐ "অংশ"ও চাইছে ঐ নির্বোধের মতো একই রকমের দাবী করতে, আর মা যদি না বুঝে ওতে সম্মতি দিতেন তাহলে শেষে অবস্থাটা ক-এর মতোই দাঁড়াতো।

মা দেহ ধারণ করেছেন দৈহিক প্রকৃতিরই দিকের কাজের জন্য (আর স্থূল জগতেরও পরিবর্তন), তিনি কারো সঙ্গে "দৈহিক সম্পর্ক" করতে এখানে আসেননি। আর যারা এসেছে এখানে তারা এসেছে তাঁর কাজে অংশগ্রহণ করতে, আবার অন্যেদের তিনিই ডেকে এনেছেন, আরো অন্যেরা এসেছে আলোর সন্ধানে। প্রত্যেকের সঙ্গেই তাঁর কিছু ব্যক্তিগত সম্বন্ধ আছে বা তার সম্ভাবনা আছে, কিন্তু প্রত্যেকটি সম্বন্ধ তার নিজেরই ধরনের, কেউ এমন বলতে পারে না যে প্রত্যেকের জন্য একই রকম হোক। কেউ এমন দাবী করতে পারে না যে অন্য কাউকে কাছে থাকতে দেন বলে তাকেও তিনি কাছে থাকতে দিন। কেউ কেউ মায়ের সঙ্গে কোনো ব্যক্তিগত কোনো সম্পর্ক বেছে নিয়েছে কিন্তু মায়ের কাছে খুব কমই আসে--কেউ আবার কার্যগতিকে মায়ের কাছে অনেকবার গেলেও বা অনেকক্ষণ থাকলেও

তেমন কিছু ব্যক্তিগত সম্পর্ক রাখেনি। এই নিয়ে গাণিতিক সংখ্যাঘটিত নিয়ম বাঁধতে যাওয়া বোকামি। এটা তোমার দৈহিক মনের কাজ, তার যেমন ধারণা ও আদর্শ মায়ের তা নয়, মা যে কেন কি করছেন তা সে কিছুই বোঝে না। আর তোমার ব্যক্তিগত প্রাণসত্তার দাবী ও কামনা অনুযায়ী তারই মাপে মায়ের চলা উচিত এমন মনে করা আরো খারাপ। ওতেই হয় আধ্যাত্মিক পতন। মা যা করেন তা প্রত্যেক ক্ষেত্রে আলাদা আলাদা রকম কারণে।

মায়ের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ মিলন ও বাহ্য সংযোগ

আধ্যাত্মিক মিলন ভিতর দিক থেকে শুরু হয়ে সেখান থেকে সর্বত্র বিস্তৃত হবে; বাহ্য কোনো কিছু থেকে তা হয় না—–কারণ তা করতে গেলে সে মিলন আধ্যাত্মিক বা খাঁটী জিনিস হয় না। এখানে অনেকে ঐরকম ভুল ক'রে থাকে; তারা মায়ের সঙ্গে বাহ্য প্রাণগত বা দেহগত সম্পর্কের উপরেই সমস্ত ঝোঁক দিয়ে চায় সেই মতোই আদানপ্রদান বা সংস্পর্শ, আর তা আশামতো ভাবে না পেলেই তখন শুরু হয়ে যায় নানারকম অভি-যোগ, বিদ্রোহ, সন্দিগ্ধতা, মুখভার। এই ভুল রকমের দৃষ্টিভঙ্গী নেওয়াতে যত কিছু গণ্ডগোল ও বাধার সৃষ্টি হয়েছে। মন প্রাণ দেহও মিলনেতে অংশ নেবার জন্য রয়েছে, কিন্তু চৈত্যের ভিতর দিয়ে তাকে চৈত্যগত হতে হবে, সে মিলন মন প্রাণ দেহ থেকে বিস্তার নিয়ে মূলতঃ হবে চৈত্য আধ্যা-ত্মিক মিলন। এমন কি দেহও তখন অদৃশ্যভাবে মায়ের নৈকট্য ও নিরেট রকমের উপস্থিতি বোধ করতে থাকবে—–তবেই সে মিলন সম্পূর্ণতর হবে, আর কেবল তখনই মায়ের কাছে বা সংস্পর্শে গেলে তার প্রকৃত মর্ম বুঝবে ও তার আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য সফল হবে। তত কাল পর্যন্ত বাহ্য সংস্পর্শ আভ্যন্তরীণ সাধনার পক্ষে সহায়ক হতে পারে,—–কিন্তু কতটা পর্যন্ত তাকে দেওয়া যায় কিংবা কতখানি তার সহায়ক বা প্রতিবন্ধক হতে পারে, সে কথা কেবল মা-ই বিচার করবেন, সাধক তা করতে পারে না—–কারণ তা করতে গেলেই সে আপন কামনা ও নিম্ন প্রাণগত অহংএর দ্বারা পথভ্রষ্ট হবে, যা বস্তুত অনেকের বেলাতেই হয়েছে। যখন প্রাণের তরফের চাহিদা থাকে তার যত বিদ্রোহী রকমের দাবী নিয়ে আর বাহ্য নৈকট্য বা সংস্পর্শ

পেতে খোঁজে সেই দাবী মেটাবার উদ্দেশ্যে, তখন আভ্যন্তরীণ সংযোগের পক্ষে তা গুরুতর প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়, কোনোই কাজ তাতে হয় না। সাধকেরা প্রায়ই তাদের অজ্ঞানতা হেতু মনে করে যে মা যখন একজনের চেয়ে অন্যজনকে বেশি কাছে যেতে দিচ্ছেন তখন নিশ্চয় তাকে বেশি ভালোবেসে বেশি সাহায্য দিচ্ছেন। এটা খুবই ভুল। বারে বারে মায়ের কাছে যাওয়া সাধকের পক্ষে কঠিন পরীক্ষা স্বরূপও হতে পারে ; আবার তার মধ্যে ওতে প্রাণের চাহিদা, ঈর্ষা প্রভৃতিও প্রবলভাবে জাগিয়ে তুলতে পারে ; আবার সে বাইরের সম্পর্কেই সন্তুষ্ট হয়ে আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শের কোনো চেষ্টা করা ছেড়েও দিতে পারে ; কিংবা তার পক্ষে ওটা এমন অভ্যস্ত ও গতানুগতিক হয়ে দাঁড়ায় যে ভিতরের কোনো কাজই আর হয় না—এসব কেবল সম্ভাবনার কথাই নয়, এমনি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। মা তা বিলক্ষণ জানেন, তাই তিনি যা কিছু ব্যবস্থা করেছেন তা সম্পূর্ণ অব্যক্তিগত কারণে।

একমাত্র নিরাপদ জিনিস হবে আভ্যন্তরীণ মিলনেরই দিকে পুরোপুরি একাগ্র হওয়া, বাহ্য সব রকমের দাবীদাওয়া ছেড়ে দিয়ে কেবল ঐ চেষ্টাতেই নিযুক্ত থাকা, আর মায়ের প্রজ্ঞা ও ইচ্ছার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর রেখে তিনি যা দেন তাই নিয়ে খুশি থাকা। এটা তো সহজেই বোঝা উচিত যে মনের যে-কামনা থেকে বিদ্রোহ, সন্দেহ, মূঢ়তা, ছটফটানি প্রভৃতি আসে তা কখনো আধ্যাত্মিক ক্রিয়া হতে পারে না। তোমার মন যদি তাকেই ঠিক কাজ বলে তোমাকে জানিয়ে থাকে তাহলে নিশ্চয়ই তাকে অবিশ্বাস করবে। ঐ একটি দিকেই সমস্ত একাগ্রতা নিয়ে থাকবে আর অন্য যা কিছু ধারণা বা শক্তিক্রিয়া ওর থেকে তোমাকে বিচ্যুত করতে চাইবে তাকে ঠেলে সরিয়ে দেবে। তার দিকে প্রাণের সমর্থন তো ছাড়তেই হবে, কিন্তু তার আগে মনের সমর্থন প্রত্যাহার করা দরকার, কারণ মনের সমর্থন নিয়েই ওগুলো বিশেষ জোরদার হয়। তোমার মনে ও গভীর ভাবসত্তার মধ্যে ঠিক অবস্থাটি সুদৃঢ় ক'রে রাখো—বিরুদ্ধ শক্তিরা ফুসলানি দিতে এলে ঐ সুদৃঢ় চৈত্য মনোভাবের দ্বারা তাদের হটিয়ে দাও, এই আমি বলি।

১৪-৩-১৯৩৭

মায়ের প্রকৃত সন্তান

তারাই মায়ের সন্তানদের মধ্যে সব চেয়ে নিকটতম যারা তাঁর দিকে উন্মীলিত থেকে তাঁর আভ্যন্তর সত্তার নিকটস্থ হয়ে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে এক হয়ে যায়,—কিন্তু যারা বস্তুতঃ তাঁর দেহের খুব কাছাকাছি রয়েছে তারাই সে তুলনায় মায়ের নিকটতম নয়।

মা বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ রূপে

মা যে বিভিন্ন আকৃতিতে একই মা সে কথা ঠিকই, কিন্তু বাহ্য মা ও আভ্যন্তরীণ মাকে অত বেশি তফাৎ করে দেখার দরকার নেই; তিনি যে কেবল একই তা নয়, কিন্তু এই দেহী মা-ই অন্য সকল মাকে নিজের মধ্যে বিধৃত করেছেন এবং এঁর মধ্যেই বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ অস্তিত্বের অভিন্ন যোগ স্থাপিত আছে। তাই এই বাহ্য মাকে ঠিক ভাবে জানতে হলে কেবল বাই-রের চেহারা দেখলেই হবে না, ভিতরকেও জানতে হবে। তা সম্ভব হতে পারে যদি তুমি আপন আভ্যন্তর সত্তা দিয়ে তাঁকে দেখ ও তাঁর চেতনার মধ্যে যেতে পারো—যারা বাহ্য সম্পর্কটাই চায় তারা তা পারে না।

১০-৮-১৯৩৬

মায়ের সঙ্গে প্রকৃত আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ

আত্মার আভ্যন্তর সম্পর্ক মানে হবে এই যে তুমি মায়ের উপস্থিতিকে অনুভব করবে, সর্বদা তাঁরই দিকে ফিরবে, তাঁর শক্তিই তোমাকে চালাচ্ছে আর সাহায্য দিচ্ছে এটা বোধ করবে, তাঁর প্রতি প্রেমভক্তিতে পূর্ণ থাকবে, আর তাঁর খুব কাছেই থাকো বা দূরেই থাকো সর্বক্ষণ খুবই নৈকট্য বোধ করবে। এ সম্পর্ক হয় মনে প্রাণে ও আভ্যন্তর দেহসত্তাতেও, তাই অবশেষে বোধ হতে থাকে যে তোমার মন রয়েছে মায়ের মনের কাছে, তোমার প্রাণ মায়ের প্রাণের সঙ্গে এক সুরে বাঁধা, তোমার দেহ চেতনাও মায়ের চেতনাতে পূর্ণ। এই হলো আভ্যন্তরীণ মিলনের প্রকৃত লক্ষণ, কেবল আত্মাতেই নয়

কিন্তু প্রকৃতির মধ্যেও।

আমি কখন কি লিখেছি তা স্মরণ নেই কিন্তু এই হলো ঘনিষ্ঠ আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধের লক্ষণ, আর বাহ্য সম্বন্ধের ক্ষেত্রে শুধু তাঁকে বাহ্য পার্থিব স্তরে দেখাতে যেটুকু ফল হয় কেবল সেইটুকু। এমন আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ দূর থেকে খুবই সম্ভব হতে পারে যদিও তাঁকে দৈনিক একবার মাত্র দেখতে পাও ধ্যানের ও প্রণামের সময়, ও হয়তো কেবল জন্মদিনটিতে বছরে একবার।

×

মায়ের সঙ্গে যোগাযোগ আছেই, আত্মাতে ও চৈত্যের মধ্যে; কিন্তু মন প্রাণ ও দেহের তরফে বাধা থাকলে তখন সে সম্পর্ক অভিব্যক্ত হয় না কিংবা হলেও তার সঙ্গে অন্য জিনিস মিশে তা বিকৃত ও নিরর্থক হয়; আসল যোগ হলো আত্মা ও চৈত্যের সম্পর্কের যোগ; তারই ভিত্তিতে অন্য সব অংশেও সে যোগ এসে বর্তাবে তবেই তা স্থায়ী হবে।

×

ভগবানের সঙ্গে বা মায়ের সঙ্গে যে সম্পর্ক হওয়া চাই তা হবে প্রেম-ভক্তির, শ্রদ্ধার, বিশ্বাসের, নির্ভরতার, সমর্পণের সম্পর্ক; তা ছাড়া অন্যরকম যে প্রাণের তরফের সম্পর্ক যা জগতে খুব সাধারণ, তাতে সাধনাতে বিপরীত রকমের প্রতিক্রিয়া ঘটায়,—যেমন কামনা, অহংঘটিত অভিমান, দাবী, বিদ্রোহ, রাজসিক ও অজ্ঞান মানব প্রকৃতির ভিতরকার যত কিছু বিকার, যার থেকে বেরিয়ে আসাই সাধনার বিশেষ লক্ষ্য।

২৬-৪-১৯৩৩

নিরন্তর চৈত্য নৈকট্য বোধ

প্রঃ আমি মায়ের খুবই কাছে আছি বলে বোধ করি, যেন তফাৎ কিছু নেই। কিন্তু তা কেমন ক'রে হয় যখন

তাঁর ও আমার মাঝখানে রয়েছে এত বিরাট ব্যবধান--
তিনি রয়েছেন অতিমানস লোকে আর আমি এই মনের
স্তরে ?

উঃ কিন্তু মা তো কেবল অতিমানসেই নেই, তিনি সকল স্তরেই আছেন। বিশেষত তিনি প্রত্যেকেরই চৈত্য অংশের (আভ্যন্তরীণ হৃদয়ের) কাছে আছেন, তাই যখনই নিজেকে খুলে ধরবে তখনই ঐ নৈকট্যবোধ আপনা হতেই আসবে।

১১-১২-১৯৩৩

×

দরকার কেবল এই যে তোমার চৈত্য সত্তা যেন সামনে এগিয়ে এসে তোমার উন্মীলন ঘটিয়ে আমার ও মায়ের সঙ্গে নিত্যকার আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শ সরাসরি স্থাপিত ক'রে দেয়। এখন পর্যন্ত যা হয়েছে তা এই যে তোমার আত্মা মনের ভিতরকার আদর্শ ও গুণমুগ্ধ সমর্থনের ভিতর দিয়ে কিংবা প্রাণের ভিতরকার উচ্চ আনন্দবোধ ও আস্পৃহার ভিতর দিয়েই সাড়া জাগিয়েছে; কিন্তু দেহের বাধাকে জয় ক'রে জড় অংশকে রূপান্তরিত ও দীপ্ত ক'রে তুলে পরিবর্তন আনার পক্ষে তাতেই যথেষ্ট হয় না। তোমার ঐ আত্মাকে, তোমার চৈত্য সত্তাকে এগিয়ে সামনে এসে সম্পূর্ণ জেগে উঠতে হবে এই পরিবর্তনের জন্য। সেই চৈত্যের তখন কোনো মন-বুদ্ধিগত ধারণার বা কোনো বাহ্য ইঙ্গিত ও সাহায্যের আনুকূল্য পাবার দরকার হবে না। কেবল সেই তোমাকে দিতে পারে প্রত্যক্ষ ও নিরন্তর নৈকট্যের অনুভূতি এবং ভিতরকার যা কিছু সাহায্য ও সমর্থন। তখন আর মাকে দূরের বলে মনে হবে না কিংবা তা উপলব্ধির সম্বন্ধে কোনো সন্দেহ থাকবে না; কারণ মন কেবল ভাবতে ও প্রাণ কেবল চাইতে জানে, কিন্তু আত্মা ভগবানকে সহজেই বোধ করে ও জানতে পারে।

×

তুমি যা লিখে পাঠিয়েছ তা হলো চৈত্য সত্তা ও মায়ের সঙ্গে তার

সম্বন্ধের সঠিক বর্ণনা। এই সম্বন্ধই খাঁটী। যদি এই যোগে সাফল্য পেতে চাও তাহলে এই চৈত্য সম্বন্ধকেই আশ্রয় ক'রে অন্য সব অহংজনিত প্রাণ-ক্রিয়াকে প্রত্যাখ্যান করবে। এ যোগের বিশেষ ক্রিয়া হবে চৈত্যকে সামনে এনে সেখানেই স্থায়ী রাখা। তাইই হয়েছিল যখন তুমি সম্প্রতি মায়ের কাছে এসেছিলে, চৈত্য তখন ছিল সামনে। কিন্তু তাকে সামনেই রাখা চাই। যদি তুমি প্রাণধর্মী অহংএরই আবদার শোনো তাহলে তা হতে পারবে না। কেবল বিশ্বাস ও সমর্পণ ও বিশুদ্ধ আত্মদানের নির্মল আনন্দ—–যা চৈত্য থেকে আসে—–ঐগুলির দ্বারাই সত্যে প্রতিষ্ঠিত হয়ে ভগবানের সঙ্গে মিলতে পারবে।

২৬-২-১৯৩৩

×

প্রঃ একাগ্রতা আনতে না পেরে আমি ভগবৎ শুদ্ধিকে আহ্বান করলাম। তখনই সমগ্র সত্তাতে শুদ্ধি ও শান্তি এলো এবং হৃদয়ে মায়ের উপস্থিতি বোধ করলাম। সমগ্র সত্তা থেকে একটা তীব্র আস্পৃহার আবেগ উঠল, মায়ের প্রতি ভক্তিতে হৃদয় ভরে গেল, প্রকৃত সমর্পণ এসে মায়ের সঙ্গে মিলনের আরাম অনুভব করলাম। শুদ্ধির জন্য আস্পৃহা ওঠা, এ কি চৈত্যের উন্মীলন?

উঃ হাঁ নিশ্চয়, ঐ হলো চৈত্য উন্মীলন, আর উপরের বিশুদ্ধির দিকে চাওয়ার কথা যা লিখেছ তাই হলো বিশিষ্ট জিনিস। চৈত্য উন্মীলন ও মায়ের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সম্বন্ধ স্থাপিত হবার পক্ষে ওর গুরুত্ব খুব বেশি।

১৪-৭-১৯৩৭

×

তোমার চৈত্য সত্তাই মাকে ডাকে যার স্থান খুব গভীরে হৃদয়কেন্দ্রের পিছনে। অনেকেই ওখান থেকে মাঝে মাঝে মাকে ডাকা অনুভব করে। ঘুম বা অর্ধ-জাগরণের সময় ও ডাক সহজেই ওঠে, কারণ বাহ্য মন নিষ্ক্রিয়

থাকাতে তখন আভ্যন্তর সত্তা সহজে প্রকট হতে পারে।

২৯-১০-১৯৩৪

সাধনার সঠিক ভিত্তি

হাঁ, ঐ হলো সঠিক ভিত্তি। সম্পূর্ণ সাম্য অবস্থাতে মায়ের সঙ্গে পূর্ণরূপ মিলন––এতে উচ্চতর চেতনাতে অবস্থান ক'রে তাকে প্রকৃতির নিতান্ত বাহ্য অংশেও আনতে পারা যায়।

২২-৫-১৯৩৪

×

মায়ের সঙ্গে মিলনের ভাব যতই বাড়বে ততই সাধনার কাজ ভালো হবে।

২-১০-১৯৩৩

×

হাঁ, উন্নতি ভালোই হয়েছে। ঐ স্থিরতা ও বিস্তৃতিকে বজায় রেখে যদি হৃদয়ে মায়ের প্রতি প্রেমভক্তি লালন করতে থাকো তাহলে সব কিছু নিরাপদ––কারণ তা হলো যোগের ডবল রকমের ভিত্তি––উপর থেকে নামবে শান্তি ও মুক্তির ব্যাপকতা নিয়ে উচ্চতর চেতনা, আর এদিকে হবে চৈত্যের উন্মীলন যাতে সকল প্রচেষ্টাই আপনা হতে নিয়ন্ত্রিত হতে থাকবে লক্ষ্যের দিকে।

১০-১০-১৯৩৪

আশ্রমের মধ্যে ও বাইরে চৈত্য সংস্পর্শ

নিশ্চয়ই একথা সত্য যে চৈত্য সংস্পর্শ দূর থেকেও ঘটতে পারে, আর

ভগবান কোনো স্থানে সীমাবদ্ধ নেই, তিনি সর্বত্রই আছেন। সুতরাং আধ্যাত্মিক জীবন বা যোগ সাধনার জন্য প্রত্যেককে যে এই আশ্রমে বা মায়ের কাছে সশরীরে আসতে হবে এমন কোনো প্রয়োজন নেই, বিশেষত গোড়ার দিকে। কিন্তু এ হলো সত্যের এক পিঠ মাত্র; তার আরো একটা দিক আছে, নতুবা যুক্তিগত সিদ্ধান্ত হতে পারতো এই যে তাহলে মায়েরও এখানে আসার দরকার ছিল না, আশ্রম হবারও দরকার ছিল না, আর এখানে কারো আসবারও দরকার ছিল না।

চৈত্য সত্তা রয়েছে সকলেরই মধ্যে, কিন্তু অতি অল্পেরই মধ্যে তা বিকাশপ্রাপ্ত বা চেতনার মধ্যে সুগঠিত বা সামনে প্রকট; বেশির ভাগই থাকে অন্তরালে ও নিষ্ফলরূপে, সামান্য যা প্রভাব তার থাকে তা আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে যথেষ্ট সচেতন বা প্রবল নয়।

সেই কারণে যারা এই সত্যের দিকে আকৃষ্ট তাদের এখানে আসা দরকার হয় যাতে স্পর্শ পেয়ে তাদের চৈত্য প্রস্তুত হতে বা জেগে উঠতে পারে--আর তাই হবে তাদের পক্ষে প্রথম সফল চৈত্য সংস্পর্শ।

আরো সেই কারণে অনেকের পক্ষে এখানে এসে থাকা দরকার হয়--যদি তাবা প্রস্তুত থাকে--যাতে সরাসরি নৈকট্য ও প্রভাবের ফলে তাদের চেতনার মধ্যে চৈত্য সত্তা গড়ে ওঠে অথবা সম্মুখবর্তী হয়। সাধকের পক্ষে তখন যতটা সামর্থ্য থাকে ততখানি স্পর্শ ও প্রভাব নিয়ে নেবার পরে সে আবার বাহ্য জগতে ফিরে যায় এবং দূরে থেকেও সেই আশ্রয় ও প্রভাবের মধ্যে এখানকার সংস্পর্শ বজায় রেখে আপন আধ্যাত্মিক জীবন যাপন করে। কিন্তু বাহ্য জগতের প্রভাব চৈত্য সংস্পর্শ ও চৈত্য বিকাশের পক্ষে অনুকূল থাকে না, সুতরাং সাধক যথেষ্ট সতর্ক ও একাগ্র না থাকলে কিছু পরে সেই চৈত্য সংস্পর্শ লোপ পেয়ে এবং চাপা পড়ে গিয়ে বিরুদ্ধ ক্রিয়ার ফলে উন্নতি থেমে যেতে বা কমে যেতে পারে। সেইজন্যই প্রায়ই দরকার হয় এই কেন্দ্রস্থ প্রভাবের স্থানে আবার একবার এসে সেই সংস্পর্শ পুনরায় লাভ করবার অথবা পুনরায় অগ্রগতির জন্য নতুন প্রেরণা নেবার। মাঝে মাঝে এসে এই নৈকট্যের জন্য আস্পৃহা থাকা; এটা প্রাণধর্মী কামনা নয়; ওর মধ্যে যদি কোনো অহংভাব বা প্রাণগত উদ্দেশ্য থাকে তবেই তা হতে পারে, কিন্তু যদি চৈত্য সত্তার নীরব গভীর ও কোনোরূপ চাহিদা বর্জিত খাঁটী আস্পৃহা হয় তাহলে তো ঠিকই জিনিস।

একথা কেবল তাদেরই পক্ষে যাদের এই আশ্রমে কেন্দ্রস্থ শক্তি ও

উপস্থিতির প্রত্যক্ষ চাপের মধ্যে স্থায়ীভাবে থাকার জন্য ডাকা হয়নি। যাদের ঐ উদ্দেশ্যে গোড়া থেকেই ডাক পেয়েছে, তারা ওরই জন্য প্রস্তুত; কিংবা কোনো কারণে এখানকার যোগের পরিস্থিতি সৃষ্টি করা ও এখানকার কাজে অংশ নেবার জন্য এখানে অনেককে স্থান দেওয়া হয়েছে। তাদের পক্ষে এই আবহাওয়ার মধ্যে ও নৈকট্যের মধ্যে থাকা অপরিহার্য; তারা যদি ছেড়ে যায় তাহলে তারা আধ্যাত্মিক পরিণতির দুর্লভ সুযোগ হারাবে। বাইরে থেকে যারা সংগ্রামরত তাদের চেয়ে এদের কষ্টগুলোকে আরো বেশি বোধ হয় যেহেতু তাদের বেলাতে চাপ এবং দায়িত্ব আরো বেশি; কিন্তু তেমনি তাদের সুযোগও খুব বেশি, উন্নতির জন্য তাদের উপর শক্তি ও তার প্রভাব বর্ষিত হতে থাকে, এবং তারা যদি এই সুযোগ ও ডাকের উপযুক্ত হয়ে বিশ্বস্ত ভাবে থাকে তাহলে তাদের আধ্যাত্মিক পরিণতি সমুচিত হতে পারে।

৭-১০-১৯৩১

×

প্র ঃ মায়ের দৈহিক নৈকট্যে থাকার কোনো বিশেষ ফল আছে কি?

উ ঃ দৈহিকের স্তরে সাধনার পূর্ণতার জন্য তা অপরিহার্য। নতুবা দৈহিক ও বাহ্য সত্তার রূপান্তর ঘটা সম্ভব হয় না।

১৮-৮-১৯৩৩

×

প্র ঃ আশ্রমে থেকে মায়ের সংস্পর্শ ও সাহায্য যেমন পেতে পারি, দূরে গিয়ে থেকেও—যেমন বোম্বাই কিংবা কলকাতায়—কি সেইরকম সাহায্য ও সংস্পর্শ পেতে পারি?

উ ঃ সর্বত্রই তা পেতে পারো এবং আধ্যাত্মিক চেতনা জোরালো হলে

যথেষ্ট রকম উন্নতিও করতে পারো। কিন্তু দুই অবস্থাতে যে কিছু পার্থক্য থাকবে না এমন কথা অভিজ্ঞতায় বলে না।

১৮-৮-১৯৩৩

মায়ের দৈহিক নৈকট্য ও সাধনার উন্নতি

একথা মনে করা ভুল যে মায়ের কাছাকাছি যারা থাকে তারা যতটা সিদ্ধিলাভের কাছাকাছি যেতে পারে, যারা মাকে কেবল প্রণাম ও ধ্যানের সময় দেখে তাদের পক্ষে ততটা হয় না। সবই নির্ভর করে আভ্যন্তরীণ সত্তার উপর আর যে যেমনভাবে মাকে ও তাঁর শক্তিকে ভিতর থেকে নিতে পারে তার উপর। অবশ্য যারা চৈত্যকে জাগিয়ে রেখে মায়ের কাছে যায়, কেবল বাহ্য চেতনা নিয়েই নয়, তাদের পক্ষে আলাদা কথা, কিন্তু--

২৯-৭-১৯৩৬

×

প্র ঃ অনেকে মনে করে যে মা প্রায়ই যাদের দেখা দেন বা কিছু জিনিস যাদের পাঠান তারাই দ্রুত উন্নতি করছে, আর যাদের বেলা তা নয়, বেশি দেখা যারা পায় না, তারা একটু সুযোগ পায় মাত্র। তাই কি সত্য?

উ ঃ একদম বাজে কথা। সব চেয়ে উৎকৃষ্ট সাধক এমন আছে যাদের মা খুব কমই কাছে ডাকেন কিংবা কখনই ডাকেন না, আর কখনো কিছুই পাঠান না। আর তারা তা চায়ও না--তারা নিজের ভিতরে বোধ করে যে মা সর্বক্ষণই তাদের কাছে আছেন, তাতেই তারা খুশি থাকে, অন্য কিছু দরকার হয় না।

২৭-৭-১৯৩৩

×

প্র ঃ আপনি বলেছেন যে আশ্রমের বাইরে থেকে যারা সাধনা করে তাদের সাধনা ততটা সম্পূর্ণ হয় না, কারণ মায়ের কাছে এসে থাকলে তবেই দৈহিক রূপান্তরের সম্ভাবনা থাকে। তাহলে এই যুক্তি ধরে তো এমনও বলা চলবে যে এই আশ্রমের মধ্যেও যারা মায়ের নিজস্ব গণ্ডীর মধ্যে সর্বক্ষণ ঘনিষ্ঠ ভাবে কাছাকাছি আছে তাদের রূপান্তরের সম্ভাবনাও খুব বেশি Q.E.D.?

উ ঃ আশ্রমে থাকা এক কথা, আর মায়ের কাছাকাছি থাকা অন্য কথা। তোমার এই Q.E.D. অন্যান্য মনোগত বিচারের মতো জীবনের বাস্তবের সঙ্গে মেলে না। ঐ যুক্তি ধরে তাহলে তো বলতে হয় যে A যখন মায়ের সঙ্গে এক বাড়িতে আছে তখন সে B কিংবা C কিংবা D এর চেয়ে সিদ্ধির অনেক কাছে গিয়ে পৌঁছেচে, কারণ তারা থাকে অন্য বাড়িতে। E তো কেবল প্রণামের সময় আর নিজের জন্মদিনে ছাড়া মাকে দেখতেই পায় না, অতএব সে নিশ্চয় অনেক পিছিয়ে আছে, কিন্তু F প্রত্যহ মাকে দশ পনেরো কুড়ি মিনিটের জন্য দেখতে পায় বলে সে ওর চেয়ে অনেকটা এগিয়ে আছে। কিন্তু বাস্তবে তা তো হয়নি। সুতরাং তোমার যুক্তি প্রত্যেক পয়েন্টেই কেটে যাচ্ছে। সাধনার উন্নতি বা অধিক নৈপুণ্য লাভ মায়ের কাছে থাকা বা নিত্য দেখা পাওয়ার উপর নির্ভর করে না।

৩০-৭-১৯৩৬

×

প্র ঃ যারা মায়ের কাছে ঘন ঘন যেতে পারে, তারা খুব ভাগ্যবান, তাই নয় কি?

উ ঃ যদি তার মধ্যে কামনা বা দাবী থাকে, তাহলে ওতে এসে পড়ে অনেক রকম চাওয়া, আর রাগ করা, ঈর্ষা, হতাশা, বিদ্রোহ ইত্যাদি অনেক কিছু, তাতে সাধনা নষ্টই হয়, কোনো ফল মেলে না। আবার অন্যেদের পক্ষে একটা মিশ্রিত ব্যাপার হয়।

প্রথম প্রথম বছরে মা মুক্তভাবেই দৈহিক সংস্পর্শ সকলকে দান

করতেন। সাধকরা যদি তা ঠিকভাবে নিতো তাহলে কি মা সেটা এমন কমিয়ে দিতেন? অবশ্য ঠিকভাবে নিতে জানলে দৈহিক স্পর্শ পাওয়া একটা বিশেষ রকমের জিনিস—কিন্তু তার জন্য সর্বদা কাছে পাওয়ার দরকার হয় না। বরং তাতে উচ্চতর শক্তির খুব বেশি চাপ জন্মায়, আর ক'জন তা সহ্য ও ধারণ করতে পারে?

মে ১৯৩৫

×

যা আসল দরকার তা হলো আভ্যন্তরীণ অবস্থা, মায়ের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংযোগ স্থাপিত করা, বাইরের ঘটনা যাই কেন হোক। তাই হতে পারলে তখন যা দরকার তা মিলবে। যারা যোগ সাধনাতে গভীর ভাবে নিমগ্ন আছে তারা মাকে খুব বেশি দেখতে পায় না। বস্তুত এমন কেউ কেউ আছে যারা ভিতরে মায়ের নিত্য সংস্পর্শে রয়েছে, অথচ কেবল প্রণাম ও ধ্যানের সময় ছাড়া আর বছরে একটিবার ছাড়া মায়ের কাছে মোটে আসেই না।

১৩-১১-১৯৩৪

×

বর্তমান অবস্থাতে মায়ের কাছাকাছি আসার চেয়ে মায়ের দিকে উন্মীলিত হয়ে থাকলে বেশি কাজ হবে। যারা চায় যে মা তাদের ডাকুন আর কেবল সেইদিকেই ঝোঁক থাকে তারা অগ্রসর হবার পরিবর্তে পিছিয়েই যায়—কারণ ঐরূপ আকাঙ্ক্ষা প্রাণসত্তার চাহিদার ভিত্তিস্বরূপ হয়ে দাঁড়ায়, তাতে মায়ের সঙ্গে প্রকৃত সম্বন্ধ স্থাপনের ভিত্তি শিথিল হয়ে যায়।

×

না, সবই নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষের মনোভাবের উপর। যদি তারা সাক্ষাতের দাবী করে কিংবা মা যেতে বললেও বসে থাকে কিংবা বিরুদ্ধ ভাব নিয়ে তা মায়ের উপর নিক্ষেপ করে, সেটা খুবই অনিষ্টকারী হয়।

মা যা দিচ্ছেন তাই নিয়েই খুশি থাকা উচিত, কারণ তিনিই জানেন কে কি নিতে পারবে কিংবা পারবে না। এই নিয়ে মনের ধারণা করা বা প্রাণের দাবী করা সমস্তই ভুল।

৩-৪-১৯৩৪

×

এখানে একটা ভুলবোঝা হচ্ছে। মায়ের কৃপা হলো এক জিনিস, রূপান্তরের জন্য ডাক হওয়া অন্য জিনিস, তাঁব দিকে নৈকট্যের জন্য চাপ অন্য জিনিস। যারা মায়ের কাছে থাকে তারা যে বিশেষ কৃপাতে বা মায়ের পছন্দ হওয়াতে থাকে তা নয়, কাজের প্রয়োজনেই তারা থাকে––যদিও এখানে কেউ তা বোঝে না বা বিশ্বাস করে না, কিন্তু প্রকৃতই তাই। যদিও তারা কাজের ক্ষেত্রেই মায়ের সাক্ষাৎ পায়, কিন্তু এই নৈকট্যের দরুন তাদের উপর আপনা হতেই একটা চাপ পড়ে––মায়ের চেতনার সঙ্গে তাদের চেতনার একটা সামঞ্জস্য আনতে, কিন্তু তাদের পক্ষে সেটা খুবই কঠিন হয়ে পড়ে কারণ দুই চেতনার মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ, বিশেষত দৈহিকেরই স্তরে।

২৭-৪-১৯৪৪

×

প্র ঃ যারা মায়ের খুব কাছে থাকে তারা বিশেষ ক'রে এই সুযোগটি পেয়েছে, মায়ের দিকে যথেষ্ট উন্মীলিত হয়ে তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সত্তাতে এক হতে পেরেছে বলেই; একথা কি ঠিক? আর মায়ের কাছাকাছি থাকাতে আলাদা কিছু লাভ আছে কি?

উ ঃ মায়ের "ইচ্ছার সঙ্গে এক হতে পারা" কিংবা সম্পূর্ণ উন্মীলিত হতে পারা নিতান্ত সহজ কথা নয়। কাছে থাকলেই উন্নতি আনার জন্য ও পূর্ণতা লাভের জন্য নিত্য চাপ পড়ে যা এখনও পর্যন্ত কেউ নিতে পারেনি। এ বিষয়ে লোকের মনের যেসব ধারণা আছে তা মিথ্যা।

ক-এর দাবী ছিল যে ভিতরেই বাস করবে কিংবা মায়ের ঘরে যখন খুশি যেতে পারবে (যে অনুমতি কাউকেই দেওয়া হয়নি, খ কিংবা গ কিংবা কাউকেই নয়) আর সে চেয়েছিল যে ঘরে যেতে যারা পায় তাদের সমান বা প্রধান হয়ে সে থাকবে। তাতেই বোঝা যায় যে কেনই তারা মায়ের ঘরে যেতে পায় তার কারণ সে জানতো না (কৃপা কিংবা পছন্দের সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই), এবং কি উচিত বা অনুচিত তাও সে জানে না। মা যদি অনুমতি দিতেন তাহলে তা দুদিনও সহ্য করতে পারতেন না। খ এবং গ-এর কথা স্বতন্ত্র—বিশেষ কাজের গতিকে তাদের বারে বারে মায়ের কাছে আসতে হয়। এর মধ্যে সাধনার দিক থেকে ছোটোবড়োর কোনো প্রশ্নই নেই, যেমন ঘ প্রভৃতির দৃষ্টান্ত দিয়ে তুমি নিজেই বলেছ।

৭-৩-১৯৩৫

×

আমি বলতে চেয়েছি এই যে দৈহিক নৈকট্য যে অপ্রয়োজন তা নয়, কিন্তু সেটা সয়ে নিতে পারা কঠিন। প্রণামের সময় স্পর্শ পাওয়া বা কাছে যাওয়া ঠিক তাই নয়। দৈহিক নৈকট্য মানে নিত্য মায়ের সাথে সাথে থাকা কিংবা ঘন ঘন তাঁর কাছে যাওয়া।...তার চাপ সহ্য করার ব্যাপারে অধিকাংশই তার থেকে নিজেদেরকে যথাসাধ্য আড়ালে রেখে দেয়—যখন তা পারে না তখন খুব অস্থির হয়ে পড়ে। এই হলো আসল কথা।

৫-৮-১৯৩৫

×

বোধ করি এ সবই তোমার মনের ধারণা। ক কেমন বোধ করবে এটা তুমি মনে মনে এঁচে নিচ্ছ। কিন্তু বস্তুতপক্ষে ক-এর বা অন্য কারোই ভিতরকার মুশকিল মায়ের কাছে এলে বা তাঁর কাছে এক দুই বা তিন ঘন্টাও বসে থাকলে দূর হয়ে যায় না। বহু লোক এসে তাই করেছে কিন্তু যেমন এসেছিল তেমনি মুখভার বা হতাশা বা বিদ্রোহভাব নিয়ে চলে গেছে। যারা আসে মায়ের কাছে তাদের মধ্যে অনেকের সমস্যা তোমার চেয়েও বেশি নিত্য ও গুরুতর। আর ঐ কথাটাও ঠিক নয় যে মায়ের

সঙ্গে যারা অনেক কথা বলে (বাড়ি ঘর, মেরামতি, চাকর ইত্যাদি প্রসঙ্গ নিয়ে) তারা মাকে ভালোরকম বোঝে। আগেকার দিনে কেউ কেউ মায়ের কাছে আসতো প্রায়ই নানা প্রসঙ্গে বাক্যালাপ করতে, কিন্তু তারাও মাকে বুঝতে পারেনি। তাই আবার বলছি যে তোমার এই সব মনের ধারণার কোনো ভিত্তি নেই। ভিতরের দিক থেকে মায়ের দিকে উন্মীলিত হলে তবেই "সংস্পর্শের" ফল হবে, যা বাহ্য সংস্পর্শ নয় কিন্তু আভ্যন্তরীণ বা আধ্যাত্মিক সংস্পর্শ,—আর কেবল তখনই মাকে স্মরণ করলে বা মা তোমাকে স্মরণ করলে সকল বাধাবিঘ্ন ঘুচতে পারবে; তখন দৈহিক সংস্পর্শেও কাজ হবে, কিন্তু তা অপরিহায নয়। আর তাঁকে বুঝতে পারার জন্য, কেবল আধ্যাত্মিক চেতনার দ্বারাই তাঁকে বোঝা যাবে, কিংবা যদি মনে না বোঝো তথাপি উত্তরোত্তর একাত্মতা এসে তার ভিতর দিয়ে অন্তত-পক্ষে তা অনুভব কবতে পারবে।

৪-৮-১৯৩৫

×

এই অথহীন ভ্রান্তিকে আমল দেওয়া খুবই বোকামি হবে—এই কথা বিশ্বাস কবা যে মায়ের কাছে যারা থাকে বা প্রায়ই যেতে পায় তারাই অন্য সকলের চেয়ে বেশি সুখী—একথা একেবারেই সত্য নয়, আর এর থেকে আভ্যন্তরীণ শান্তিকে ব্যাহত হতে দেওয়া খুবই খারাপ। যদি কেবল এই ভ্রান্তিটাকে দূর ক'রে দিতে পারো তাহলে কোনো কিছুই তোমার ভিতর-কার শান্তির উন্নতি রোধ করতে পারবে না, এবং যে আভ্যন্তরীণ নৈকট্য বোধ ক'রে আশ্রমের লোকেরা তৃপ্ত থাকে তাও তুমি পাবে। তৃপ্তি মেলে আত্মার সন্তোষে, প্রাণেরও নয় বা দেহেরও নয়। প্রাণ কখনই সন্তুষ্ট হয় না; দেহ যা সহজে পায় তার প্রতি শীঘ্রই আগ্রহ হারায়। কেবল চৈত্য সত্তাই দিতে পারে প্রকৃত আনন্দ।

৮-৯-১৯৩৪

আভ্যন্তরীণ ও বাহ্য সংস্পর্শ

মায়ের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শকেই বাড়াও--তা না হয়ে যদি কেবল বাহ্য সংস্পর্শই খুব বেশি বেড়ে যায় তাহলে তা গতানুগতিক রুটিনের মতো হয়ে দাঁড়ায়।

×

আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শ মানে তুমি যাতে চেতনাতে মায়ের সঙ্গে এক বোধ করবে কিংবা তাঁর সংস্পর্শ বোধ করবে কিংবা তাঁর উপস্থিতি বোধ করবে কিংবা অন্ততপক্ষে সর্বদা তাঁরই দিকে ফিরে থাকবে।

১৬-৩-১৯৩৫

×

> প্রঃ আজ আমার মনে প্রবল ইচ্ছা জাগলো যে উপরে মায়ের ঘরে ঢুকে তাঁর খুব কাছে চলে যাই।

উঃ কিন্তু কাছে যাওয়াটা আভ্যন্তরীণ ঘরেই হওয়া দরকার, বাহ্য ঘরে গিয়ে নয়। কারণ আভ্যন্তরীণ ঘরে তুমি সব সময়েই যেতে পারো ও এমন কি স্থায়ীভাবেও থাকতে পারো।

৮-৩-১৯৩৫

মায়ের ভালোবাসা

তুমি হলে মায়ের সন্তান আর সন্তানদের প্রতি মায়ের ভালোবাসা সীমাহীন, তাদের প্রকৃতিতে যতই কেন দোষ থাক সবই তিনি সহ্য করেন। তুমি চেষ্টা করো মায়ের প্রকৃত সন্তান হতে; ও জিনিস তোমার মধ্যেই রয়েছে, যদিও তোমার বাহ্য মন সামান্য তুচ্ছ জিনিস নিয়েই মত্ত থাকে আর তাই নিয়ে হৈ চৈ করে। কেবল স্বপ্নে দেখা নয়, সব সময়েই মাকে

ভিতরে অনুভব করতে শেখো। তাহলে দেখবে যে সংযম ও পরিবর্তন সহজ হবে, কারণ তিনিই ভিতর থেকে তা করাবেন।

×

আর মায়ের সম্বন্ধে তোমার ঐ যে ধারণা যে যারা কাজ ভালো করে কিংবা সাধনা ভালো ভাবে করতে পারে, তার বদলে কেবল তাদেরই তিনি ভালোবাসেন,—এ হলো তোমার দেহ-প্রাণগত মনের মামুলী অযথা মনোভাব যার মূল্য কিছু নেই।

১৭-১-১৯৩৭

×

নিশ্চয়, মায়ের ভালোবাসা পেতে হলে তোমাকে "ভালো" হতে হবে এমন কথাই নেই। তাঁর ভালোবাসা সর্বদাই আছে, মানব প্রকৃতির দোষ-ত্রুটি সত্ত্বেও তার কোনো ইতরবিশেষ হয় না। কেবল তোমারই তরফ থেকে তা জেনে রাখা দরকার যে মায়ের ভালোবাসা সর্বদার জন্যই আছে। কিন্তু তা বিশেষ ভাবে জানবার জন্য তোমার চৈত্যকে সামনে আনা দরকার—কারণ চৈত্যই সে কথা জানবে, আর মন প্রাণ দেহ কেবল বাইরের থেকে দেখবে আর ভুল বুঝবে।

২৪-৬-১৯৩৬

×

লোকে মায়ের কাছে সাধারণ ভালোবাসা চাইলে, যা নির্ভর করে প্রাণ-সত্তার উপর ও তার মুডের উপর—তাহলে তাদের নিরাশই হতে হবে। কিন্তু এই যোগের কাজই হলো ঐ ধরনের ভালোবাসাকে ছাড়িয়ে উঠে তাকে অন্য জিনিসে রূপান্তরিত করা।

১৪-৩-১৯৩৬

×

এটা ঠিক কথা। এমন কি মায়ের চৈত্য বা মানবীয় প্রেমকেও অনেকে বোধ করতে বা বুঝতে পারে না, যেহেতু তা সাধারণ মানবীয় ভাবে প্রকাশ পায় না।

৫-৫-১৯৩৫

×

কিন্তু মাকে তুমি "মানবী" মা রূপে দেখতে চাও কেন? মানব দেহে ভগবতী মা বলে দেখতে পারাই যথেষ্ট আর তাতেই ঠিক কাজ হবে। মানবী মা হিসাবেই যারা তাঁকে দেখে তারা তাই নিয়ে নানারকম ভুল ক'রে ফেলে ও প্রায়ই নানারূপ কষ্ট পায়।

২-৫-১৯৩৪

মায়ের প্রতি যথার্থ প্রেম

ভগবানের প্রতি যে প্রেম তা ঐ প্রাণগত জিনিস হওয়া উচিত নয় যাকে লোকে সাধারণত প্রেম বলে; কারণ তা সত্যিকার প্রেম নয়, কেবল প্রাণগত কামনা, আপন স্বার্থে কাউকে আত্মসাৎ ক'রে নিজের দখলে রাখার একটা প্রবৃত্তি। এ জিনিস দিব্য প্রেম তো নয়ই, এর কিছুমাত্র অংশকে যোগের মধ্যে মিশে যেতে দেওয়াও উচিত নয়। ভগবানের প্রতি যথার্থ প্রেম মানে কোনো দাবী না রেখে আত্মদান, পুরো আনুগত্য ও সমর্পণের সঙ্গে; যে প্রেম কিছু চায় না, কোনো শর্ত রাখে না, লেনদেনের ভাব রাখে না, ঈর্ষা বা গর্ব বা রাগের ধার দিয়ে যায় না, কারণ এসব তার ধাতুর মধ্যেই নেই। এর বদলে ভগবতী মা নিজেকেই মুক্তভাবে দান করেন--তার মানে তাঁর আভ্যন্তরীণ দান--অর্থাৎ তোমার মন প্রাণ ও দেহের চেতনাতে তাঁর উপস্থিতি, তাঁর শক্তি কাজ করবে তোমাকে দিব্য প্রকৃতিতে নতুন ক'রে গড়তে, তোমার সত্তার সকল ক্রিয়াকে পূর্ণতা ও পরিণতির দিকে নিয়ে যেতে, আর তাঁর প্রেম তোমাকে আপ্লুত ক'রে তাঁর কোলে তুলে তোমাকে নিয়ে যাবে ভগবানের কাছে। এই জিনিসেরই আস্পৃহা নিয়ে তোমার সত্তার সকল অংশে এমন কি দেহকোষে পর্যন্ত অনুভব করতে চেষ্টা করবে, এবং এর

কোনো সময়সীমা বা সমাপ্তি নেই। এই জিনিসের আস্পৃহা ক'রে যদি তা মিলে যায় তাহলে সেখানে কোনোরূপ চাহিদা কিংবা ব্যর্থ কামনার প্রশ্নই থাকে না। আর আস্পৃহা সত্যিকার হলে তা অব্যর্থরূপে মিলেও যায়, এবং বিশুদ্ধির কাজ যত অগ্রসর হয় এবং প্রকৃতি পাল্‌টাতে থাকে ততই সেই পাওয়ার মাত্রাও বাড়ে।

তাই বলি তোমার প্রেমকে স্বার্থসুলভ দাবী ও কামনা বর্জিত রাখো; তাহলে দেখবে যে ওর বদলে তুমি যতখানি নিতে এবং রাখতে পারো ততখানিই পেয়ে যাবে।

×

হয়তো ক দুটি ভুল কাজ করছে--প্রথমত মায়ের কাছে তাঁর প্রেমের বাহ্য প্রকাশ চাওয়া; দ্বিতীয়ত, বিনা দাবীতে উন্মীলন ও সমর্পণের দিকে একাগ্র না থেকে কেবল কতটা উন্নতি হলো তাই লক্ষ্য করা। এই দুটি ভুল কাজ সাধকরা প্রায়ই ক'রে থাকে। কিন্তু যদি তুমি নিজেকে উন্মীলিত রাখো, সমর্পিত করো, তাহলে প্রকৃতি প্রস্তুত হয়ে উঠলে তখন উন্নতি আপনিই এসে যাবে; কিন্তু কেবল উন্নতির দিকেই চাইতে থাকলে তাতে নানা বাধাবিপত্তি ও ব্যর্থতা এসে জুটবে, কারণ সেখানে মনের দৃষ্টিভঙ্গী অন্যরকম। ক-এর প্রতি মা বিশেষ দয়া রাখেন, প্রতিদিন প্রণামের সময় তাকে স্থায়ী শক্তি দান করতে চেষ্টা করেন। তার সেখানে মনে প্রাণে শান্ত ও নীরব হয়ে নিজেকে নিবেদন করতে শিখে নেওয়া দরকার, যাতে সে চেতনভাবে তা গ্রহণ করতে পারে। দিব্য প্রেম মানুষের প্রেমের মতো নয়, তা যেমন গভীর তেমনি বিশাল তেমনি নীরব; নিজেকে যথেষ্ট নীরব ও উদার রাখতে পারলে তবেই সে জিনিস জানতে পেরে তাতে সাড়া দেওয়া যায়। ওর একমাত্র লক্ষ্য যেন হয় সমর্পণের দ্বারা নিজেকে আধার ও যন্ত্ররূপে পরিণত করা--এবং ভগবৎ প্রজ্ঞা ও প্রেমের হাতে নিজেকে ছেড়ে দেওয়া, যা করবার তা সেই জিনিসই করুক। আর ওকে এই কথা নিজের মনে স্থির ক'রে নিতে বলো যেন এতটা সময়ের মধ্যে তার উন্নতি বা উপলব্ধি বা সিদ্ধি আসবে এমন ভাবনা কখনো না ভাবে--যতটাই সময় লাগুক তার জন্য প্রস্তুত থেকে ওকে অধ্যবসায়ের সঙ্গে অপেক্ষা করতে হবে, আর সমগ্র জীবনটাকে আস্পৃহাতে পরিণত ক'রে কেবল একটি

জিনিসকে, ভগবানকে পাবার জন্য নিজেকে খুলে রাখতে হবে। সাধনার মূল সূত্র হলো আত্মদান, কিছু চাওয়া বা পাওয়া নয়। নিজেকে যতই দিতে পারবে ততই নেবার ক্ষমতাও বাড়বে। কিন্তু তার জন্য সকল রকমের অধৈর্য বা অসন্তোষ ছাড়তে হবে; কিছু পাচ্ছি না, কেউ সাহায্য দিচ্ছে না, কেউ ভালোবাসছে না, ছেড়ে চলে যাই, সাধনা ছেড়ে দিই, জীবন ত্যাগ করি, এ সমস্ত ভাবকে একদম বর্জন করতে হবে।

১-৯-১৯৩৬

চৈত্যেব ও মনের ও প্রাণের ভক্তি

প্রঃ মায়েব প্রতি চৈত্য ও মানসিক ও প্রাণগত ভক্তির মধ্যে কি পার্থক্য?

উঃ চৈত্য ভক্তি আত্মদান ক'রে কিছু চায় না, প্রাণের ভক্তি চায় যে মা তাকে গ্রহণ করুন আব সে যেন মায়ের কাজ করতে পায়, মনের ভক্তি অকুণ্ঠ শ্রদ্ধা ও বিশ্বাসে মা যা কিছু হয়েছেন বা বলছেন বা করছেন সমস্ত-কেই নির্বিবাদে মেনে নেয়। কিন্তু এ কেবল বাহ্য লক্ষণ মাত্র—কিন্তু ওগুলিকে ভিতরের লক্ষণ থেকে স্পষ্ট চেনা গেলেও তা ভাষাতে ব্যক্ত করা যায় না।

২৮-৪-১৯৩৩

×

প্রঃ এই যোগে মনের ও প্রাণের ভক্তির কি কোনো স্থান নেই?

উঃ কে বলেছে নেই? প্রকৃত ভক্তি হলে সকল রকম ভক্তিরই স্থান আছে।

২৮-৪-১৯৩৩

মাকে চৈত্ত্যের অনুভূতি

প্রঃ মাকে দেখতে পেলেই খুশিতে ও আনন্দে উৎফুল্ল হওয়া, এটা কোন জাতীয় অনুভূতি?

উঃ ওটি চৈত্ত্যের অনুভূতি।

×

প্রঃ মাকে স্মরণ করলেই তৃপ্তি ও আনন্দ পাওয়া, এটি কোন ধরনের অনুভূতি?

উঃ চৈত্ত্যের।

×

প্রঃ মায়ের বিরুদ্ধে কিছু শুনলে হৃদয়ে আঘাত পাওয়া, এটি কেমন অনুভূতি?

উঃ চৈত্ত্যের।

×

প্রঃ মা অনেক দূরে থাকলেও তাঁর উপস্থিতি হৃদয়ে বোধ করা, এটি কোন প্রকার অনুভূতি?

উঃ চৈত্ত্যের।

×

প্রঃ কেমন ক'রে জানবো যে আমি চৈত্ত্য প্রেমের পূর্ণ

অবস্থায় পৌঁছেছি?

উঃ যখন অহং বোধ থাকবে না, ভগবানের প্রতি থাকবে কেবল শুদ্ধা ভক্তি, আনুগত্য ও সমর্পণ।

৯-৫-১৯৩৩

প্রকৃত প্রেম এবং অহং

প্রঃ আমবা সকলেই চাই মায়ের ভালোবাসা পেতে, কিন্তু ক'জন আমরা মাকে যথার্থরূপে ভালোবাসি। অধিকাংশই থাকি নিজেদের পছন্দ অপছন্দ, নিজেদের সুখ দুঃখ, লাভ ক্ষতি নিয়ে, কিন্তু মায়ের প্রতি প্রকৃত প্রেম প্রায় কারোই নেই।

উঃ তার মানে যে কোনোই প্রেম নেই এমন নয়, কিন্তু যা আছে তা অহং আর কামনা আর প্রাণের ক্রিয়াতে আচ্ছন্ন হয়ে মিশ্রিত জিনিস হয়ে গেছে। অন্ততপক্ষে বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাই। কেউ কেউ অবশ্য আছে যাদের মধ্যে কিছুমাত্র প্রেম নেই, কেবল "ভালোবাসা" যা কিছু মিলে যায় সেই জিনিসকে,—আর দুই একজন হয়তো যথার্থই ভালোবাসে, কিন্তু অনেকেরই মধ্যে তা চৈত্যের স্ফুলিঙ্গ বিস্তর ধোঁয়ার মধ্যে লুকোনো। সেই ধোঁয়াকে দূর করতে হবে তখন ঐ স্ফুলিঙ্গটুকু আগুন হয়ে জ্বলে উঠবে।

৯-১১-১৯৩৪

আস্থা ও প্রেম

প্রঃ মায়ের উপর যাদের আস্থা বা শ্রদ্ধা আছে তাদের প্রেমও আছে একথা কি ঠিক নয়? শ্রদ্ধা ও প্রেম কি একত্রেই থাকে না?

উঃ সব সময়ে নয়। বিস্তর লোক আছে যারা ভালোবাসে না কিন্তু শ্রদ্ধা করে। যদিও কিছু মানসিক ভক্তি তার মধ্যে থাকতে পারে,--আর বিস্তর লোক আছে যারা মাকে ভালোবাসে কিন্তু তেমন আস্থা বা শ্রদ্ধা নেই। কেবল চৈত্য প্রেম হলে তার সঙ্গে শ্রদ্ধা থাকে, আর পূর্ণ শ্রদ্ধা হলে তখন চৈত্য প্রেমও এসে পড়ে। তুমি যা বলেছ তা ঠিক যদি তা আত্মার প্রেম হয়--কিন্তু কারো কারো পক্ষে তা কেবল প্রাণগত ভাব, যার দাবী না মিটলেই এসে পড়ে বিদ্রোহ, রাগ, আব তারা ছেড়ে চলে যায়।

৮-৫-১৯৩৩

চৈত্য ও প্রাণগত প্রেম

প্রেম ও ভক্তি নির্ভর করে চৈত্যের উন্মীলনের উপর এবং তার জন্য কামনা দূর করা চাই। অনেকে মাকে চৈত্যের বদলে প্রাণগত ভাবে ভালোবাসা নিবেদন করে, আর তাতেই সবচেয়ে বেশি গণ্ডগোল বাধে, কারণ তার মধ্যে কামনা মিশে থাকে।

×

প্রাণগত ভালোবাসাতেও কোনো ক্ষতি হয় না যদি তার মধ্যে অশুদ্ধ কিছু বা দাবীদাওয়া কিছু না থাকে (যেমন অতিরিক্ত আত্মপ্রত্যয় ইত্যাদি)। মাকে দেখে আনন্দ হয় সে ভালো কথা, কিন্তু অধিকার হিসাবে তা দাবী করা, না পেলে অভিমান করা, অন্য যারা পেয়েছে তাদের প্রতি ঈর্ষা করা--এই সকল অশুদ্ধ জিনিস তোমার ভালোবাসাকে এবং আনন্দকেও নষ্ট ক'রে দেয়।

১৩-৯-১৯৩৪

×

মায়ের বিরুদ্ধে তোমার কোনো অভিমান নেই, এ নিশ্চয় খুবই কাম্য। অভিমান চাঞ্চল্য প্রভৃতি জীবনের লক্ষণ হলেও তা প্রাণগত জিনিস, আভ্যন্ত-

রীণ প্রাণের নয়। ওগুলি বন্ধ হয়ে গিয়ে খাঁটী আভ্যন্তরীণ জীবন আসা চাই। তাতে হয়তো ফাঁকা শূন্যতা এসে পড়বে, কিন্তু তার ভিতর দিয়ে অতিক্রম করলে তবে কার্যকরী নতুন চেতনাতে পৌঁছবে।

২-১-১৯৩৭

×

অমন অস্থির প্রাণগত ক্রিয়াকে প্রশ্রয় দেওয়া চলবে না। ওর দ্বারা মায়ের সঙ্গে অভীষ্ট মিলন হবার নয়। আস্পৃহা করা চাই ধীরস্থির ভাবে ——যথারীতি খাবে, ঘুমোবে, নিজের কাজ করবে। এখন তুমি চাইবে কেবল শান্তি——এই শান্তি ও স্থিরতার ভিত্তিতেই প্রকৃত উন্নতি ও উপলব্ধি আসতে পারে। মায়ের দিকে আস্পৃহার মধ্যে কোনোরূপ প্রাণচাঞ্চল্য বা উত্তেজনা থাকা চলবে না।

২০-১০-১৯৩৩

প্রাণের লেনদেন ও প্রকৃত আত্মদান

তুমি যেমন বোধ করেছ ওটা হলো তোমার নিম্ন প্রাণসত্তার পুনরাবির্ভাব, তার যত কিছু কামনা বাসনা নিয়ে। তার বক্তব্য কেবল এই দাঁড়াচ্ছে, "আমি যোগ করছি কিছু মিলবে বলে। জীবনের সব কিছু ইচ্ছাকে ও প্রাণের সুখকে ছেড়ে চলে এসেছি মাকে ঘনিষ্ঠভাবে পাবো বলে ——জগতের সব সুখ ছেড়ে এসেছি ভগবানের দিব্য সুখ পাবো বলে। মায়ের ঘনিষ্ঠতা যদি না পেলাম আর যেমন চাই তেমন কিছু সঙ্গে সঙ্গেই না পেলাম, তাহলে ঐ পুরোনো জিনিসগুলো ছেড়ে এসে কি লাভ হলো?" এর ফলে আবার সেই সব ব্যাপার শুরু হবে, "অমুক আর তমুক ব্যক্তি, আর অমুকের অন্যায়" ইত্যাদি। নিম্ন প্রাণসত্তার এই যান্ত্রিক ক্রিয়া কেমন হয় তা দেখে নাও, আর তাকে দূর ক'রে দাও। কেবল আত্মদানের যে খাঁটী চৈত্য সম্বন্ধ তারই দ্বারা ঐরূপ ঘনিষ্ঠতা ও মিলন স্থায়ী হতে পারে——আর ঐ পূর্বোক্ত ভাবটি হলো প্রাণগত অহংএর কাজ, যাতে কেবল চেতনার পতন

হয় ও গণ্ডগোল বাধে।

২০-৬-১৯৩৩

×

তুমি থাকবে কেবল নিজেকে ও ভগবানকে নিয়ে। তোমার সঙ্গে ভগবানের যে সম্পর্ক তার মধ্যে তুমি চাইবে না যে ভগবান তোমার ব্যক্তিগত কামনাগুলো পূরণ ক'রে দিন বরং চাইবে যে তার থেকে তোমাকে টেনে তুলে দিন,—আর এমন উচ্চ আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার মধ্যে উঠিয়ে দিন যাতে তুমি ভিতরে এবং বাহিরের সত্তাতেও মায়ের সঙ্গে মিলিত হতে পারো। প্রাণগত কামনা পূরণে তা হতে পারে না—তা করতে গেলেই যত করবে তত আরো বাড়বে আর অজ্ঞানতার শক্তিদের হাতে পড়ে সাধারণ প্রকৃতি-সুলভ অশান্তি ও অস্থিরতা ভোগ করবে। তা হতে পারবে কেবল আভ্যন্তরীণ আস্থা ও সমর্পণের দ্বারা, আর তখনই ভিতর থেকে মায়ের শান্তি ও শক্তির চাপের ক্রিয়াতে যখন তোমার প্রাণ প্রকৃতি রূপান্তরিত হতে পারবে। একথা যখন তুমি ভুলে যাও তখনই যত অশান্তি ও কষ্ট পাও : যখন মনে থাকে তখন উন্নতির দিকেও যাও আর কষ্টগুলিও কমে যায়।

১৩-৯-১৯৩৩

×

প্রাণের যে অংশ মায়ের দিকে ছিল সেই অংশই এখন তাঁর বিরুদ্ধে বেঁকে দাঁড়িয়েছে তাই যদি হয়, তাহলে ওর কারণ সুস্পষ্ট। সে অংশ আগে ভেবেছিল যে অনুগত থাকলে মা তার কামনাগুলি পূরণ ক'রে দেবেন, তা হলো না দেখে বিরোধী হলো। এ হলো সাধারণ মানুষের সাধারণ জীবনের রীতি, যোগের ক্ষেত্রে এর স্থান নেই। যোগের সাধকদের মধ্যে এটা প্রায়ই ঘটছিল বলেই মা বাধ্য হয়ে নিজেকে এমন ক'রে গুটিয়ে নিলেন। তোমায় ঐ নিম্ন অংশকে বোঝাতে হবে যে তার অস্তিত্বই তার নিজের নয় কিন্তু ভগবানের, সুতরাং কোনো বাহানা না ক'রে বা ফাঁকি না দিয়ে তাকে ঐদিকেই ফিরতে হবে। সাধনার বর্তমান অবস্থাতে ওটাই সব চেয়ে বড়ো জিনিস; কারণ তাই করতে পারলে তবেই দৈহিক চেতনা

বদলাতে পারবে এবং উচ্চ চেতনা অবতরণের জন্য প্রস্তুত হবে। নতুবা সত্তার মধ্যে কেবল উত্থান পতন চলতে থাকবে---অন্ততপক্ষে বিলম্ব, বিভ্রান্তি, বিশৃঙ্খলা। প্রকৃত চেতনাতে স্থির থেকে নির্বিঘ্ন সাধনার জন্য এই হলো একমাত্র উপায়।

১৪-১২-১৯৩১

×

ক-এর প্রকৃতি হলো রাজসিক, সেইজন্য অমন কিছু নিয়ম তার পক্ষে বিপজ্জনক, কারণ ওতে তার যত কিছু কামনা, রাজসিক চাহিদা, ক্রোধ, ঈর্ষা, নানাবিধ নালিশ সমস্তই সে মায়ের ঘাড়ে ফেলবে। তার দরকার কেবল আত্মবিশুদ্ধির আস্পৃহা নিয়ে শান্ত, শুদ্ধ, সমর্পিত হয়ে থাকা; তবেই সে মায়ের উপস্থিতির পূর্ণ চাপ গ্রহণ করতে পারবে। মায়ের সঙ্গে সাধকদের সম্পর্ক সকলের পক্ষে একই রকম হতে পারে না, প্রকৃতি অনুযায়ী তা বিভিন্ন প্রকার হবে।

মায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতার প্রতিবন্ধক ভয়

সকল রকম ভয়কে দূর করা চাই। এই ভয়ের ক্রিয়াটি হলো প্রাণসত্তার অপরিবর্তিত অংশের কাজ, যেটি থাকে কেবল আগেকার দিনের যত ধারণা ও বোধ ও প্রতিক্রিয়াগুলিকে নিয়ে। তাব কাজের ফল এই হয় যে সে তোমার প্রতি মায়ের আচরণের কিংবা তিনি তোমাকে যা কিছু বলেন বা যেমন ভাবে তোমার দিকে চান তার আগাগোড়াই ভুল অর্থ করে। মা যদি কখনো গম্ভীর থাকেন বা একটু শ্লেষের সঙ্গে হাসেন, তার মানে এমন হতেই পারে না যে তিনি রাগ করছেন বা তাঁর স্নেহ প্রত্যাহার করছেন; বরং সেখানে এই কথাই বুঝতে হবে যে তিনি যাদের খুব অন্তরঙ্গ ক'রে নিয়েছেন তাদের কাছেই তিনি অমন মুক্ত ভাবে আচরণ করতে পারেন---এমন কি দরকার হলে ধমক দিতেও পারেন। আর তারাও তাঁকে ঠিক ভাবে বুঝতে পেরে ওতে ঘাবড়ে যায় না কিংবা ভয় পায় না,---তারা তখন নিজেদের ভিতরদিকে চেয়ে দেখে যে কোন জিনিসটার উপর

মা এমন চাপ দিচ্ছেন। সেই চাপকে তারা মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ ও কৃপার লক্ষণ বলে মনে করে। কিন্তু ভয় এরূপ ঘনিষ্ঠতার অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় আর কেবল ভুলবোঝা নিয়ে আসে; ঐ ভয় জিনিসটাকে একেবারে ঘোচাতে হবে।

২২-৫-১৯৩২

×

ক্ষমা চাওয়ার কোনোই দরকার নেই, কারণ মা তোমার উপর আদৌ রাগ করেননি কিংবা অসন্তুষ্ট হননি। নিশ্চয় জানবে যে তাঁর ভালোবাসা সর্বদাই অটুট আছে।

২৯-৯-১৯৩৩

×

অন্য লোকে কে কি বলছে তাতে কান দেওয়া খুবই ভুল—মায়ের প্রতি তোমার নিজের প্রকৃত ভক্তি ও সঠিক মনোভাব থাকলেই হলো। কোনো কিছু আশংকা করার কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই।

মায়ের দিকে উন্মীলিত থাকার তিনটি নিয়ম

বাইরের চেহারা দেখে তোমার দৈহিক মন একটা কিছু মীমাংসা গড়ে নিতে চাইবে, এর চেয়ে বিপজ্জনক কাজ আর কিছু হতে পারে না, কারণ দশটার মধ্যে নয়টা জায়গাতেই তার ভুল হয়। বাইরের চেহারা দেখে তৎক্ষণাৎ যা ধারণা আসে তাকে অবিশ্বাস করতে শেখা চাই—কারণ তাই তো প্রকৃত জ্ঞানের প্রথম লক্ষণ—সব কিছুকে চিনতে শিখতে হবে ভিতরের দিক থেকে।

তুমি জানতে চেয়েছ, এমন অভ্যাস থামাবার উপায় কি? প্রথম থেকে এই তিনটি নিয়ম মেনে চলতে চেষ্টা করবে:

(১) মা যে তোমাকে ভালোবাসেন আর তোমার কথা মনে রাখেন এ

সম্বন্ধে স্থির বিশ্বাস রাখবে--ওর উপর অটল আস্থা রেখে ওর বিপরীত যা কিছু বাইরের থেকে দেখ কিংবা শুনতে পাও তার সকল রকম ইঙ্গিতকে সজোরে প্রত্যাখ্যান করবে।

(২) যা কিছু মনোভাব কিংবা প্রবর্তনা মনের মধ্যে দেখা দিয়ে তোমাকে মায়ের দিক থেকে সরিয়ে দিতে চায়--মায়ের সঙ্গে তোমার যে সম্বন্ধ দাঁড়িয়েছে এবং তার থেকে যে আভ্যন্তরীণ নৈকট্য এসে গেছে, যে সরল সহজ শ্রদ্ধা ও আস্থা জন্মেছে, তাকে নাড়া দিতে চায়--সেরকম সব কিছুকে তৎক্ষণাৎ দূর ক'রে দেবে।

(৩) বাইরের কোনো লক্ষণের উপর বিশেষ গুরুত্ব দেবে না--সেই দিকেই বেশি লক্ষ্য রাখলে সহজেই তোমার ভ্রান্তি ঘটবে। মায়ের দিকে নিজেকে সর্বদা উন্মীলিত রাখবে এবং হৃদয়ের মধ্যে তাঁকে অনুভব করবে --বাহ্য প্রাণগত কামনার যে হৃদয় সেখানে নয়, কিন্তু আভ্যন্তরীণ হৃদয় যেখানে প্রকৃত ভাবাবেগের স্থান--ঐখানে তাঁকে তুমি খুঁজে পাবে আর সর্বদা তাঁর সাহচর্যে থাকতে পারবে, আর নিত্যই তিনি যে জিনিস তোমাকে দিচ্ছেন তা ঐখানে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে পারবে।

১৯৩১

মাতৃশক্তি'র কাছে পূর্ণ আত্মদান

এই যোগের গোটা মুখ্য সূত্রই হলো কেবল ভগবানকে সম্পূর্ণ আত্ম নিবেদন, তাছাড়া অন্য কাউকে বা অন্য কিছুকে নয়,--আর দিব্য মাতৃ-শক্তি'র সঙ্গে নিজেকে মিলিত ক'রে নিয়ে উপর থেকে অতিমানস ভগবানের যা কিছু পরাৎপর আলো, শক্তি, বিস্তার, শান্তি, শুদ্ধি, সত্য ও আনন্দময় চেতনাকে নিজেদের মধ্যে নামিয়ে আনতে প্রয়াস করা। সুতরাং এই যোগের মধ্যে থেকে অন্য কারো সঙ্গেই কোনো সম্পর্ক স্থাপনা বা আদান-প্রদান চলতে পারে না; তেমন কোনো সম্পর্ক বা আদানপ্রদান ঘটলেই তাতে আত্মাকে নিম্ন চেতনাতে ও নিম্ন প্রকৃতিতে নামিয়ে নিয়ে আসে, তাতে ভগবানের সঙ্গে যথার্থ মিলন ব্যাহত হয়, আর উপরের অতিমানসগত সত্য-চেতনাও সেখানে নামতে পারে না বা অতিমানস ঈশ্বরী শক্তি'ও নেমে আসে না।

মায়ের ভালোবাসা

এসকল বিষয়ে মনের জল্পনাতে বিশেষ লাভ হয় না, এ হলো মনের বিশ্লেষণের বাইরে জিনিস, মনের ধারণাতে আংশিক সত্য অথবা ভুল হয়ে যায়।

এক সার্বজনীন দিব্য প্রেম আছে যা সকলেরই জন্য। তাছাড়া প্রতি ব্যক্তিবিশেষের সঙ্গে চৈত্য সম্পর্কও একরূপ আছে, তা হলো প্রত্যেকের বেলা বিশেষ সম্পর্ক, সকলের পক্ষে সমান নয়, প্রত্যেকের বেলা আলাদা রকম। সেই বিশেষ সম্পর্ক প্রত্যেকের বেলা প্রকৃতি অনুসারে বিভিন্ন এবং প্রত্যেকটি নিজস্ব ধরনের, একের সঙ্গে অন্যের তুলনা চলে না। কোনটা কম কোনটা বেশি সে প্রশ্ন এখানে ওঠেই না।

এ-ধারণা ভুল যে মায়ের কাছে কাছে যারা থাকে তাদেরই তিনি বেশি ভালোবাসেন। আমি অনেকবার সে কথা বলেছি কিন্তু কেউ বিশ্বাস করে না, সকলে ভাবে যে মায়ের প্রাণসত্তা তার নিজের বিচারে ভালোবাসে কিংবা বাসে না, যেমন সাধারণ লোকে ক'রে থাকে। "যাদের খুব পছন্দ করেন তাদের তিনি কাছে রাখেন, যাদের কম ভালোবাসেন তাদের কম কাছে রাখেন, যাদের পছন্দ করেন না তাদেরকে দূরে রাখেন।" এমনি ছেলে-মানুষি বুদ্ধি। যারা মায়ের উপস্থিতি ও ভালোবাসা অনুভব করে তারা অনেকেই হয়তো ছয় মাসে কিংবা এক বছরে একবার মায়ের দর্শন পায়—প্রণামের ও ধ্যানের সময় ছাড়া। অথচ যারা সর্বদা কাছে কাছে থাকে তাদের অনেকে তা অনুভবই করে না; তারা অনেকে নালিশ করে যে মায়ের সাহায্য বা ভালোবাসা তারা পাচ্ছে না; পূর্বোক্ত ধারণা সত্য হলে এমন নালিশ তারা করতই না।

কেউ নিজেকে খুলে ধরতে পেরেছে কিনা তারই উপর এটা নির্ভর করে। খুলে ধরা মানে আভ্যন্তরীণ সম্পর্কের ব্যাপারে বাধাবিঘ্ন দূর করা—ভালোবাসার বাহ্য অভিব্যক্তি কামনা করা এক মস্ত বাধা; সত্তার অভ্যন্তরে তা অনুভব করতে হয়, বাহ্য লক্ষণের দিকে তার কোনো লক্ষ্যই থাকে না। কেউ মায়ের থেকে বহু দূরে থেকেও তাঁর ভালোবাসা বোধ করে। কেউ আবার নিত্য মায়ের কাছে কাছে থেকেও আদৌ তা বোধ করে না।

১১-৬-১৯৩৫

×

কেমন ক'রে তুমি মায়ের দেহরূপের মধ্যে অবস্থান করবে জানি না। মায়ের দেহাশ্রিত চেতনার মধ্যে অবস্থান করা সম্ভব। তাই কি চাইছ? কিন্তু তোমার অন্য সব অংশের বেলা কি হবে, তারা ঐ চেতনা থেকে তোমায় টেনে আনবে। মায়ের শক্তির দ্বারা রূপান্তর হওয়া ছাড়া তা কেমন ক'রে সম্ভব হবে?

১৪-১-১৯৩৬

×

ধ্যান করলেই যদি তোমার মাথা ধরে তাহলে তুমি ধ্যান কোরো না। সাধনার পক্ষে ধ্যান করা যে অপরিহার্য এমন ধারণা ভুল। অনেকে আছে যারা ধ্যান করে না, কিন্তু যারা ধ্যান করে তাদেব মতোই উন্নতি করে এবং মায়ের সান্নিধ্য পায়।

আসল কথা মায়ের প্রতি নিবিষ্ট হয়ে থাকা; সেটাই সব চেয়ে দরকার। এর জন্য ভয় পেয়ো না বা দুঃখ কোরো না, নীরবে তোমার মধ্যে মায়ের কাজ হতে দাও, তাহলেই সব ঠিক হয়ে যাবে।

১৬-৩-১৯৩৫

×

> প্রঃ সাধক যখন মাকে না পেয়ে একা বোধ করে তখন সে খুব কষ্ট পায়। এই মা কি সন্তানের অভাবে তেমনি বোধ করেন পার্থিব মায়েদের মতো? অথবা তিনি তার চেয়েও বেশি কষ্ট পান কারণ তিনি কিছু বলতে পারেন না?

উঃ তাহলে তো মাকে সর্বক্ষণের জন্য কোটিগুণ কষ্ট পেতে হতো, কারণ তিনি কেবল সাধকদের কথাই বা ভাববেন কেন? আরো তো লক্ষ কোটি সন্তান রয়েছে অজ্ঞানতার মধ্যে ডুবে। আর সাধকের তো দুঃখ

পাবার দরকার নেই, মা ডাক দিলেই সে মায়ের কাছে গিয়ে পড়বে।

২৪-৯-১৯৩৪

×

মা তাঁর সব সন্তানকে দেখেন কেবল তোমাকেই দেখেন না, এ ধারণা নিতান্তই ভিত্তিহীন। মা তাঁর নিজের পন্থাতে সকলকে যেমন ভালোবাসেন তোমাকেও তেমনি ভালোবাসেন, বরং অনেকের চেয়ে আরো বেশি ভালো-বাসেন। তোমার ও ধারণা কিসের ভিত্তিতে বিশেষ ক'রে জন্মেছে তা জানি না। অবাস্তব কথা।

কিন্তু আমি দেখি যে সাধক সাধিকাদের মনে (বিশেষত সাধিকাদের) মনে এমনি ধারণাই জন্মায়, অথবা বাইরের থেকে আসে, এবং তারা হতাশ হয়ে পড়ে। ঠিক তোমার মতোই তারা বলে, "তুমি সবাইকে ভালো-বাসো, কেবল আমাকে নয়; আমি যোগের অনুপযুক্ত বলে তুমি এখন দূরে দূরে রাখো। আমার কিছু হবার নয়। কেন মিছে এখানে থেকে তোমাকে বিরক্ত করি। আমার বেঁচে থেকে কি লাভ আছে?" কিন্তু যখন চৈত্যসত্তা জেগে উঠবে তখন এই সব ধারণা আর হতাশা সমস্তই দূর হয়ে যাবে। এখন কেবল ভুল ধারণা আর হতাশাই চেপে বসেছে যা আদৌ বাস্তব নয়। তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তা যখন প্রকট হবে, আত্মা আরো খুলে যাবে, তখন সে জানবে যে সেও মাকে ভালোবাসে আর মাও তোমাকে ভালোবাসেন; তখন আর সে তোমার প্রাণ মনের মতো অন্ধ ও প্রতারিত হয়ে থাকবে না।

ঐ সব ভিত্তিহীন চিন্তাকে ত্যাগ করো, ও কেবল বাইরের প্রভাবে জন্মায় এবং হতাশা এনে দেয়। চৈত্যসত্তাকে বাড়তে দাও, মায়ের শক্তিকে কাজ করতে দাও। মা ও ছেলের সম্পর্ক তোমার আত্মার মধ্যে ঠিক আছে; সাধনার ফলে তোমার মনে ও প্রাণে ও দৈহিক চেতনাতে তা প্রকাশ পেয়ে সমগ্র চেতনার দৃঢ় ভিত্তি স্থাপিত করবে।

২৬-৭-১৯৩৫

×

তোমার পুরানো অহংটা বার বার বেরিয়ে আসছে এবং উচ্চসত্তার কথা মানছে না। প্রকৃত ভক্ত যেমন কিছুই চায় না, মা যা কিছু করেন কিংবা না করেন তাতেই তারা খুশি থাকে, কারণ তারা জানে যে মা যা করেন তাই ভালো। তোমার প্রাণসত্তার মধ্যে এই সত্যকেই সুপ্রতিষ্ঠ করো।

৬-৫-১৯৩৫

শুদ্ধা ভক্তি

আগে শান্ত নীরব হও---তার পর সেই নীরবতার মধ্যে আস্পৃহা নিয়ে মায়ের দিকে স্থির ও ঐকান্তিক ভাবে নিজেকে খুলে ধরো।

১৫-১১-১৯৩৩

×

প্রঃ মাগো, আমাকে অল্প একটু ভক্তি দিয়ে দাও। নতুবা আমার কি যে হবে তা জানি না। কেমন ক'রে টিকে থাকবো তা জানি না। তোমার চরণ কমলের আশ্রয় ছেড়ে আমি কোথাও যেতে চাই না।

উঃ এই নিয়ে মানসিক উদ্বেগে নিজেকে কাতর কোরো না। মায়ের শক্তিকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দাও। হৃদয়পদ্ম তাতে খুলে যাবে আর উপরের আলোতে ভক্তি আপনা হতে ফুটে উঠবে।

২৫-১০-১৯৩৬

×

প্রঃ যখন "মা" শব্দকে ঘিরে সমস্ত চিন্তা ও অনুভব নিমগ্ন হবে তখন কি চৈত্য সত্তার উপলব্ধি আসবে?

উঃ সেই অবস্থাই তখন চৈত্যের অবস্থা হবে

×

প্র ঃ প্রত্যেক বারই যখন মাকে দেখি তখন প্রেম ও আনন্দ কেন জাগে না?

উ ঃ প্রেম ও আনন্দ নির্ভর করে চৈত্যসত্তার বেরিয়ে আসার উপর।

২৯-৭-১৯৩৪

×

প্র ঃ যখন মায়ের উপর ভালোবাসা জাগে, তখনই চোখে জল আসে।

উ ঃ তা হলে চৈত্যের ভক্তি অশ্রু।

২৫-৮-১৯৩৪

×

প্র ঃ একটি মেয়ে আজ আশ্রম ছেড়ে যাচ্ছিল। মায়ের প্রণাম পর্ব শেষ হতেই সে উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠল, আমাদের মধ্যে থেকেও নিজেকে সামলাতে পারলে না। ঐ সময় কি তার চৈত্যসত্তা প্রকট হয়েছিল?

উ ঃ চৈত্যের প্রকট হওয়ার প্রশ্ন নয়। তার চৈত্যসত্তা জাগ্রতই আছে আর আভ্যন্তর স্তরে অনেক কাল থেকেই সে মায়ের সঙ্গে সম্পর্কযুক্ত।

২৮-৮-১৯৩৪

×

প্র ঃ আমার দেহের মধ্যে উপর থেকে একটা শিহরণ জাগে, আধারটি তখন স্তব্ধ হয়ে যায়। এর অর্থ ঠিক বুঝি না। জিনিসটা কি?

উঃ ও হলো মায়ের স্পর্শের শিহরণ, চৈত্যে ও প্রাণসত্তাতে অনুভূত।

২৮-৮-১৯৩৪

×

প্রঃ আমরা দেখি যে মায়ের সামনে এলেই নিরুৎসাহ ঘুচে গিয়ে একটা আনন্দস্ফূর্তি জেগে ওঠে। তা কি চৈত্যের মিলন অথবা আভ্যন্তর প্রাণের মিলন থেকে হয়?

উঃ সেটা নির্ভর করে, মায়ের প্রাণশক্তির স্পর্শে অথবা কেবল সাক্ষাৎ পাবার কারণে, অথবা তাঁর থেকে কিছু পেয়ে। প্রথমটি হলে তা কেবল প্রাণীয়, আর দ্বিতীয় তৃতীয়টি হলে তা চৈত্য এবং চৈত্যপ্রাণীয়।

×

প্রঃ কেউ যদি মনে করে যে সেই সকলের চেয়ে মায়ের সুখী সন্তান, তাহলে কি তার সেটা অহংকার বোধ হবে?

উঃ তা নির্ভর করে তার মনোভাবের উপর। যদি সত্যিকার আনন্দ হয় তাহলে তা অহংকার নয়। যদি নিজেকে ও বিষয়ে সব চেয়ে বড়ো ভাবে তাহলে অহংকার।

×

প্রঃ আমার চৈত্যসত্তা কখনো কখনো দুঃখ পায় যে সে মাকে কেন পুরোপুরি ভাবে ভালোবাসতে পারছে না।

উঃ ওটা চৈত্যের কথা নয়। চৈত্য কখনো ভাবে না যে সে ভালোবাসাতে অক্ষম।

×

প্রঃ মায়ের প্রতি হয় চৈত্য প্রেম, অথবা মৃত্যু ; মাঝে মাঝে এইরূপ সংকল্প মনে জাগে।

উঃ ওটি বেঠিক মনোভাব। চৈত্যের নয়, ওটি প্রাণসত্তার কথা। চৈত্য প্রেমের সম্পর্কে যদি প্রাণের কথা শোনো, তাহলে সেখানে চৈত্যের জিনিস কেমন ক'রে আসবে?

২-৩-১৯৩৫

×

প্রঃ এমন কি উচ্চতর ও গভীর অনুভূতিকেও দামী বলে মনে হয় না যদি আমি মাকে খাঁটী হৃদয় দিয়ে ভালোবাসতে না পারি।

উঃ অমন মনে করা ভুল। অনুভূতিতে তোমার সত্তার বিভিন্ন অংশগুলিকে প্রস্তুত করে সঠিক ভাবে ভালোবাসার জন্য, কারণ আত্মাই কেবল যে ভালোবাসে তা নয়। অন্য অংশগুলি অজ্ঞানে ও অহংকারে থাকলে ভালোবাসা সেখানে স্থান পায় না।

২৩-১০-১৯৩৫

×

মাকে দেখার জন্য ব্যগ্রতা হওয়া সম্পর্কে তোমার মনোভাবের উপর নির্ভর করছে। যদি কোনো দাবিদাওয়া না থাকে, না দেখা পেলে অসন্তোষ না হয়, যখনই দেখা পাবো, তখনই খুশি হবো এই যদি মনোভাব হয়, তাহলে তা ঠিক জিনিস। এ-বিষয়ে কোনো রাগ বা ঈর্ষা যেন না জাগে। প্রাণসত্তাও সাধনা করবে, সুতরাং ওতে প্রাণসত্তার অংশ থাকলেও দোষের কিছু নেই, তবে তা সঠিক ভাবে থাকা চাই।

৬-১২-১৯৩১

×

লোকে তোমাকে ভালো বলুক বা মন্দ বলুক, তাদের সঙ্গে মতে মিলুক বা নাই মিলুক, তুমি কেবল ভাবো "আমি মায়ের ছেলে, মা আমাকে ভালোবাসেন", এতেই সব ঠিক হবে।

৩০-৪-১৯৩৫

×

লোকে তোমার সম্বন্ধে কি বলছে তা শুনতে যাওয়া ভুল। কেবল মা যা বলেন তাই শুনবে, লোকের কথা শুনলে মায়ের চেতনার স্পর্শ হারাবে। লোকের কথা শুনেই নিজেকে মন্দ ভাবো। আগে চৈত্যের উন্মীলনে তোমার শান্তি মুক্তি ও আনন্দ ছিল, আবার তাতে ফিরে যাও। মায়ের দিকে ফেরো, মায়ের চেতনা ও ইচ্ছাকে কাজ করতে দাও। তাহলে মন শান্ত হবে, আবার সব কিছু ফিরে পাবে।

২৯-৪-১৯৩৩

×

প্রঃ গত কয়েক বছর ধরে আমার চৈত্য সত্তা সামনে এসে কাজ করছে বলে আমার যে ধারণা তা কি ঠিক?

উঃ তোমার চৈত্যসত্তা যদি সামনে এসে কাজ করতে থাকে, অর্থাৎ কিনা, তোমার মন, প্রাণ, দেহকে পরিবর্তিত ও সংযত করতে থাকে তাহলে তোমার সঙ্গে মায়ের ব্যবহারে তুমি অতোটা উতলা হয়ে পড়লে কি করে? যদি সত্যিই তোমার চৈত্যসত্তা সামনে এসে কাজ করতে থাকে, তাহলে তোমার সত্তার যে অংশ উতলা হয়ে পড়তে যাবে, তাকে বলবে "মা যা করছেন বা সিদ্ধান্ত নেন, তাকে সানন্দে, সমর্পণের ভাব নিয়ে গ্রহণ করতে হবে। মন যেন বিশ্বাস না করে, যে কি করা উচিত, সেটা সে মায়ের চেয়ে ভাল ভাবে জানে; প্রাণশক্তি যেন তার নিজের ইচ্ছা বা পছন্দ অনুসারে মা কাজ করুন, তা না চায়। এইরকম আকাঙ্ক্ষা বা ধারণা পুরানো স্বভাবের অঙ্গ, চৈত্য বা আধ্যাত্মিক সত্তায় তাদের কোনও স্থান নেই। ওগুলি অহংবোধের ভুল।" চৈত্যসত্তা যদি প্রকৃতই তোমার প্রকৃতিকে

পরিচালিত করে, তাহলে ওরকম উতলা ভাব সঙ্গে সঙ্গে চলে যাবে। প্রকৃত-পক্ষে, চৈত্যসত্তার যদি পুরোপুরি প্রভাব থাকত, তাহলে এরকম উত্‌লা হওয়া অসম্ভব। কাজেই ধরে নিতে হবে যে চৈত্যসত্তা তোমার উপরে খানিকটা কাজ করছিল বটে, কিন্তু সম্পূর্ণ অধিকার পায়নি, কিংবা প্রাণ-সত্তা আবার জেগে উঠে চৈত্যকে ঢেকে ফেলেছে আর তার কাজ সাময়িক-ভাবে বন্ধ করে দিয়েছে। কিন্তু চৈত্যসত্তা যদি সম্পূর্ণভাবে সামনে এসে দাঁড়ায়, বিনা অবগুণ্ঠণে, কেবলমাত্র উন্মীলিত হচ্ছে এমন নয়, তাহলে পুরোপুরি একে ঢাকা দেওয়া সম্ভবপর নয়—আর বড় জোর উপরের দিকে কিছুটা আলোড়ন হ'ত, কিন্তু অন্তরে সব কিছুই থাকত শান্ত, সচেতন, সমর্পিত।

২-৭-১৯৩৬

×

প্র ঃ চৈত্যসত্তা সম্পূর্ণভাবে সামনে এসে দাঁড়াবার আগে কি মায়ের সঙ্গে সচেতন সংযোগ সম্ভব?

উ ঃ হ্যাঁ, চৈত্যসত্তা সব সময়ই সেখানে আছে।

×

প্র ঃ মায়ের অন্তরের সঙ্গে এক হওয়ার, কেবলমাত্র তাঁরই হওয়ার, তাঁর জন্যই বেঁচে থাকার দিকে একাগ্র হওয়া, অন্য কিছু অনুভূতির জন্য বিন্দুমাত্র ব্যস্ত না হওয়ার, এই মনো-ভাবের সম্বন্ধে আপনি কি বলেন?

উ ঃ সাধারণতঃ এইরকম মনোভাব চৈত্যসত্তাকে বা অন্তঃসত্তাকে জানাবার পক্ষে ভাল। কিন্তু যদি উচ্চতর কোনও অনুভূতি আসে, তাকে বাধা দিয়ো না।

১২-৩-১৯৩৫

×

তোমার ও মার মাঝখানে তুমি যদি কাউকে আনো, গোলমাল হবেই।

৫-৪-১৯৩৩

মায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক

মায়ের সঙ্গে সরাসরি সম্পর্ক স্থাপনের রাস্তা তোমার পক্ষে খোলাই আছে, আর যখনই তুমি সেটা অনুভব করো, তখনই সেটা সেখানে থাকে। এটা অন্তরেরই জিনিস। যখনই তুমি অন্তরের গভীরে প্রবেশ কর, তখনই সেটা পাও--একে বাইরে আসতে হবে আর বাইরের প্রকৃতি ও জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে। সেইজন্যই আমি চাই যে তুমি ভিতরে প্রবেশ করবার ও সাধনায় ভিতরে অগ্রগতির দিকে কিছুটা সময় দাও। 'ক'র সঙ্গে মা যা সম্পর্ক স্থাপন করতে চেয়েছিলেন সেটা দুই বন্ধুর তাঁর কাজে সাথীর সম্পর্ক--'ক' যে তোমার ও 'মা'র মাঝে দাঁড়াবে, এটা কখনও চাওয়া হয়নি। 'খ'র বেলায় তোমার সাহায্যের প্রয়োজন ছিল যাতে তুমি যে আঘাত পাচ্ছিলে তাতে উতলা হয়ে না পড়, এবং যতক্ষণ পর্যন্ত না তুমি মায়ের উপস্থিতি তোমার ভিতরে ও বাহিরে উপলব্ধি করতে পারো, ততক্ষণ পর্যন্ত সময় ও সাহায্য পাও। এখন তুমি তা করতে পারো--কাজেই আর কারোও কোনও রকমের মাথা গলানোর প্রয়োজন নেই। আমাদের কাজ সরাসরি তোমার ভিতরে ও বাহিরে চলছে--আর কারোও মাধ্যমে নয়।

২২-১২-১৯৩৬

×

তুমি অপরদের বিষয়ে এবং তুমি নিজে যে কতো খারাপ এই সব ভাবছিলে বলেই তোমার মনে হচ্ছিল যে তুমি 'মা'র কাছ থেকে অনেক দূরে সরে গেছ। সব সময়ই তিনি তোমার কাছে এবং তুমি তাঁর কাছে আছ। "মা আমাকে ভালোবাসেন--আমি তাঁরই" এটি যদি তোমার জীবনের মূলমন্ত্র করতে পারো, তাহলে পরদা সরে যাবে--কেননা সেটা মাঝখানে আসে এইসব চিন্তার জন্যই, অন্য কিছুর জন্য নয়।

১-৫-১৯৩৫

৮

মায়ের কাজের মধ্য দিয়ে সাধনা

মায়ের কাজের মধ্য দিয়ে সাধনা

মায়ের কাজ করা ও সাধনা

মায়ের উপর সঠিক একাগ্রতা রেখে মায়ের কাজ ক'রে যাওয়া, তাও ধ্যান করা এবং আভ্যন্তরীণ অনুভূতি লাভের মতোই সাধনা।

×

যারা সম্পূর্ণ ঐকান্তিকতা নিয়ে মায়ের কাজ করে তারা ধ্যানে না বসলেও বা যোগের কোনো পদ্ধতি অনুসরণ না করেও ঐ কর্মের দ্বারাই সত্য চেতনালাভের জন্য প্রস্তুত হয়ে ওঠে। কেমন ক'রে ধ্যান করতে হয় তা তোমাকে বলে দেবার দরকার নেই, যেমন যা দরকার তা আপনা হতেই আসবে, যদি তুমি তোমার কাজের মধ্যে আর সব সময়েই ঐকান্তিক থেকে মায়ের দিকে নিজেকে খুলে রাখো।

পূর্ণ যোগে কর্মের প্রয়োজন

অনুভূতি লাভের জন্য বাহ্য চেতনার দ্বারা কাজ করা ছেড়ে দিয়ে যদি কেবল আভ্যন্তর চেতনাতে ডুবে থাকো তাতে ভারসাম্য নষ্ট হয়ে সাধনা একরোখা হবে—কারণ আমাদের যোগ হলো সর্বদিক পূর্ণ; আবার তেমনি কেবল বাহ্য সত্তাতেই যদি লেগে থাকো তাতেও ভারসাম্য নষ্ট হয়ে এক-রোখা জিনিস হবে। ভিতরের অনুভূতি ও বাইরের কাজ, দুই দিকেই সমান চেতনা থাকা চাই, মায়ের ভাবে পরিপূর্ণ হয়ে।

×

সর্বক্ষণ বা অধিকাংশ কাল ধ্যানে কাটানো ঠিক নয়, যদি মনের অবস্থা খুব শক্ত না থাকে––কারণ তাতে বাহ্য সমস্ত সম্পর্ক হারিয়ে কেবল ঐ আভ্যন্তর জগতেই থেকে যাবে––আর তাতে অসঙ্গতি সূচক একমুখী ক্রিয়ার ফলে একটা বেসামাল অবস্থা এসে পড়তে পারে। ধ্যান এবং কাজ দুই রকমই করা এবং দুইই মাকে নিবেদন করা হলো সর্বোৎকৃষ্ট জিনিস।

৬-৮-১৯৩৩

×

আমাদের অভিজ্ঞতায় একথা বলে না যে কেবল ধ্যানের দ্বারাই প্রকৃতি বদলানো যায়, কিংবা বাহ্য ক্রিয়া সব কিছু ছেড়ে দিয়ে শুধুই ওর দ্বারা বিশেষ কিছু লাভ হয়েছে; বরং যারা সে চেষ্টা করেছে তাদের অনেকের ক্ষতি হয়েছে। যথেষ্ট পরিমাণ একাগ্রতা, হৃদয়ে আভ্যন্তরীণ আস্পৃহা, মায়ের উপস্থিতির দিকে আর উপরের দিকে চেতনার উন্মীলন, এগুলির অবশ্য দরকার। কিন্তু কর্ম ব্যতীত প্রকৃতপক্ষে প্রকৃতি বদলায় না; মানুষ-জনদের সংস্রবে থাকার দ্বারা যে পরীক্ষার ভিতর দিয়ে যেতে হয় তাতেই প্রকৃতির পরিবর্তন আনে। আর কাজের সম্বন্ধে, ছোটো কাজ বড়ো কাজ বলে কিছু নেই; সব কাজই সমান, যদি তা মাকে নিবেদন করা হয় আর মায়ের শক্তিতে মায়ের জন্য করা হয়।

৬-১০-১৯৩৪

×

সব কাজ ছেড়ে দিয়ে কেবল পাঠ ও ধ্যান নিয়ে থাকাকে মা খুব ভালো জিনিস বলে মনে করেন না। কাজও যোগের একটি অংশ, ওর দ্বারা প্রাণসত্তা ও তার তৎপরতার মধ্যে ভগবৎ উপস্থিতি ও আলো ও শক্তিকে নামিয়ে আনার পক্ষে সব চেয়ে ভালোরকম সুযোগ মেলে, আর তাতে সমর্পণেরও ক্ষেত্র এবং সুযোগ বেড়ে যায়।

কেবল এটাই স্মরণ রাখা যথেষ্ট নয় যে কাজটি মায়ের––এবং তার ফলও মায়ের। মায়ের শক্তিই তোমার পশ্চাতে থেকে কাজ করছে এবং তুমি তারই নির্দেশে চালিত হচ্ছ, এটিও বোধ করা দরকার।

কেবল মনের চেষ্টাতে তা সব সময় মনে রাখা খুব কঠিন; কিন্তু ঐরূপ চেতনার মধ্যেই যদি যেতে পারো যে সর্বদা মায়ের শক্তি তোমাকে প্রতি-পোষণ করছে, তবে সেই হবে ঠিক জিনিস।

তুমি ইন্‌সিওর কোম্পানী সম্বন্ধে মায়ের অভিমত চাও, কিন্তু মা এসব জিনিস নিয়ে কোনো অভিমত দেন না। আপন মনের নীরবতার মধ্যে তার সঠিক প্রেরণা লাভ করতে শেখো।

১৮-৮-১৯৩২

×

প্রঃ যারা শান্তি ও সমতার মধ্যে আছে কিন্তু মায়ের কাজ করছে না, তাদের রূপান্তর হবে?

উঃ না, তাদের কোনো রূপান্তর আসতে পারবে না।

৭-৫-১৯৩৩

মায়ের শক্তির সঙ্গে মিলনের দুই স্তর

তুমি যে দৈবী প্রেরণাতে কাজ করছ আর সব কাজই মায়ের কাজ, এ হলো সমুচিত অনুভূতির একটি ধাপ, কিন্তু এতেই থেকে গেলে চলবে না——আরো এগিয়ে যেতে হবে। যারা প্রকৃতির পরিবর্তন চায় না, কেবল ভিতরের সত্যের অনুভূতি চায়, তাদের পক্ষে তা চলতে পারে। কিন্তু তোমার কাজ বিশ্বপ্রকৃতির অন্তর্গত এবং ব্যক্তিগত প্রকৃতিরও অন্তর্গত, আর সকল প্রকৃতিই জগন্মাতার শক্তির সৃষ্টি, বিশ্বক্রিয়ার জন্য। কিন্তু এখানে তার কাজ দাঁড়িয়ে গেছে অজ্ঞানতার এবং অহংএর ক্রিয়াযুক্ত, তাই আমরা চাই ঐ জিনিসের আবরণমুক্ত ও বিকৃতিমুক্ত দিব্য সত্যের ক্রিয়া।

অতএব তুমি যে বোধ করছ যে তোমার সব কাজই হচ্ছে মায়ের শক্তির দ্বারা, এটি সঠিক অনুভূতি। কিন্তু মায়ের ইচ্ছা এই যে তোমার কাজগুলি যেন এখনকার প্রকৃতির ভিতরকার মাতৃশক্তিতে না হয়, কিন্তু তাঁর যে নিজস্ব উচ্চতর প্রকৃতি তারই শক্তিতে সরাসরি তোমার কাজ হতে

থাকে। সুতরাং তুমি যে পরে ভেবেছিলে ঐরূপ পরিবর্তন আসাই দরকার নতুবা মায়েরই শক্তিতে তুমি কাজ করছ একথা সত্য হবে না, সেটা ঠিকই। নতুবা ও ভাব স্থায়ী হবে না। এখন থেকে ঐ আগেকার ভাবটাই যদি স্থায়ী হয় তাহলে তুমি ঐ নিম্ন ক্রিয়াতেই থেকে যাবে যা অনেকের হয়েছে, পরিবর্তন আর ঘটবে না। এখন তোমার পক্ষে দরকার এই স্থায়ী অনুভূতি থাকা যে মায়ের শক্তি তোমাব সব কিছুর ভিতর দিয়েই কাজ করছে, তোমার অজ্ঞানময় চেতনাকে ও প্রকৃতিকে তাঁর দিব্য জ্ঞানময় চেতনা ও প্রকৃতিতে রূপান্তরিত ক'রে আনতে।

তোমার যন্ত্রের বেলাতেও ঐ একই কথা। এ কথা ঠিকই যে সবই বিশ্বশক্তিব যন্ত্র, সুতরাং মায়েরই যন্ত্র। কিন্তু সাধনার উদ্দেশ্য হলো অপূর্ণ ও অজ্ঞান যন্ত্রস্বরূপ হয়ে না থেকে চেতন এবং পূর্ণতাপ্রাপ্ত যন্ত্র হওয়া। তা সম্ভব হতে পারে নিম্ন প্রকৃতির অন্ধ পরিচালনা বর্জন ক'রে মায়ের কাছে সমর্পিত হয়ে তাঁরই উচ্চ শক্তি তোমার মধ্যে সরাসরি কাজ করছে এটি জানা। সুতরাং তুমি এ বিষয়ে যা সহজ বোধিতে জেনেছো তাও ঠিক।

কিন্তু এসব জিনিস একদিনে হয় না। সুতরাং উদ্বিগ্ন কিংবা ব্যস্ত হওয়া যে চলবে না সে কথাও ঠিক। সজাগ হয়ে থাকতে হবে কিন্তু ব্যগ্র বা অস্থির হয়ে নয়। মায়ের শক্তি ঠিকই কাজ করবে এবং তার আপন সময়ে সাফল্য এনে দেবে, কেবল যদি তুমি তাঁর কাছে সর্বসমর্পণ ক'রে সজাগ হয়ে আস্পৃহা করতে থাকো, সবক্ষণ তাঁকে স্মরণ করো এবং ডাকো, তাঁর রূপান্তরকারী শক্তির ক্রিয়াকে যা বাধা দেবে তাকে প্রত্যাখ্যান করো।

তোমার দ্বিতীয় মনোভাবটি প্রথমটির চেয়ে তিযক দৃষ্টিভঙ্গী থেকে বলা, যে "কাজটি যে করছে সে তো আমি নয়, সুতরাং আমার ভাবনা করার কিছু নেই",––একথা অনেক বেশি বলা হয়ে গেল, কারণ তোমার নিজেকেই তো এগুলি ক'রে যেতে হবে––আস্পৃহা করা, নিজেকে নিবেদন করা, মায়ের ক্রিয়ার দিকে নিজেকে খুলে রাখা, অন্য সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা, উত্তরোত্তর সমর্পিত হওয়া। এগুলি ছাড়া আর যা কিছু তা সময়মত হয়ে যাবে, তার জন্য উদ্বিগ্ন বা অধৈর্য অথবা নিরাশ হবে না।

১৩-৭-১৯৩৫

×

প্রথম দিকে তোমার নিজের ইচ্ছাকে মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে এক ক'রে নেবে, এই কথা জেনে যে তোমারটা কেবল যন্ত্র মাত্র, ওর পিছনে রয়েছে মায়ের ইচ্ছা--আর তারই দ্বারা সাফল্য আসবে। পরে যখন সম্পূর্ণরূপে জানবে যে মায়েরই শক্তি ভিতরে কাজ করছে, তখন তোমার ব্যক্তিগত ইচ্ছা দিব্য ইচ্ছাতে রূপান্তরিত হবে

১৫-৭-১৯৩৫

×

কেবল সাধারণ রকমের মনোভাবই নয়, কিন্তু প্রত্যেকটি কাজকেই মাকে নিবেদন করতে থাকবে যাতে নিবেদনের ভাবটি সব সময় জীবন্ত থাকে। কাজের সময়ে কোনো ধ্যান নয়, কারণ তাতে কাজের দিকের একাগ্রতা চলে যায়, কিন্তু যাঁকে তুমি নিবেদন করছ তাঁর স্মৃতিটা সর্বদা জাগ্রত থাকবে। এ হলো প্রথম পর্ব; পরে যখন ভিতরে আপন অচঞ্চল সত্তাতে সর্বদার জন্য একটা ভগবৎ উপস্থিতি অনুভব করতে থাকবে আর সেই সঙ্গে বাহ্য মন তার কাজ করতে থাকবে, কিংবা যখন প্রত্যক্ষ অনুভব করবে যে মায়ের শক্তিই কাজগুলি করছে তোমাকে যন্ত্রস্বরূপ কিংবা মাধ্যম ক'রে তখন আর শুধু স্মৃতি নয়, তখন আপনা হতে আসবে যোগের উপ-লব্ধি, কর্মের মধ্যে দিব্য মিলন।

কেমন ভাবে মায়ের ইচ্ছাকে অনুসরণ করবে

মায়ের ইচ্ছা জেনে চলবার উপায় এই--তাঁরই দিকে ফিরে থাকা তাঁর আলোকে ও সত্যকে ও শক্তিকে পাবার জন্য, কেবল আস্পৃহা করতে থাকা যে তিনি ছাড়া অন্য কারো প্রভাব যেন তোমাকে চালিত না করে, প্রাণসত্তাতে কোনো দাবী না রাখা, মনকে নীরব ক'রে সত্য গ্রহণের জন্য প্রস্তুত রাখা কিন্তু নিজের মনের ধারণা বা মানসিক রচনাকে কোনো স্থান না দেওয়া--আর শেষ কথা, চৈত্যসত্তাকে জাগ্রত ও পুরোভাগে এনে রাখা, যাতে মায়ের সংস্পর্শ পেয়ে তুমি তাঁর ইচ্ছাটি জানতে পারো; তার কারণ মন ও প্রাণ অন্য কোনো প্রেরণাকে দৈবী ইচ্ছা বলে ভুল করতে পারে,

কিন্তু চৈত্য জাগ্রত থাকলে সে কখনো ভুল করে না।

অতিমানসগত হতে পারলে তবেই পরিপূর্ণ রকমের পূর্ণতা আসা সম্ভব; কিন্তু তার নিচেকার স্তরেও ওটা ব্যবহারিক রূপে ভালোভাবেই সম্ভব যদি তুমি ভগবৎ সংস্পর্শে তোমার মনে প্রাণে ও দেহে নিত্য সজাগ সতর্ক ও সচেতন থাকো। অবশ্য এগুলি হলো প্রস্তুতি যা চরম মুক্তির পক্ষে অপরিহার্য।

কর্মে সমুচিত মনোভাব

কেবল আভ্যন্তরীণ একাগ্রতার বেলাতেই নয়, কিন্তু বাহ্য ক্রিয়াকর্মেও তোমাকে সঠিক মনোভাবটি রাখতে হবে। তাই যদি করো আর প্রত্যেক জিনিসটি মায়ের দ্বারা চালিত হবার জন্য ছেড়ে দাও, তাহলে দেখবে যে তোমার সকল বিপত্তি সহজ হয়ে আসছে আর সব কিছু জটিলতা সরল হয়ে আসছে।

তোমার সাধনার একাগ্রতার মধ্যে যেমন করো, কাজের মধ্যেও তাই করবে। সব কিছু মায়ের দিকে খুলে ধরবে, তাঁর নির্দেশের দিকে চাইবে, শান্তি ও সমর্থনকারী শক্তিকে আহ্বান করবে, আশ্রয় চাইবে, আর তোমার প্রার্থনা যাতে সফল হয় তার জন্য সমস্ত অনিষ্টকারী ও নিশ্চেতনক্রিয় প্রভাবকে সযত্নে প্রত্যাখ্যান করবে।

এই সূত্র ধরে চলো, তাহলে তোমার সমগ্র সত্তা এক হয়ে গিয়ে একই নিয়মের অধীন হয়ে শান্তিতে ও আশ্রয়দায়ক আলোতে ও শক্তিতে অবস্থান করবে।

×

তোমার পক্ষে সত্য হবে এই যে তুমি নিজের মধ্যে ভগবানকে অনুভব করো, মায়ের দিকে উন্মীলিত থেকে মায়ের জন্য কাজ ক'রে যাও যতক্ষণ পর্যন্ত জানতে না পারো যে তোমার সকল কাজের মধ্যে তিনিই রয়েছেন। হৃদয়ে তাঁর উপস্থিতি ও কর্মে তাঁর নির্দেশ থাকা চাই। চৈত্য জাগ্রত থাকলে এটি শীঘ্র সহজে ও সুগভীর ভাবেই জানা যায়; চৈত্য থেকে তা মনে

প্রাণেও সঞ্চারিত হয়।

×

কোনো দাবী করবে না; মায়ের কাছে আপনা হতে যা পাও তাতে তোমাকে খুবই সাহায্য করে, আর দাবী ক'রে বা চাপ দিয়ে যা পাও তার মধ্যে তাঁর শক্তির সাহায্য থাকে না। প্রত্যেক ব্যক্তির পক্ষে যেমন সাহায্য প্রকৃতই দরকার মা সেইভাবেই প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্র ব্যবস্থা করেন (সে নিজে যেমন দরকার বলে ভাবে তেমন ভাবে নয়), যার যেমন প্রকৃতি ও সাধনার ধারা তাই বুঝে।

তোমার পক্ষে প্রয়োজনীয় শক্তি লাভের সব চেয়ে সার্থক উপায় হলো কোনো কিছু বাধাকে আসতে না দিয়ে সচেতনে ও নিখুঁতভাবে তোমার নির্দিষ্ট কাজটি ক'রে যেতে থাকা। মায়ের দিকে নিজেকে উন্মীলিত রেখে যদি এই ভাবে কাজটি ক'রে যাও তাহলে আরো অবিরাম ভাবে মায়ের কৃপা পেতে থাকবে এবং বোধ করতে থাকবে যে মায়েরই শক্তি তোমার ভিতর দিয়ে কাজ করছে; সুতরাং মায়ের উপস্থিতি সর্বদাই তুমি অনুভব করতে থাকবে। অপরপক্ষে তুমি যদি কাজে অবহেলা বা অমনোযোগ করো এবং তোমার নিজের খেয়াল ও বাসনাকে প্রাধান্য দাও, তাহলে তুমি কৃপার সঞ্চারকে ব্যাহত করবে আর বিজাতীয় শক্তিদের দেওয়া অস্বস্তি ও বিষাদ-কে তোমার মধ্যে প্রবেশ করার পথ খুলে দেবে। এই যোগের তরঙ্গস্রোতে প্রবেশ করার পক্ষে সব চেয়ে ভালো ও সহজ উপায় হলো কর্মের দ্বারা যোগ করা।

৮-৩-১৯৩০

×

যদি নিজের অপটুতা ও জড়তা ও নিষ্ক্রিয়তাকে স্বীকার ক'রে নাও তাহলে কোনো কাজই, এমন কি নিতান্ত দৈহিক ও যান্ত্রিক কাজও তুমি করতে পারবে না। ওর উপায় কেবল কোনো গতানুগতিক দৈহিক কাজে নিজেকে নিবদ্ধ রাখা নয়, ওর উপায় ঐ সব অপটুতা অক্ষমতা প্রভৃতির ভাবকে পরিহার ক'রে মায়ের শক্তির দিকে নিজেকে খুলে রাখা। যদি

তোমার মধ্যে গর্ব, উচ্চাকাঙক্ষা বা আত্মগরিমা এসে পড়ছে দেখ তাকে দূর ক'রে দাও। আপনা হতে ওগুলো সরে যাক বলে অপেক্ষা ক'রে থাকলে চলবে না। আপনা হতে হোক বলে অপেক্ষা ক'রে থাকলে কোনো কিছুই হয় না। যদি অক্ষমতা ও দুর্বলতাই তোমার বাধা হয়ঃ তথাপি যতই তুমি মায়ের শক্তির দিকে উত্তরোত্তর যথার্থভাবে নিজেকে খুলে দিতে পারবে ততই দেখবে যে কাজ করবার উপযুক্ত শক্তি ও দক্ষতা তোমার এসে যাচ্ছে আর তোমার আধারের মধ্যে ক্রমশঃ তেমন শক্তি জন্মাচ্ছে।

কর্মে সত্য চেতনা

তাকে বলবে যে সে যেন তার কাজ ও সব কিছুই করতে থাকে সমুচিত চেতনার সঙ্গে এবং সব কিছুই মাকে নিবেদন ক'রে ও তাঁর সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শ রেখে। এই ভাব ও এমন চেতনা নিয়ে কাজ করতে থাকা মানেই কর্মযোগ, আর একে তার সাধনার অংশস্বরূপ বলে জ্ঞান করতে হবে।

×

তুমি যে ভাবটি পেয়েছ এবং নিজের কাজের মধ্যে বজায় রেখেছ, ঐ হলো প্রকৃত কর্মযোগের ভিত্তিগত চেতনা—-উপর থেকে প্রশান্ত চেতনা তোমাকে সমর্থন ক'রে শক্তি দিয়ে কাজটি করাচ্ছে, আর সেই সঙ্গে তোমার ভক্তি বোধ করছে যে মায়ের চেতনা তোমার মধ্যে উপস্থিত থেকে কাজ করছে। নিজেই এখন অনুভূতির দ্বারা বুঝতে পারছ যে কর্মযোগের গুপ্ত রহস্য কোনখানে।

১৫-৯-১৯৩৬

×

চৈত্য চেতনাতে থাকার বিশেষ সুবিধা এই যে তুমি তাতে সঠিক ভাবে জেনে মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে নিজের ইচ্ছার সঙ্গতি ঘটাতে পারো এবং পরি-

বর্তন আনার জন্য মায়ের শক্তিকে আহ্বান করতে পারো। যারা মন ও প্রাণের স্তরে থাকে তারা এটা ভালোভাবে পারে না; কেবল ব্যক্তিগত প্রচেষ্টাকেই তারা প্রয়োগ করে, কিন্তু মন ও প্রাণের ইচ্ছা ও শক্তি বিভাজিত ও অপূর্ণ হওয়াতে কাজটাও সুস্পষ্ট না হয়ে অপূর্ণ হয়। কেবলমাত্র অতিমানসের ক্ষেত্রেই অবগতি ও ইচ্ছা ও শক্তি একই জিনিস হয়ে আপনা হতেই ফলপ্রদ হয়।

×

প্র : কাজের মধ্যে আমি সব সময়েই মায়ের স্পর্শ পাই, কেবল স্মৃতি নয় কিন্তু সংস্পর্শ বোধ। মায়ের শক্তি আধারের মধ্যে নিত্য প্রবেশ ক'রে কাজটা আপনা হতেই নির্বিবাদে তাড়াতাড়ি ও পুরোপুরি ভাবে হয়ে যেতে থাকে ——ব্যক্তিগত কোনো উদ্বেগ বা দায়িত্ববোধ আসে না; তার বদলে আসে স্থিরতা, নিশ্চয়তা, বল ও আস্থা। আমি বোধ করতে থাকি যে মায়ের সন্তান হয়ে কাজটা নিখুঁত-ভাবে ক'রে যাবো, কোনো অহংভাব না রেখে। আমার এই ভাবটি নির্ভুল কিনা জানাবেন।

উ : হাঁ, এ বেশ ভালোই উন্নতি এবং মায়ের শক্তির সঠিক প্রয়োগের প্রথম ধাপ।

×

প্রত্যেকেই তো আছে মায়েরই মধ্যে, কিন্তু তা চেতনাতে আসা চাই, কেবল কাজের সম্পর্কে নয়।

১-৪-১৯৩৫

×

এমন হতে পারে যখন কাজের মধ্যে মায়ের চিন্তাই সর্বদা লেগে থাকে,

এবং মাকে তা নিবেদন ক'রে বলা হয় যে তিনিই তোমার মধ্য দিয়ে তা ক'রে দিন। তার মধ্যে অহংভাব বা অহং সম্বন্ধে বোধ কোনো কিছুই থাকবে না। মায়ের শক্তিই কাজ করছে এই বোধ আসবে, কাজের পিছন থেকে আভ্যন্তরীণ প্রভাবে চৈত্য সত্তা জেগে উঠবে এবং আধার উন্মুক্ত হয়ে ভিতরকার চৈত্য বোধি ও প্রভাবকে স্থান দেবে এবং উপরদিক থেকে অবতরণও হতে পারবে। এমন হলে ধ্যানের দ্বারা যে ফল মেলে কর্মের দ্বারাও তাই মিলবে।

দিব্য জীবনের ভিত্তি

পূর্ণ ঐকান্তিকতা মানে কেবল দিব্য সত্যকে চাওয়া, নিজেকে ভগবতী মায়ের কাছে উত্তরোত্তর সমর্পণ করতে থাকা, এই একমাত্র আস্পৃহার কাছে সমস্ত ব্যক্তিগত কামনা ও দাবীকে বিসর্জন করা, জীবনের সকল কর্মকে ঐখানে নিবেদন করা কিছুমাত্র অহংভাব না রেখে। এই হলো দিব্য জীবনের ভিত্তিস্বরূপ।

এটা একবারের মধ্যে তখনই হয়ে যেতে পারে না, কিন্তু তুমি যদি সর্বদা তারই আস্পৃহা করতে থাকো এবং খাঁটি হৃদয়ভাব ও অবিচল ইচ্ছার সঙ্গে ভাগবতী শক্তির সাহায্য চাইতে থাকো, তাহলে উত্তরোত্তর ঐরূপ চেতনার মধ্যে তুমি নীত হবে।

অকৃত্রিম সেবার স্বরূপ

হৃদয়ের ভিতর থেকে অহংএর ছাপটা উঠিয়ে দিয়ে সেখানে রাখো মায়ের প্রতি ভালোবাসা। মন থেকে সমস্ত ব্যক্তিগত ধারণাকে ও বিচারকে ঘুচিয়ে দাও, তবেই সেখানে মাকে বোঝবার মতো বুদ্ধি আসবে। তোমার কাজের মধ্যে যেন আত্মইচ্ছা বা অহং-প্রেরণা কিছু না থাকে, ব্যক্তিগত প্রভুত্বপ্রীতি ও ব্যক্তিগত পছন্দ বলে কিছু না থাকে, তাহলে তখন মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে সুস্পষ্ট ভাবে কাজ করবে, তুমি অফুরন্ত কর্মশক্তি

লাভ করবে আর তোমার সেবা তখন পুরোপুরি অকৃত্রিম হবে।

২৭-১১-১৯৪০

×

হাঁ, ওটা খুবই দরকার——অহমিকা, ক্রোধ, ব্যক্তিগত ঘৃণা, আত্মমুখী স্পর্শকাতরতা প্রভৃতি বর্জন। কাজ করা কেবল কাজের জন্যই নয় কিন্তু তা সাধনার ক্ষেত্র হিসাবে, যাতে তোমার নিম্ন ধরণের ব্যক্তিত্ব ও তার প্রতিক্রিয়া ঘুচে গিয়ে ভগবৎ সেবাতে পূর্ণ সমর্পিত হতে পারো। আর কাজ যা করবে তা মায়ের ব্যবস্থিত ও অনুমোদিত রীতিতে। সর্বদাই স্মরণ রাখবে যে কাজটা মায়ের, তোমার নিজের নয়।

২৩-৩-১৯৩৫

×

এমন অবস্থা ও এমন ভাব এলে তোমাকে আগেও যা লিখেছি তাই আবার বলতে পারি। কাজ ছেড়ে দিলে ওর মীমাংসা হয় না——কাজের মধ্যেই নিজেকে লক্ষ্য করা চলে, এবং যোগের আদর্শের যা পরিপন্থী, যা অহংঘটিত বোধ ও ক্রিয়া, তাকে ক্রমশঃ দূর করা যায়। কাজ মায়ের, তা নিজের কাজ নয়——এই ভাবটি থেকেই অহং দূর হয়ে ক্রমশঃ চৈত্যসত্তা বিকাশলাভ করে। এর উপযুক্ত নিরিখ হবে যখন তুমি বিনা অভিমানে ও আত্মমর্যাদার দিকে না চেয়ে যে কাজই মা করতে দেবেন তাই করতে লাগবে——গর্বের বা ভালো লাগার বা আত্ম-পছন্দের স্পর্শমাত্র আসতে না দিয়ে।

কর্মের ভিতর দিয়ে সাধনার এই এক উচ্চ ও মহা আদর্শ সাধকের সম্মুখে রাখা হয়েছে যার তাৎপর্য সহসা হৃদয়ঙ্গম হবে না, কিন্তু এই লক্ষ্যটি তোমার সামনে থাকলে ক্রমে ক্রমে তার বোধ আসবে——ভগবতী মায়ের এক স্বার্থবর্জিত ও সুপরিণত যন্ত্রস্বরূপ হতে পারা।

২৮-৯-১৯৩৫

নির্ব্যক্তিক কর্মী

নির্ব্যক্তিক হওয়া মানে কোনো অহংকেন্দ্রিকতা না থাকা, কোনটার ক্রিয়াফল আমার নিজের সম্পর্কে কেমন হচ্ছে সেদিকে লক্ষ্য না থাকা, নিরপেক্ষভাবে সব জিনিসের বিচার করা, নিজের ইচ্ছাতে বা নিজের মতলবে বা নিজের লাভালাভ বুঝে কোনো কিছু না ক'রে যা পরম প্রভুর উদ্দেশ্য ও প্রয়োজন তাই জেনে কাজ করা। কাজেরই পক্ষে যা সব চেয়ে ভালো তাই করবে, নিজের ব্যক্তিগত সুবিধা বা মর্যাদার দিকে না চেয়ে, নিজের নয় কিন্তু মায়ের কাজ এই কথা ভেবে, নির্ব্যক্তিক ভাবে নিয়ম ও শৃঙ্খলা মেনে চলতে থেকে---যদিও তাতে নানা অসুবিধা থাকে, ইত্যাদি, ইত্যাদি। নির্ব্যক্তিক কর্মী যে হয় সে তার সমস্ত নৈপুণ্য ও নির্বিশেষ নিষ্ঠা ঐ কাজের মধ্যে প্রয়োগ করে, কিন্তু কোনো ব্যক্তিগত উচ্চাকাঙ্ক্ষা ও আবেগ প্রভৃতিকে স্থান না দিয়ে। তার আপন ক্ষুদ্র ব্যক্তিত্বের চেয়েও বড়ো কিছুর দিকে তার লক্ষ্য থাকে, এবং তারই প্রতি তার অবিচল শ্রদ্ধা ও আনুগত্য তার সকল ক্রিয়াকে নিয়ন্ত্রিত করে।

২৯-৬-১৯৩৫

×

যা কিছুই "আভ্যন্তরিক প্রেরণা" আসুক তাকে মায়ের দেওয়া কম প্রেরণা বলে ধরে নেওয়া বিপজ্জনক। তেমন জিনিস ভালো মন্দ যে কোনো শক্তির দ্বারা আসতে পারে তার আপন উদ্দেশ্যসিদ্ধির জন্য। আর মায়ের কাছ থেকে কোনো কাজ এলেও তার মধ্যে অহং থেকে যেতে পারে। যন্ত্রের অহং, এর সম্বন্ধে বিশেষ সতর্ক থাকা এই যোগের পক্ষে একটা প্রয়োজন। যখন কাজটির মধ্যে রয়েছ তখন তারই প্রেরণার জোরে তারই মধ্যে তন্ময় থেকে তাকে সম্পন্ন ক'রে তোলার আনন্দে থাকো, মন তখন অন্য কিছু ভাবে না,---কিন্তু কাজটি শেষ হয়ে গেলেই তখন "আমি করেছি" ভাবটি এসে পড়ে। আবার কারো বা কাজের মধ্যেও অহং সক্রিয় হয়ে থাকে।

৩-১১-১৯৩৫

×

অবশ্য ঐ একটা উপায় বটে, কিন্তু তবুও অহং সম্বন্ধে রীতিমত হুঁশিয়ার থাকা দরকার। এমন কি যারা বেশ ঐকান্তিক ভাবেই মনে করে যে তারা মায়ের কাজ করছে, তথাপি তারা নিজেদের অজানিতে অহং ভাবটি পোষণ করতে থাকে।

৪-৪-১৯৩৬

কর্ম কাঠিন্যের সুফল

তোমার সংকল্পে আমি খুশি হয়েছি। কাজের মধ্যে যতই কাঠিন্য ও প্রতিবন্ধকতা আসুক, তাকে যদি ঠিক মনে গ্রহণ করতে পারো, তাহলে তাতে তোমার মধ্যে গভীরতর সমতা আনার পক্ষে বিশেষ লাভ হবে। অবশ্য তার জন্য সাহায্য পাবার জন্যও প্রস্তুত থাকবে, কারণ মায়ের সাহায্য আসবেই প্রকৃতির পরিবর্তনের জন্য।

২৯-৯-১৯৩৫

×

মনে দুঃখ কোরো না বা নিরুৎসাহ হয়ো না। দুর্ভাগ্যের বিষয় এই যে মানুষরা পরস্পরের উপর নির্দয় হয়ে পড়ে। কিন্তু তুমি যদি ঐকান্তিকতার সঙ্গে নিজের কাজ ক'রে যেতে থাকো তাহলে মা খুশি থাকবেন আর তার পরে সব কিছুই হবে।

×

ক-এর অমন হঠাৎ রেগে ওঠাতে তুমি কিছু মনে কোরো না। নিজেকে সর্বদা এই কথা স্মরণ করাবে যে তুমি মায়ের কাজ করছ, আর সেই কথা মনে রেখে যদি তুমি যথাসাধ্য ভাবে তা ক'রে যাও তাহলে মায়ের কৃপা তুমি পাবেই। কর্মীর পক্ষে এই হলো সমুচিত মনোভাব, এটি ধরে থাকলে তোমার মধ্যে শান্ত নিবেদন এসে যাবে।

১-৩-১৯৩৩

মায়ের সঙ্গে আভ্যন্তরীণ সংযোগে কর্ম

নিজের মধ্যে নিজেকে আরো দৃঢ়তার সঙ্গে সংহত করা চাই। নিত্যই যদি নিজেকে বিক্ষিপ্ত হতে দাও, ভিতরকার গণ্ডী ছেড়ে বাইরে ঘোরো, তাহলে সাধারণ বাহ্য প্রকৃতির তুচ্ছতা ও তার অভ্যস্ত প্রভাবের মধ্যে নিত্যই ঘুরপাক খেতে থাকবে। ভিতরে অবস্থান ক'রে ভিতর থেকে কাজ করতে শেখো, মায়ের সঙ্গে নিত্য সংযোগ রেখে। প্রথমটায় অবশ্য তা পুরোপুরি ভাবে করতে পারা কঠিন হবে, কিন্তু চেষ্টায় লেগে থাকলে তা হয়ে যাবে--আর ঐ শিক্ষার ফলেই তুমি শেষ পর্যন্ত এই যোগে সিদ্ধিলাভ করবে।

৫-৬-১৯৩৪

×

বাইরে যখনই দেখবে অনিশ্চয়তার গণ্ডগোল, তৎক্ষণাৎ তুমি মনের মধ্যে এই নিয়ম ধরে নেবে যে বাইরের থেকে দেখে কোনো কিছুরই বিচার নয়--সমস্তই হাজির করবে ভিতরকার মায়ের আলোর কাছে--এই বিশ্বাসে যে সবই ওতে পরিষ্কার হয়ে যাবে।

মা বলেছেন যে তোমার কাজে যখনই কষ্ট বোধ করবে তখনই তা মাকে জানাবে, তাহলে তিনি তখন যা করবার তা করবেন।

১৬-৯-১৯৩৩

কাজের সময় মায়ের শক্তিকে চাওয়া ও বিশ্রামের প্রয়োজন

দেহের সাধারণ অবস্থাতে যদি তুমি দেহকে দিয়ে অনেক বেশি কাজ করাতে যাও তবে প্রাণশক্তির জোরেই তা করতে পারো। কিন্তু কাজটি শেষ হলেই প্রাণশক্তি তখন গুটিয়ে যায় আর দেহ হয়ে পড়ে অবসন্ন। এমনি বার বার অনেককাল যাবৎ করতে থাকলে অতিরিক্ত প্রবেগের ফলে শক্তিলোপ ঘটে স্বাস্থ্যভঙ্গ হতে পারে। তখন বিশ্রাম দরকার স্বাস্থ্য ফিরে পাবার জন্য।

কিন্তু যদি তোমার মন ও প্রাণ মায়ের শক্তির দিকে খুলে থাকাতে

অভ্যাস্ত হয়ে যায়, তখন সেই শক্তির সমর্থন পেয়ে মন ও প্রাণ তাতেই পূর্ণ, হয়ে যেতে পারে—আর সেই শক্তিই সব কাজ করতে থাকায় দেহ সেই কাজের আগে কিংবা পরে কোনোই ক্লান্তি বোধ করে না। তথাপি, দেহটিও যতক্ষণ সেই শক্তিকে ঐভাবে গ্রহণ ক'রে তাকে ধরে রাখতে না পারছে, ততক্ষণ কাজের ফাঁকে ফাঁকে বিশ্রাম নেওয়া অবশ্যই দরকার। নতুবা দেহ অনেককাল পর্যন্ত কাজ ঠিক করতে থাকলেও শেষকালে তা ভেঙে পড়বার আশংকা থাকে।

দেহটি বহুকাল পর্যন্তই ঠিক থাকতে পারে যদি পূর্ণ প্রভাবের মধ্যে ও একাগ্র শ্রদ্ধার মধ্যে থেকে মনে ও প্রাণে তার ডাক বজায় থাকে; কিন্তু মন ও প্রাণ যদি অন্য কিছুর দ্বারা প্রভাবিত বা এমন কোনো শক্তির দিকে খুলে যায় যা মায়ের শক্তি নয়, তাহলে একটা মিশ্রিত অবস্থা এসে পড়ে, কখনো বল কখনো ক্লান্তি বা অসুস্থতা বা দুইই একসঙ্গে।

আর শেষ কথা, মন ও প্রাণ সমেত দেহও যদি মাতৃশক্তির দিকে উন্মীলিত হয়ে তাকে ধরে রাখতে পারে তাহলে সে অত্যাশ্চর্য ক্রিয়া করতে পারে কিছুমাত্র ক্ষতি না হয়ে। তবুও সেখানে কিন্তু বিশ্রাম চাই। তাই আমরা কর্মপ্রিয়দের সম্বন্ধে শ্রম ও বিশ্রামের সামঞ্জস্য রাখার দিকে এত জোর দিয়ে থাকি।

ক্লান্তি হতে সম্পূর্ণ মুক্তিলাভও সম্ভব, কিন্তু তা হতে পারবে যখন অতি-মানস শক্তি পার্থিব প্রকৃতির মধ্যে অবতরণের ফলে এখনকার দৈহিক নিয়মগুলির রূপান্তর ঘটবে।

×

আশ্রমে এই জিনিসটাই প্রত্যহ ঘটছিল দৈহিক কর্মীদের বেলাতে। পুরো স্ফূর্তি ও উৎসাহের সঙ্গে কাজের আবেগে খাটতে খাটতে যখন তারা ক্লান্ত হতো তখন তারা মাকে ডাকতো, সঙ্গে সঙ্গে বিশ্রাম অনুভব করতো, এবং তার পরেই নবীন উত্তেজনা পেয়ে দ্বিগুণ কাজ করতে পারতো বিনা ক্লান্তিতে। অনেকের মধ্যে প্রাণসত্তা থেকে আহ্বান হতো শক্তিকে, তাতে এমন এনার্জি বা তেজ আসতো যে গোড়া থেকে শেষ পর্যন্ত না থেমে তারা কাজ করতে পারতো।

২৬-৩-১৯৩৬

কাজে প্রাণের তেজ

কাজে প্রাণের তেজ বাড়াতে ভয় পেও না। প্রাণের তেজ ভগবানের অমূল্য দান, ও ছাড়া কোনো কিছুই করা যায় না--যে কথা মা গোড়া থেকেই বলেছেন; তাঁর কাজ সফল করবার জন্যই ওটি তোমাকে দেওয়া হয়েছে। আমি খুব খুশি হয়েছি যে তা আবার ফিরে এসেছে, তার সঙ্গে প্রফুল্লতা ও শুভ প্রত্যাশা। তাই হওয়াই দরকার।

কাজের উপর প্রভুত্ব

তোমার বই লেখাতে মায়ের কোনো আপত্তি নেই--কিন্তু তিনি এটা পছন্দ করেন না যে তুমি ওটার মধ্যে এমন ডুবে যাবে যে আর কিছুই করবে না। তুমি তোমার কাজের প্রভু হবে, কাজ তোমার প্রভু হবে না। তুমি বইটা লেখা সম্ভব হলে শেষ করো এবং তোমার জন্মদিনে মাকে তা উপহার দাও, এতে তাঁর কোনো অমত নেই। কিন্তু ওতেই তুমি নিজেকে হারিয়ে ফেলো না--উচ্চতর জিনিসগুলির সম্পর্কও বজায় রেখে চলো।

১-৫-১৯৩৪

মায়ের জন্য প্রচার

প্রচারের কাজকে মা তেমন কিছু মূল্য দেন না, তথাপি ওটাও হতে পারে মায়ের কাজ। কেবল তা আসা চাই মায়ের প্রেরণা থেকে, তেমনি অচাঞ্চল্য ও তেমনি পরিমাপ নিয়ে, যেমন ভাবে তাঁর ইচ্ছা হবে। এ কাজ করতে হবে মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে মিলিত হয়ে আভ্যন্তরীণ সত্তা থেকে, প্রাণগত মনের ব্যগ্র প্রবর্তনা থেকে নয়। সাধকের পক্ষে প্রথম জরুরী কাজ হবে নিজের আধ্যাত্মিকতা ও অনুভূতির বিকাশ--অন্যেদের সাহায্য করতে উৎসুক হলে তাতে এই আভ্যন্তর ক্রিয়া থেকে অপসারণ ঘটে। নিজেকে বিকাশ করতে পারাই অন্যেদের সাহায্য দেওয়ার কাজটি সব চেয়ে ভালো-ভাবে হতে পারে, কারণ তোমার ভিতর থেকে যে প্রভাবের ধারা নির্গত

হবে তাতে আপনা হতেই আশপাশের লোকদের অভিষিক্ত করবে।

৯-৪-১৯৩৭

×

প্রঃ এটা কি ঠিক কথা যে আমার পক্ষে এই বোধ করা চাই যে আমাকে দিয়ে ভগবৎ উপস্থিতিই সব কাজ করিয়ে নিচ্ছে? মায়ের সঙ্গে মিলন না হলে তা কি সম্ভব হতে পারে?

উঃ না--কিন্তু ঐরূপ উপস্থিতি বোধ করা--ওটাই তো মায়ের সঙ্গে মিলন।

১৪-৭-১৯৩৩

×

প্রঃ আমি "যোগ সমন্বয়" ও মায়ের "কথাবার্তা" দুই গ্রন্থেই পড়েছি যে আমার সকল কর্ম চিন্তা এবং বাক্য যেন মাকে নিবেদিত হয়। প্রথমে ওতে কেবল মনের প্রয়াস মাত্র হলেও পরে ওতে ভক্তি এসে পড়বে, যদি উদ্যম আন্তরিক হয়। স্থূল ধরনের কাজের বেলা তা সম্ভব হলেও যে কাজে মনের নিবিষ্টতা দরকার, যেমন লেখাপড়া করা, সেখানে তা সম্ভব বলে মনে হয় না। চেতনা যদি তাই স্মরণ রাখতেই ব্যস্ত থাকে তাহলে মনোযোগ খণ্ডিত হয়, কাজটা ভালোরকম হয় না।

উঃ তার কারণ লোকে উপরভাসা মন নিয়েই থাকে। আভ্যন্তরীণ মনের মধ্যে থাকলে কেবল উপরভাসা চেতনার দ্বারাই কাজটা চলতে থাকে এবং তার পিছনে সে গভীরে নীরব নিবেদিত মনের মধ্যে অবস্থান করে।

×

প্রঃ তেমন চেতনা কি আস্পৃহার দ্বারাই আসবে অথবা মনের প্রচেষ্টা দরকার?

উঃ মনের প্রচেষ্টা দিয়ে শুরু করতে হয়। পরে যে আভ্যন্তর চেতনা তৈরি হয়ে ওঠে তাতে সব সময় মায়ের কথা চিন্তা করবার দরকার হয় না।

×

প্রঃ মাকে নিবেদন দুইরকম ভাবে হতে পারে; এক হলো আমার কাজকে মায়ের পায়ে নিবেদন করা, ফুল দেবার মতো; আর হলো আপন ব্যক্তিত্বকে ডুবিয়ে দিয়ে বোধ করা যে মা-ই সব কাজ করছেন। প্রথমটিতে থাকে দ্বৈত ভাব, আর দ্বিতীয়টিতে মিলে এক হয়ে যাওয়া। সাধনার পক্ষে কোন পন্থাটি ভালো?

উঃ কোনটি ভালো সে প্রশ্নের প্রয়োজন নেই, কারণ দুটি আলাদা আলাদা নয়। মনই দুটিকে পৃথক ও বিপরীত ভাবছে। চৈত্যসত্তা কাজ-টিকে নিবেদন ক'রে দেয় আর তখন প্রকৃতি থাকে নিষ্ক্রিয় হয়ে (অহং-বর্জিত হয়ে) এবং মায়ের উপস্থিতি বোধ ক'রে জানে যে মায়েরই শক্তি কাজ করছে।

৫-১১-১৯৩৮

×

প্রঃ আমি যখন কাজ করি তখন চাই যে মায়ের শক্তিই যেন আমাকে দিয়ে করিয়ে নেন। আর যখন কাজ করি না তখন কিসের জন্য আস্পৃহা করব?

উঃ মায়ের শক্তি তোমার দ্বারা কাজ করিয়ে যেন ধাপে ধাপে তোমার মধ্যে উচ্চচেতনা এনে দেন। আর তোমার সত্তা যেন আরো উপযুক্ত,

নীরব, সমর্পিত, অহংশূন্য হয়।

×

প্রঃ আজ আমার মনে হ'ল যে আমি ছাড়া আর কেউ আমার কাজগুলি করে দিচ্ছে। অবশ্যই আমি সেখানে ছিলাম, কিন্তু পেছনে। এটা কি মায়ের শক্তি নয়, যা আমাকে সম্পূর্ণভাবে নিজের মধ্যে নিয়ে যেতে চেষ্টা করছিল?

উঃ অতোটা বলা ঠিক নয়। সমস্ত কাজের পিছনে যে বিশ্বশক্তি কাজ করে, তুমি তাই একটু দেখেছ।

২-৬-১৯৩৪

×

প্রঃ মায়ের ইচ্ছাশক্তির সঙ্গে নিজের ইচ্ছাশক্তিকে কি করে এক করা যায়?

উঃ মায়ের চেতনার সঙ্গে নিজের চেতনার অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন করতে পারলে এটা সম্ভব হয়।

২৪-৬-১৯৩৩

×

প্রঃ চেতনার "অবিচ্ছিন্ন সম্পর্ক স্থাপন" বলতে কি বোঝায়? এটা মানসিক ক্ষেত্রের না চৈত্যের ক্ষেত্রের সম্পর্ক?

উঃ সমগ্র সত্তাই বোঝায়—চৈত্যসত্তাকে ভিত্তি করে।

২৫-৬-১৯৩৩

×

প্রঃ আত্মসমীক্ষণ করে বুঝলাম যে আমাদের মত সাধকদের পক্ষে স্বেচ্ছায় মাকে নিজেদের মধ্যে কাজ করতে দেওয়া সম্ভবপর নয়। প্রায়ই আমাদের ভিতরে কোনও জিনিষ সরে দাঁড়ায় আর দরোজা বন্ধ করে দেয়। আমার মনে হয় সব চেয়ে ভাল উপায় হ'ল নিজে-দের ইচ্ছাশক্তিকে বাড়ানো, যাতে সব সময়ই কিছু না কিছু থাকে যা দরোজা আবার খুলতে সাহায্য করে। প্রাণের বা মনের ইচ্ছাশক্তির কথা বলছি না—সত্যি-কারের ইচ্ছাশক্তি। অনুগ্রহ করে কি বলবেন কি করে এটা বাড়ানো যায়?

উঃ একমাত্র উপায় হ'ল (১) চিৎশক্তি যে পিছন থেকে কাজ করছে সে সম্বন্ধে সচেতন থাকা; (২) সেই শক্তিকে উদ্দেশ্যের দিকে নিয়োজিত করার অভ্যাস। আমার মনে হয় না যে এ দুটির মধ্যে যে কোনও এক-টিকে করা তোমার পক্ষে সহজ হবে এখনিই—অন্তরের জীবনে আরও গভীর ভাবে প্রবেশ করতে হবে—তুমি এখন যে ভাবে করছ তার চেয়ে গভীরতর ভাবে।

১৬-৭-১৯৩৪

৯

মা এবং আশ্রমের কর্মধারা

মা এবং আশ্রমের কর্মধারা

সাধকদের মধ্যে মায়ের সাধনা

অবশ্য প্রত্যেক সাধকের মধ্যেই মায়ের সাধনা চলে--তবে প্রত্যেকের আগ্রহ এবং গ্রহিষ্ণুতা অনুসারে তা নিরূপিত হয়।

৪-১-১৯৩৫

×

উপরের জিনিস নামিয়ে আনার ব্যাপারে মায়ের নিজের অনুভূতি স্বতন্ত্র--কিন্তু সাধকদের যে অনুভূতি আসে তা অনেক কাল আগেই তাঁর হয়ে গেছে। যিনি ভগবান তিনি প্রথমে সাধনা করেন সমগ্র জগতের জন্য, তার পরে করেন অন্য সকলের মধ্যে।

১২-৯-১৯৩৪

×

আমি এই কথাই বলেছি যে ভগবান আগে জগতের জন্য সাধনা করেন তার পরে যা তিনি নামিয়ে আনেন তা অন্যেদের মধ্যে দেন। অনুভূতি ও উপলব্ধি ব্যতীত কোনো সাধনাই হতে পারে না। মায়ের "Prayers" ("প্রার্থনা ও ধ্যান") পুস্তকটি তাঁর অনুভূতির বিবৃতি।

৪-১-১৯৩৫

মায়ের দেওয়া সত্য সন্ধান

মা তোমার হয়ে এটা স্থির ক'রে দিতে পারেন না যে তুমি নির্বিকল্প

সমাধির পথ নেবে কিংবা এই যোগের পথ নেবে, তিনি কেবল তোমাকে সত্যের সন্ধান দিতে পারেন, আর সেই পথ যদি মেনে নাও তাহলে সেই পথে চালিয়ে নিয়ে যেতে পারেন।

৮-৯-১৯৩৩

মা এবং জ্ঞানযোগ

জ্ঞান যোগ মা অপছন্দ করবেন কেন? আত্মার এবং বিশ্বসত্তার উপলব্ধি (তা না হলে আত্মার উপলব্ধি অসম্পূর্ণ থাকে) এগুলি হলো আমাদের যোগের অপরিহার্য ধাপ; অন্যান্য যোগে *ঐখানেই* শেষ কিন্তু আমাদের যোগ *ঐখান* থেকে শুরু, অর্থাৎ *ঐখান* থেকে এর বিশিষ্ট রকম উপলব্ধির সূত্রপাত হবে।

২৬-৩-১৯৩৬

আশ্রমে এসে যোগ দেওয়া

ওরা কিংবা অন্য কেউ এই আশ্রমে আসুক এমন ইচ্ছা বা আগ্রহ তোমার মধ্যে থাকা উচিত নয়। এটা একদিক থেকে তারাই বুঝবে যারা তার জন্য ডাক পাবে বা প্রস্তুত হবে, আর অন্যদিক থেকে মায়ের যখন তাতে ইচ্ছা হবে।

২৮-৮-১৯৩৬

অস্থায়ী পরখের কাল

আপাতত নিশ্চয় ক'রে কিছু না লেখাই ভালো। বিশেষত এখনকার দিনে মা এই সব ক্ষেত্রে কোনো নিশ্চিত সম্মতি না দিয়ে কিছুকাল এখানে রেখে পরখ ক'রে দেখেন যে কেমন ভাবে তাদের উন্মীলন হচ্ছে। তাদের

আস্পৃহা যদি খাঁটী হয় তাহলে সম্মতি ঠিকই হয়ে যায়।

২৬-২-১৯৪৩

ভিতর থেকে বেছে নাও

মা তোমাকে এখানেই থেকে যেতে বলতে পাবেন না, যদি তোমার নিজের মনে ও প্রাণে চলে যাবার জন্য ব্যস্ত হও। তোমার নিজেরই ভিতর থেকে সুস্পষ্টভাবে ইচ্ছা ঠিক হওয়া চাই কোনো একটা দিকে, থাকবে না যাবে।

২৪-২-১৯৩২

মায়ের ভারগ্রহণ

প্রঃ কেউ যখন মায়ের অধীনে যোগ শুরু করে, তখন কি তিনি তার পুরো ভার নেন না?

উঃ সে প্রস্তুত না হওয়া পর্যন্ত নয়। প্রথমে তার মাকে মেনে নিতে হবে আর উত্তরোত্তর অহং ত্যাগ করতে হবে। অনেক সাধক গোড়ার দিকে বিদ্রোহ ক'রে প্রতিপদে মায়ের বিরোধিতা করে, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে যায়, তাঁর কাজের বিচার করে। এমন হলে কেমন ক'রে তাদের পুরো ভার নেওয়া যায়?

২১-৬-১৯৩৩

×

আধ্যাত্মিক জীবন ও বাধ্যতা সম্বন্ধে সাধারণ নিয়মের কথাই বলেছি। সেটাও তোমার জানা দরকার আর এখানে তার বিশেষ প্রয়োগ সম্বন্ধেও জানা দরকার। বিশেষত অনেকেই এখানে মুখে বলে "মা হলেন ভগবতী", অথচ তারা মায়ের নির্দেশ মেনে চলে না—কেউ কেউ তাও মনে করে না,

ভাবে যে সাধারণ গুরু যেমন হয়ে থাকে ইনিও তাই। তাই আমি বলেছি যে যোগের ক্ষেত্রে বাধ্যতার প্রয়োজন কতখানি, ওর চেয়ে বেশি কিছু বলা যায় না।

মাকে ছেড়ে চলে যাবার কারণ

তুমি ঠিক কথাই লিখেছ। কোনো সাধক ছেড়ে গেলেই যে ভগবানের পরাজয় হলো এমন কথা বলা বোকামি। সাধক যদি তার নিম্ন প্রকৃতিকে অধিকার ছেড়ে দেয়, সেটা তারই পরাজয়, ভগবানের নয়। সাধকরা এখানে আসে ভগবানের তাকে প্রয়োজন বলে নয়, তারই ভগবানকে প্রয়োজন বলে। সে যদি আধ্যাত্মিক জীবনের শর্তগুলি পালন ক'রে মায়ের দেওয়া নির্দেশকে সম্পূর্ণরূপে অনুসরণ করে, তাহলে সে তার লক্ষ্যে পৌঁছবে; কিন্তু সে যদি তার নিজের শর্ত পালন ক'রে নিজের মতকে অনুসরণ করে ও ভগবান সম্বন্ধে নিজের ইচ্ছাকেই বড়ো করে, সেখানেই যত কিছু বিপত্তি ঘটে। ক এবং খ এবং আরো কয়েকজনের বেলা তাই হয়েছিল। ভগবান তাদের ইচ্ছামত না চলায় তাদের চলে যেতে হলো; তাতে ভগবানের পরাজয় কেমন ক'রে হলো?

২৭-৫-১৯৩৭

×

প্র ঃ এটা কেমন ক'রে হয় যে কেউ কেউ স্পষ্ট ডাক পেয়ে এবং খাঁটী আস্পৃহা নিয়ে মায়ের কাছে এসেও কিছুদিন পরে ছেড়ে চলে যায়? কিসে তাদের সরিয়ে নিয়ে যায়?

উ ঃ তারা যায় বিরুদ্ধ শক্তির প্ররোচনাতে, যারা ওদের মধ্যে গর্ব, অহংকার, উচ্চাকাঙ্ক্ষা, কাম, লোভ প্রভৃতি নানাবিধ প্রাণগত প্রবৃত্তিকে জাগিয়ে দেয়।

×

প্র ঃ বিরুদ্ধ শক্তিরা কি এতই প্রবল যে অমন আস্পৃহা ও নিশ্চিত ডাক পাওয়া সত্ত্বেও মায়ের কাছ থেকে সাধককে সরিয়ে নিয়ে যেতে পারে?

উ ঃ প্রত্যেক মানুষই প্রত্যেক মুহূর্তে এ বিষয়ে মুক্ত, তারা ভগবানের ডাক শুনতেও পারে না-শুনতেও পারে, আত্মাকে অথবা নিম্ন প্রকৃতিকে ইচ্ছামত অনুসরণ করতে পারে।

×

প্র ঃ তারা আপন জ্ঞানের দ্বারা ঠিক বিচার করতে পারে না যে ভগবানের ডাক পাওয়া ঠিক সত্য কিনা, সেইজন্যই কি তারা এ পথ ছেড়ে চলে যায়?

উ ঃ বিচার কিসের, ওর কোনো মানে হয় না। তুমি উপরের ডাক অনুভব করেছ অথবা অনুভব করোনি, আর যদি অনুভব ক'রে থাকো তাহলে তখন কোনো বিচার বা হিসাবনিকাশ বা ঝুঁকি নেওয়া যায় কিনা অথবা তুমি উপযুক্ত কিনা এসব কিছু না ভেবেই তাকে অনুসরণ করো।

×

প্র ঃ কেউ যখন সাধনা ছেড়ে মায়ের কাছ থেকে চলে যাবার জন্য জোর তাগিদ বোধ করছে তখন তাকে কাটিয়ে মায়ের কাছেই যাতে থাকা যেতে পারে, তার জন্য কি উপায় করা যেতে পারে?

উ ঃ একথা বুঝে দেখা যে ওটা অসুরের তরফের তাগিদ, তাকে আদৌ আমল না দেওয়া।

×

প্রঃ অনেক বছর আশ্রমে থেকেও যারা চলে যায়, তারা কি চলে গিয়ে মায়ের কৃপা ভুলে যায়?

উঃ কেউ কেউ তা ভুলেই যায়।

×

প্রঃ তাদের কি আবার মায়ের কাছে ফিরে এসে সাধনা করবার সম্ভাবনা থাকে?

উঃ সেটা নির্ভর করে ব্যক্তি বিশেষের উপরে।

৬-৯-১৯৩৩

×

একবার যদি চৈত্যসত্তা সম্পূর্ণ সজাগ হয়ে ওঠে তখন আর কোনো সাধকের বিদ্রোহ ক'রে চলে যাবার সম্ভাবনা থাকে না; কারণ সে সরে গেলেও তার আত্মাকে রেখে যায় মায়ের কাছে, কেবল তার বাহ্য সত্তাই কিছুকাল বাইরে গিয়ে কাটায়। কিন্তু তাও খুব পীড়াদায়ক অবস্থা; তাকে আবার ফিরেই আসতে হয় নতুবা তার জীবন অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে।

২০-১১-১৯৩৫

মায়ের উপস্থিতিতে আধ্যাত্মিক সাফল্যের সম্ভাবনা

হাঁ খুব কম ব্যক্তিই বোঝে যে এখানে আসাতে কতখানি সম্ভাবনা ও সুযোগ তারা পেয়েছে—তারা এই সুযোগকে চৈত্যের ও আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্যে সদ্ব্যবহার না করে কেবল নিজেদের প্রাণগত বা দৈহিক তমস্‌কেই আরো প্রকট ক'রে তোলে।

৭-৩-১৯৩৬

×

কোনো বিশেষ জিনিস নিয়ে আমি বলিনি--কেবল বলেছি মায়ের উপস্থিতিতে এখানকার সমগ্র আধ্যাত্মিক সম্ভাবনার কথা। খুব কম জনই তা বোঝে আর যারা কিছু বোঝে তারাও সে সুযোগ অবহেলা ক'রে নিম্ন প্রকৃতিকে প্রশ্রয় দিয়ে উন্নতিকে ব্যাহত করে।

৯-৩-১৯৩৬

আশ্রমে বাস্তব জীবনের দুটি ভিত্তি

এখানকার বাস্তব জীবনে দুটি ভিত্তি থাকতে পারে। একটি হলো এই যে আত্মদান ও সমর্পণের মূল সূত্রে প্রতিষ্ঠিত এই আশ্রমের তুমি অধিবাসী। তুমি ভগবানের হয়ে গেছ, তোমার যা কিছু আছে সবই ভগবানের; তুমি যা দিচ্ছ তা তোমার নিজের কিছু নয়, ভগবানেরই জিনিস তাঁকে দিচ্ছ। এখানে কোনো দেওয়া নেওয়া বা বিনিময়ের প্রশ্ন, কোনো দাবী-দাওয়া থাকতে পারে না। আর মা এখানে সর্বময়ী কর্ত্রী, তাঁর যতখানি সম্বল ও তাঁর যন্ত্রগুলির যতখানি সামর্থ্য তাই নিয়ে যতটা সম্ভব সুব্যবস্থা করছেন। সাধকদের মনের আদর্শ বা প্রাণের খেয়াল অনুসারেই চলতে হবে এমন কোনো বাধ্যবাধকতা তাঁর নেই; সকলের সঙ্গে সমান আচরণের গণতান্ত্রিক প্রণালী মেনে চলতেও তিনি বাধ্য নন। যার পক্ষে যেমন প্রয়োজন ও আধ্যাত্মিক উন্নতির দিক দিয়ে যাকে যেমন ভাবে দেখা দরকার সে সম্বন্ধে তিনি স্বাধীন। তাই নিয়ে কেউ তাঁকে বিচার করতে কিংবা নিয়ম বাতলাতে পারে না; যা কিছু নিয়ম তিনিই গড়বেন, দরকার হলে তিনিই ভাঙবেন, কিন্তু সেখানে কারো কোনো দাবী চলবে না। কারো ব্যক্তিগত নির্দেশ তাঁর উপর খাটবে না। কেউ যদি এমন কোনো কিছু প্রকৃত দরকার বলে বোঝে ও সেটা তার অধিকারের অন্তর্গত হয়, তাহলে তাই নিয়ে সে মায়ের কাছে প্রস্তাব মাত্র করতে পারে, কিন্তু মা যদি তা অনুমোদন না করেন তাহলে তাকে তাতেই খুশি হয়ে থেমে যেতে হবে। এই হলো আধ্যাত্মিক নিয়ম, যিনি কেন্দ্রে থেকে ভগবানের প্রতিনিধিত্ব করছেন তাঁরই রচিত। হয় তাঁকে ভগবানের প্রতিনিধি জ্ঞান করো এবং তাহলে সব কিছুরই মীমাংসা হয়ে গেল; আর তা যদি না হয় তাহলে কারো এখানে

থাকার দরকার নেই, তাহলে আশ্রমও নেই আর যোগও নেই।

১১-৪-১৯৩০

মায়ের কার্যবিধি ও অপচয়

বৃথা অপচয় সম্বন্ধে তোমাকে আর কিছু বলা দরকার মনে করিনি, কেবল এইটুকুই বলেছি যে এখানকার সকলকে নিযুক্ত রাখার জন্য অনর্থক কতকগুলো অপ্রয়োজনীয় কাজের সৃষ্টি করা মায়ের কার্যবিধির অন্তর্গত নয়। তুমি কোন পাইপের কথা বলেছ মা তা জানতেন না, তাই নিয়ে খোঁজ করার তাঁর সময়ও হয়নি ইচ্ছাও হয়নি। একথা ঠিকই যে সিদ্ধ যোগী যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সাধকদের সকল বিষয়ে আত্মসংযত থাকাই নিয়ম; সকল দিক থেকেই তাদের বাড়াবাড়ি দমন করতে শিখতে হবে, এবং অবহেলা, লোভ বা ব্যক্তিগত খেয়ালকে নিবারণ করতে হবে-- তার জন্য এখানে সাধকদের পক্ষে যে সুযোগ রয়েছে তা অন্য কোথাও নেই। কিন্তু তথাপি তারা যখন ঐ সবই গাফিলতি করতে থাকে তখন মা প্রতি পদে তাদের সংশোধন করতে যান না। একটা আদর্শ ছকে দেওয়া হয়েছে, কিছু যেন নষ্ট করা না হয় তাও বলে দেওয়া হয়েছে, একটা কাঠামো দাঁড় করানো হয়েছে, এখন এই আশা করা যায় যে তারা নিজেদের ভিতরকার চেতনা থেকে আর মায়ের শক্তির সাহায্যে নিজেদের দুর্বলতা কাটিয়ে ঠিক ভাবে কাজ করতে ক্রমশ শিখবে। আগেকার দিনে কর্মীরা এবং সাধকরা মায়ের ইচ্ছাকে আদৌ না মেনে নিজেদের খেয়ালমত কাজ ক'রে প্রচুর অপচয় ঘটাতো; নতুন রকম ব্যবস্থার দ্বারা সেগুলো অনেকটা থেমেছে। কিন্তু তথাপি খানিকটা অপচয় হচ্ছেই এবং এখনও তা হবেই, যতদিন পর্যন্ত কর্মী এবং সাধকরা তাদের ইচ্ছা এবং চেতনাতে অপূর্ণ অবস্থায় থাকবে, আর মায়ের নির্দেশ না শুনে নিজেদেরকে তাঁর চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ভেবে আপন আপন স্বাধীন মতলব অনুযায়ী চলতে থাকবে। কিন্তু তাতেও মা সব সময়ে কোনো হস্তক্ষেপ করতে চান না, তিনি কেবল পর্যবেক্ষণ ও লক্ষ্য ক'রে যান, বাইরে কিছু বললেও সাধকদের ব্যক্তিগত জীবন নিয়ে কোনো কিছু বলেন না,--তিনি চান যে নিজেদেরই ভিতরকার চেতনার দ্বারা ও অভিজ্ঞতার দ্বারা নিজেদের ভুল বুঝে তা সংশোধন

ক'রে নিক, তার মধ্যে যা কিছু চাপ দেবার দরকার তা তিনি বাইরের থেকে না দিয়ে ভিতর থেকে দেন। এই সকল বিষয়ে মা তাঁর নিজের দৃষ্টি ও বিচার অনুযায়ী কাজ করেন, সে ক্ষেত্রে কারো কিছু ভালো মন্দ বলতে গিয়ে কোনো লাভ হয় না--তার কারণ মা কাজ করেন তাঁর স্বতন্ত্র দৃষ্টিকেন্দ্র থেকে, সেখানে তাঁর চেয়ে এমন বেশি আলো কারো মধ্যেই নেই যাতে তাঁর কাজের বিচার চলে।

কিবা কাজের বেলাতে আর কিবা যোগের বেলাতে, মা যা করেন তা সাধারণ মনের স্তর থেকে নয় কিন্তু এমন এক চেতনার স্তর থেকে যার দৃষ্টিসীমা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। সুতরাং মনের বিচারের আদালতে দাঁড় করিয়ে তাঁর কাজের কৈফিয়ৎ দাবী করা এখানে চলবেই না, আর যে উচ্চ স্থান তিনি অধিকার ক'রে আছেন তার বিরুদ্ধে অমন কিছু ভাবতে যাওয়াও অনর্থক ও অসঙ্গত। অমন অযৌক্তিক কিছু করতে গেলে তার সুফল কিছুই মিলবে না, বরং এমন একটা অহেতুক আবহাওয়ার সৃষ্টি করবে যাতে সাধনার সাফল্যের পক্ষে তা বিপরীত হয়ে দাঁড়াবে। ঠিক সেই কারণেই এই সব সংশয়ের কথা উঠলে আমি তার কোনো জবাব দিই না, বা এমন ভাবে জবাব দিই যাতে সে প্রশ্ন আর না ওঠে। মা যে কোনটা কেন করছেন তা যারা বুঝতে চাইবে তাদের পক্ষে উচিত হবে মা যে আভ্যন্তরীণ চেতনার ভিতর থেকে সব কিছু দেখছেন ও করছেন সেই চেতনার মধ্যেই গিয়ে প্রবেশ করা। আর মা যে কে এবং কি, তাও জানতে পারা যাবে সেইরূপ আভ্যন্তরীণ বা গভীর শ্রদ্ধার দৃষ্টিতে। আর আমরা যে এমন সব লোককে এখানে স্থান দিয়েছি যাদের মধ্যে উচিতমত শ্রদ্ধা বা দৃষ্টি এখনও খোলেনি এবং কাজও ঠিক হচ্ছে না, তারও ঐ কারণ; আমরা তাদের ছেড়ে দিয়ে রেখেছি যাতে নিজেরাই তারা ভিতর থেকে তা অর্জন ক'রে নিতে পারে, এবং যদি তাদের প্রকৃত ঐকান্তিকতা থাকে তাহলে নিশ্চয় তা হয়ে যাবে।

২৬-১২-১৯৩৬

মা এবং আশ্রমের নিয়মশৃঙ্খলা

ক-এর কাছে শুনলাম, তিনি নাকি বলেছেন যে নিয়মানুবর্তিতার

অভাবই ভারতের মস্ত একটা দোষ, ব্যষ্টি বা সমষ্টি কেউই এখানে নিয়ম মেনে চলে না। তাহলে তাঁকে যখন তাঁর ব্যাগটি অনুচিত স্থানে রাখতে নিষেধ করা হলো তখন তিনি কাঁদলেন কেন? এই আশ্রমে যে নিখুঁত নিয়মশৃঙ্খলা আছে তা আমিও বলি না; বরং বলি যে তার যথেষ্টই অভাব আছে, ঝগড়াঝাঁটি ও আত্মসমর্থন প্রভৃতিও আছে। কিন্তু তার মধ্যেই আছে একটা সুব্যবস্থা যা মা এখানে স্থাপিত করেছেন এবং তাকে বজায় রেখেছেন। সমষ্টিগত প্রতিষ্ঠানের কাজের পক্ষে তা খুবই দরকার। বাইরের থেকে যারা এই আশ্রম দেখতে এসেছে তারা এমন সুব্যবস্থা দেখে বিস্মিত হয়ে যথেষ্ট প্রশংসা করেছে। আর ঐরূপ সুব্যবস্থার কারণেই আশ্রম এই ভাবে টিকে আছে, নতুবা অনেকের হিংসার আক্রমণে এ আশ্রম কবেই ধূলিসাৎ হয়ে যেতো। মা উত্তমরূপেই জানতেন যে তাঁর কাজকে সফল করতে এখানে কি করা দরকার।

নিয়মশৃঙ্খলা কেবল পাশ্চাত্যেরই জিনিস নয়; জাপানে চীনে ও ভারতে এমনই সকল কাজের সম্বন্ধে কড়া নিয়ম ছিল যা ও দেশের মানুষ সইতেই পারত না। সামাজিক দিক দিয়ে তা যতই আপত্তিজনক হোক, তথাপি তারই জোরে হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু সমাজ কত উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে যুগের পর যুগ ধরে এখনও পর্যন্ত নিজেকে রক্ষা করেছে। অপরপক্ষে রাজনীতির ক্ষেত্রে বিশৃঙ্খলা ও ব্যক্তিপ্রাধান্য ও দ্বন্দ্ববিরোধ থাকাতেই ভারত-কে দাসত্ব মেনে নিতে হয়েছে। সেখানে শৃঙ্খলা আনতে চেষ্টা করাতেও তা ব্যর্থ হয়েছে। কিন্তু আধ্যাত্মিক জীবনের ক্ষেত্রে সন্ন্যাসীরা কেবল মুক্ত হয়েই ঘুরে বেড়ায়নি, তারাও গোষ্ঠীবদ্ধ হয়ে নিজেদের শাসক সম্প্রদায় গড়ে তাদের অনুশাসনের মতে চলেছে এবং কড়া নিয়মের মঠগুলির প্রতিষ্ঠা করেছে। শৃঙ্খলা ও নিয়ম ছাড়া কোনো কাজই সফল হতে পারে না—এমন কি ব্যক্তিগত কর্মী এবং শিল্পীকেও কাজ শিখতে কড়া নিয়ম পালন করতে হয়—তাহলে মা যে এমন একটা কঠিন কাজের ভার নিয়ে-ছেন তাকে সার্থক করবার জন্য যদি তিনি নির্দিষ্ট নিয়ম পালনের দিকে লক্ষ্য রাখেন তাহলে তাঁকে নিন্দা করা হবে কেন?

নিয়ম কানুন না থাকলে এমন একটা প্রতিষ্ঠান কেমন ভাবে সুশৃঙ্খলে চলতে পারে? তুমি বলতে চাও যে নিজের ইচ্ছামত নিয়ম মেনে চলবার জন্য সকলকে যথেষ্ট স্বাধীনতা দেওয়া হোক; তা সম্ভব হতো যদি প্রত্যেকের জন্য আলাদা ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ উপলব্ধিরই কাজ এখানে হতো, জীবনের

দিকটা বাদ দিয়ে, কিংবা যদি এমন ধরনের সমষ্টিগত জীবন ও কর্ম-ব্যবস্থা না থাকতো। কিন্তু তা তো নয়, আমরা এমন কাজ নিয়েছি যার মধ্যে জীবন ও জীবনের ক্রিয়া ও বাস্তব জগৎ একত্রে জড়িত। যা আমি করতে চাইছি তার মধ্যে আধ্যাত্মিক উপলব্ধিই হলো প্রথম কথা, কিন্তু তার সঙ্গে জীবনের ও মানুষের ও এই জগতের বাহ্য উপলব্ধি না থাকলে তা সম্পূর্ণ হবে না। ভিতরে থাকবে আধ্যাত্মিক চেতনা কিন্তু বাইরে থাকবে আধ্যাত্মিক জীবন। এখনকার আশ্রম অবশ্য সে আদর্শ পায়নি, কারণ তাহলে এখানকার সকলে সাধারণ অহংবোধ ও রাজসিক প্রাণপ্রকৃতি নিয়ে থাকার পরিবর্তে আধ্যাত্মিক চেতনাতেই থাকতো। তথাপি প্রথম প্রচেষ্টাতে এই আশ্রম যেমন আকার নিয়েছে তারই উপরে এখন প্রস্তুতির কাজ করতে হবে। আর মাকে সেই কাজ চালিয়ে যেতে হবে, সুতরাং নিয়ম বেঁধে দেওয়া এবং তাই মেনে সকলকে চলতে বলা ছাড়া শৃঙ্খলা বজায় রেখে একে চালানো যায় না। এমন কি ঐ অহংভাব এবং রাজসিক প্রাণপ্রকৃতিকে দমিত রাখার জন্যও নিয়মপালন দরকার, তার পক্ষে ওতে সাহায্য হতে পারে। ঐগুলি না থাকলে এত বাহ্য নিয়মের দরকার হতো না; আপনা হতেই একটা সাম্য, ঐক্য ও সঙ্গতি রক্ষিত হতো। কিন্তু যতদিন বর্তমান অবস্থা আছে ততদিন নিয়ম পালন করা বা না করা সকলের স্বাধীন ইচ্ছার উপর ছেড়ে দিলে বিভ্রাট ও বিপর্যয় ঘটবে।

আর তাতে সকল কাজই নষ্ট হতো, কেবল প্রত্যেকে নিজের নিজের মত ও ইচ্ছা অনুযায়ী কাজ করতে গিয়ে সকলের মধ্যে ঝগড়া মারামারি চলত; এখনও তার লক্ষণ আছে, কিন্তু মায়ের কর্তৃত্ব ও ব্যক্তিত্বের জোরে ও তাঁর নৈপুণ্যে বিপরীতধর্মীদেরও একত্রে নিয়ে তিনি এ কাজ চালাচ্ছেন।

মাকে খুব কড়া অনুশাসক বলে আমার মনে হয় না। বরং আমি দেখেছি যে তাঁকে ঘিরে এত সব গাফিলতি, অবাধ্যতা, আত্মসমর্থন ও বিদ্রোহের ভাব থাকা সত্ত্বেও তিনি কতখানি দাক্ষিণ্য ও দয়ালুতার সঙ্গে সমস্ত সহ্য ক'রে নিত্য ক্ষমা করেন, এমন কি তাঁর মুখের উপর বিদ্রোহ প্রকাশ ও বিশ্রী রকমের দোষ দিয়ে কড়া কড়া চিঠি লেখা সত্ত্বেও তিনি তা গায়ে মাখেন না। কড়া লোক হলে তা কখনই তিনি করতেন না।

বাইরের দর্শকরা এখানে এসে কি রুক্ষ ব্যবহার পেয়েছে তা জানি না, কেবল এখানকার নিয়ম মেনে চলতে বলা ছাড়া, যার বিরুদ্ধে তোমার নালিশ; কিন্তু তা সকলের নালিশ নয়, কারণ তাহলে এখানে দর্শকের

সংখ্যা উত্তরোত্তর বাড়ত না, আর এত লোক এখানে এসে আবার আসতে চাইত না, কিংবা মায়ের অনুমতি পেলে অনেকেই এখানে থাকতে আগ্রহ করত না। অবশ্য এখানে কেউ কোনো সামাজিক উপলক্ষে আসে না, যাদের তারা আধ্যাত্মিক হিসাবে বড়ো বলে মনে করে তাদের দর্শন পেতে আসে, আর যারা নিত্যকার অতিথি তারা এই আশ্রম জীবনে অংশগ্রহণ করতে ও আধ্যাত্মিক সুযোগ লাভ করতে আসে, এবং তারা নিশ্চয় স্বেচ্ছায় এখানকার নিয়মগুলি পালন করে, একটু আধটু অসুবিধা থাকলেও।

আর গোলকণ্ডা সম্পর্কে—ওখানকার যা নিয়ম সর্বত্র তা নয়—সেই সকল নিয়ম অনর্থক করা হয়নি, তার বিশেষ কারণ আছে। ঐ গোলকণ্ডাতে মা নিজের পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন, রেমণ্ড ও স্যামার ও অন্যেদের সহায়তায়। প্রথম কথা, সৌন্দর্য রক্ষাকে মা দিব্য ও আধ্যাত্মিক জীবনের অঙ্গস্বরূপ বলে মনে করেন; দ্বিতীয়ত, তিনি মনে করেন যে জড় বস্তুগুলির মধ্যেও জীবন্ত বস্তুর মতো দিব্যচেতনা রয়েছে; তৃতীয়ত, সেগুলির মধ্যেও আপন আপন কিছু ব্যক্তিত্ব আছে, সুতরাং সযত্নে সমুচিতভাবে তাদের ব্যবহার করা উচিত, এমন অবহেলায় অযত্নে অগ্রাহ্যভাবে ব্যবহার করা উচিত নয় যাতে তার সৌন্দর্য চলে গিয়ে শীঘ্রই তা নষ্ট হয়ে যায়। জিনিসের ভিতর চেতনা রয়েছে এই বোধ নিয়ে তিনি এমন সহানুভূতি ও যত্নের সঙ্গে সকল জিনিসপত্র ব্যবহার করেন যে সেগুলি বহু বছর পর্যন্ত অম্লান ভাবে টিকে থাকে, যা অন্যের হাতে পড়লে শীঘ্রই নষ্ট হয়ে যেতো। এই সূত্র অনুসারেই মা গোলকণ্ডের বাড়িখানির পরিকল্পনা করেছিলেন। ওর মধ্যে উচ্চ ধরনের ভাস্কর্যের দ্বারা একটি সুন্দর রূপ ফুটে উঠবে এই চেয়েছিলেন এবং তাতে কৃতকার্যও হয়েছেন—দেশবিদেশের ভাস্কর ও বোদ্ধারা এটি দেখে একে অসাধারণ গৃহরচনা বলেছেন; একজন বলেছিলেন যে এমন অপূর্ব গঠনের অট্টালিকা তিনি ইউরোপ বা আমেরিকার কোনোখানে দেখেননি; একজন ফরাসী ভাস্কর বললেন যে তাঁর বিশ্ববিখ্যাত গুরু তাঁর যে আদর্শকে রূপ দিতে চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তা পারেননি সেটাই এখানে সফল হয়ে সার্থক রূপ নিয়েছে। কিন্তু শুধু বাড়িটি নয়, মা চেয়েছিলেন যে এখানকার সব কিছু জিনিস, ঘরদোর, জানলাদরজা, আসবাবপত্র, সমস্তই এর সঙ্গে সঙ্গতি রেখে প্রত্যেকটি ঐরকমই সুন্দর ও কলাসম্মত হবে। তাও ওখানে যত্নের সঙ্গে করা হয়েছে। আর প্রত্যেকটি জিনিস তার প্রয়োজনমত যথাস্থানে রক্ষিত আছে, যাতে

এলোমেলো হয়ে মিশে না যায় কিংবা অযথা ভাবে ব্যবহৃত না হয়। আর সেই ব্যবস্থার যেন কোনো ব্যতিক্রম না হয় তার দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়; কারণ যারা ওখানে এসে বাস করে তারা না জেনে অল্প সময়ের মধ্যেই অনুচিত ব্যবহারের দ্বারা একটা বিশৃঙ্খলা এনে এর সকল সৌন্দর্যকেই ভেঙেচুরে নষ্ট করতে পারে। নিয়মগুলি ক'রে রাখা হয়েছে এই কারণে, আর কিছু নয়। মা এই আশা করেছিলেন যে নির্ভরযোগ্য লোকেরা যদি ওখানে থাকে বা যারা থাকবে তাদের শিখিয়ে নেওয়া হয় যাতে তারা সাধারণ রীতিতে এখানে জিনিসপত্রের অযত্ন না করে, তাহলে তাঁর এত উদ্যম ও অর্থব্যয় ব্যর্থ না হয়ে সার্থক হতে পারবে।

দুঃখের বিষয় লোকদের থাকবার জায়গার অভাব হওয়াতে কোনো বাছাই না করেই অনেককে গোলকণ্ডে থাকতে দিতে হলো। তার ফলে অপব্যবহার ও ভাঙাচোরা নিবারণ করা গেল না, প্রত্যেক দর্শনের পরেই সেই সব ক্ষতি পূরণ করতে মাকে দুই তিন শত টাকা খরচ করতে হলো। ক-কে ঐ কারণে বাড়িটির সমস্ত ভার দেওয়া হয়েছে যাতে সকল জিনিস ঠিকভাবে যত্নে রক্ষিত থাকে। এই কারণেই সে ঐ ব্যাগ রাখার ব্যাপারে আপত্তি করেছিল--ঐ ডাক্তারটি টেবিলের উপর তাচ্ছিল্য ভাবে ব্যাগটি রাখতে গিয়ে টেবিলে আঁচড়ের দাগ ক'রে দিলেন--তাই সে তাঁর ব্যাগ ও কামাবার জিনিসগুলি সেখান থেকে উঠিয়ে যথাস্থানে রেখেছিল। আমি যদি ঐ ডাক্তারের স্থানে থাকতাম, তাহলে আমি এর জন্য ওর প্রতি কৃতজ্ঞই হতাম ওর দায়িত্ববোধ দেখে, তাঁর পক্ষে এই সামান্য কারণে উত্তেজিত হওয়ার পরিবর্তে। যাই হোক মোটের উপর এই হলো ওখানকার নিয়মগুলির কারণ, একে নিরর্থক অনুশাসন বলে আমি মনে করি না।

শেষ কথা আর্থিক ব্যবস্থা সম্পর্কে। এই আশ্রমটিকে প্রতিপালন করা মায়ের ও আমার পক্ষে খুবই দুঃসাধ্য ও কঠিন হয়ে উঠেছিল, এখানকার বাসিন্দার সংখ্যা উত্তরোত্তর বেড়ে যেতে থাকায় কখনো কখনো আমরা খরচ কুলিয়ে উঠতে পারিনি; বিশেষত এই যুদ্ধের সময় খরচ এত বেশি বেড়ে গেছে যে আমাদের কি মুশকিলে পড়তে হয়েছে তা কেবল তারাই জানবে যারা এমন ধরনের কাজের দায়িত্ব নিয়ে ভুক্তভোগী। কোনো বাঁধা আয় যেখানে নেই সেখানে এ কাজ চালিয়ে যাওয়া সম্ভবই হতো না যদি ভগবৎ শক্তি এখানে কাজ না করতো। দাতব্য আমাদের কাজের অন্তর্ভুক্ত নয়, তার জন্য আলাদা অনেক লোক আছে। আমরা যে কাজ

হাতে নিয়েছি তাতেই যথেষ্ট খরচ করতে হয়, তার বিনিময়ে যা পাই সে তুলনায় কিছুই নয়। অথচ অর্থোপার্জনের যা সাধারণ পন্থা তা আমরা নিতে পারি না। যেটুকু আমাদের পক্ষে সম্ভব তাই করতে পারি। আধ্যাত্মিক ব্যক্তিদের পক্ষে এমন কোনো নিয়ম নেই যে তারা কেবল দাতব্যের কাজ করবে কিংবা যে কেউ অতিথি আসবে তাদের ঘরে স্থান দিয়ে খাওয়াবে। এটা আমাদের আশ্রমের কাজের অন্তর্গত বলে তাই আমরা ক'রে থাকি। মা যাদের এখানে রাখেন তাদের থাকা ও খাওয়ার জন্য কিছু অর্থ গ্রহণ করেন, কারণ খরচের জন্য অর্থ চাই আর তা আকাশ থেকে আমদানি হয় না ; তবে যতটা খরচ হয় তার থেকে কমই তিনি নেন। তবে তিনি যে কাউকে এর অযথা সুযোগ নিতে দিতে চাইবেন না আর মিথ্যা অজুহাতে অন্য লোকে যাতে ডাইনিংরুমে এসে না খেতে শুরু করে সেদিকে লক্ষ্য রাখবেন, এটা খুবই স্বাভাবিক ; প্রথমে হয়তো দুই একজনই আসবে কিন্তু এতে প্রশ্রয় দিলে তার সংখ্যা ক্রমশই বেড়ে যাবে। আর মায়ের অনুমতি না নিয়ে সকলকে দর্শনে আসতে না দেওয়া সম্পর্কে এই বলতে চাই যে ওতে তাহলে আমি এমন একটা কৌতূহলের জিনিস হয়ে দাঁড়াব যে নানা জনে ভিড় ক'রে এসে নানা মন্তব্য করতে থাকবে, শেষে বাধ্য হয়ে আমিই বলব "থামাও"।

আমাদের তরফের বক্তব্য বুঝিয়ে বলার জন্য অনেক কিছু লিখতে হলো। এসব যুক্তি মানো কিংবা নাই মানো, কিন্তু আমাদের তরফ থেকে এর বাস্তবতা রয়েছে। আর যা কিছু লিখেছি তা বাইরের দিক দিয়ে, কিন্তু আমরা যা কাজ করি তা ভিতরকার যোগ চেতনা থেকে, এবং সে সম্বন্ধে বুঝিয়ে বলা আরো কঠিন। এ কেবল বাহ্য মনস্তুষ্টির জন্য আর তাতে তর্কেরও অবকাশ আছে।

২৫-২-১৯৪৫

×

একথা খাঁটী সত্য যে জড়বস্তুর মধ্যেও এমন চেতনা থাকে যে যত্ন পেলে তাতে সাড়া দেয় আর অযত্ন বা তাচ্ছিল্যের ব্যবহারে বিরূপ হয়ে ওঠে। এ কথা অনুভব করতে শিখে জিনিসের সম্বন্ধে যত্নবান হওয়া চেতনার উন্নতির লক্ষণ মা বরাবরই সব জিনিসের সম্বন্ধে এমনি সযত্ন

আচরণ করেন, তাই সব কিছুই তাঁর কাছে অনেককাল টেঁকে এবং তার কাছ থেকে পূর্ণ উপকারিতা মেলে।

২০-৭-১৯৩৩

×

যারা দিতে "অসমর্থ" তাদের আশ্রমে এসে এমনিতে থাকতে দিতে মায়ের কখনই আপত্তি ছিল না; যারা দিতে পারে তাদের কাছ থেকেই তিনি অর্থ নেন। কিন্তু একবার যখন ধনী অতিথিরা এখানে এসে বিস্তর খরচপত্র ক'রে বাজারে অনেক কিছু কেনাকাটা করলে কিন্তু শেষকালে আশ্রমে কিছু অর্থ না দিয়ে বা মাকে সামান্য কিছু প্রণামী পর্যন্ত না দিয়ে চলে গেল, তখন তাতেই মা এরূপ আচরণের বিরুদ্ধে কঠিন মন্তব্য করে-ছিলেন—এই হলো ব্যাপার।

২১-১০-১৯৪৩

বিভাগীয় কর্তৃত্বের প্রয়োজন

প্রত্যেক কর্মী যাতে বাহ্য ও আভ্যন্তরীণ ভাবে তাদের কাজগুলি মাকে সরাসরি নিবেদন করতে পারে তার জন্য প্রত্যেক জনকে সরাসরি কাজ দেওয়া এবং নিজে প্রত্যেকের কাজের খবর করা মায়ের পক্ষে কার্যতঃ সম্ভব হয় না। সেইজন্য প্রত্যেক বিভাগে একজন ক'রে অধ্যক্ষ আছে যে সকল দরকারী বিষয়ে মায়ের কাছে এসে পরামর্শ নেবে এবং কাজের রিপোর্ট দেবে, কিন্তু সামান্য সামান্য বিষয়েও আগের থেকে মাকে জানানো তার পক্ষেও সম্ভব নয়। ক-কে স্থাপত্য বিভাগের অধ্যক্ষ করা হয়েছে কারণ সে একজন ইঞ্জিনিয়ার। বাহ্য কাজের সুব্যবস্থার জন্য এটা সর্বত্রই অপরিহার্য, কাজের সুবিধার জন্য এ ব্যবস্থা রাখতেই হবে। কিন্তু তার থেকে এই কথা বোঝায় না যে ক বা অন্যান্য বিভাগীয় অধ্যক্ষেরা উঁচু-স্তরের ব্যক্তি বা সে তার অহংকে ইচ্ছামত প্রশ্রয় দিতে পারে। প্রত্যেককেই যথাসম্ভব আপন অহং পরিত্যাগ করতে হবে, আর যেমন অবস্থাতে যে

কাজই করা হোক তা মাকেই নিবেদন করা হচ্ছে বলে জ্ঞান করতে হবে।

২০-৮-১৯৩৬

×

আশ্রমের প্রত্যেক বিভাগের প্রত্যেকটি কাজ স্বয়ং খুঁটিয়ে পরিদর্শন করা মায়ের পক্ষে একেবারে অসম্ভব। এমনিতেই মায়ের সময়ের মধ্যে একটুও ফাঁক নেই। তুমি অবশ্য যা চাইছ তা হতে পারবে...কিন্তু বিভাগীয় অধ্যক্ষ যার উপর ভার দেওয়া আছে তার সঙ্গে একটা বন্দোবস্ত ক'রে নেবে।

২০-৭-১৯৩৩

×

বিভাগীয় অধ্যক্ষদের মা নিজেই নির্বাচিত করেছেন সমগ্র ভাবে তাঁর কাজের একটা সুব্যবস্থার জন্য; কোন লাইন ধরে কেমন ভাবে কোন কাজ করতে হবে তারও বিশদ বন্দোবস্ত ক'রে সেই ভাবে অধ্যক্ষদের তিনি শিখিয়েও দিয়েছেন, এবং তারা সেই লাইনে কাজ করছে দেখে তখন তিনি নিজে তার থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, কিন্তু বরাবর সেদিকে নজর রেখেছেন। অধ্যক্ষেরা তাঁরই নির্দেশমত চলে এবং সমস্ত কাজের রিপোর্ট মাকে এসে জানায় এবং দরকার হলে মা তার অদলবদল ক'রে দেন। তাদের কাজ যে নিখুঁত এমন নয় কারণ তারা নিজেরাই এখনও পূর্ণতাপ্রাপ্ত হয়নি, আর কর্মীদের ও সাধকদের অহংএর ক্রিয়ার ফলে তারা অনেকরকম বাধাও পায়। কিন্তু সাধক ও কর্মীরা যতদিন পর্যন্ত এটা উপলব্ধি না করছে যে এখানে তারা নিজেদের অহংএর মতলবে ও নিজেদের দেহপ্রাণের দাবী মেনে চলতে আসেনি, এসেছে উচ্চতর একটা যোগ করার প্রয়োজনে যার প্রথম কথাই হলো কামনার বিলোপ ও দৈবী সত্য এবং দৈবী ইচ্ছাকে অনুসরণ করা——ততদিন পর্যন্ত কোনো কিছুই নির্দোষ হতে পারবে না।

৯-১-১৯৩৬

বশ্যতা ও সহযোগিতা শিক্ষার প্রয়োজন

মা যেটা সাব্যস্ত করেন তার নিজস্ব কারণ তাঁর থাকে; তিনি সকল বিভাগ বা তার শাখাকে আলাদা আলাদা ভাবে না দেখে সমস্ত কাজটাকে সমগ্র ভাবে দেখেন, এবং তাতে তাঁর কাজের পরিচালনার সুবিধা হয়। এখানে যে বিভাগে যেমন কাজই হোক, প্রত্যেকের পক্ষে শেখা দরকার বশ্যতা ও আনুগত্য, অর্থাৎ কাজের সম্বন্ধে নিজের ধারণা ও পছন্দকে বর্জন ক'রে মা যেমন যেমন নির্দেশ দিচ্ছেন সেই অনুযায়ী যথাসম্ভব ভালো ভাবে কাজ ক'রে যাওয়া। আশ্রমের মধ্যে এটাই একটা প্রধান দোষ যে প্রত্যেক কর্মী চায় আপন মতে ও আপন ধারাতে কাজ করতে যেমন সে সুবিধা-জনক মনে করে, আর আশা করে যে তার রীতিটাই অনুমোদিত হবে। এই কারণেই সকল কাজে কর্মীদের মধ্যে খটাখটি বাধে, অধ্যক্ষের সঙ্গে কর্মীদের মিল হয় না, মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে সাধকদের মতবিরোধ হয়। এখানে সঙ্গতিরক্ষা তবেই সম্ভব হতে পারে যদি সকলে নিজেদের ব্যক্তিগত দ্বেষ ও প্রতিক্রিয়া ঘুচিয়ে মায়ের ইচ্ছাকেই মেনে নেয়।

এ আশ্রমে স্বাধীন কাজ বলে কিছু নেই। এখানে অধ্যক্ষ বা কর্মীরা কেউই স্বাধীনক্রিয় নয়, সব কিছুই সুনিয়ন্ত্রিত ও পরস্পর সংযুক্ত। এমন ধরনের সমষ্টিগত কাজের পক্ষে বশ্যতা ও সহযোগিতা থাকা বিশেষ দরকার, নচেৎ সবই অগোছালো হয়ে যাবে।

১০-৩-১৯৩৬

×

তোমাদের ব্যক্তিগত দিকগুলোর বিবেচনা অনুযায়ী কাজের ব্যবস্থা ক'রে দেওয়া মায়ের পক্ষে সম্ভব নয়, কারণ তাতে সকল কাজই অসম্ভব হয়ে দাঁড়াবে।

২৫-৭-১৯৩৪

সঠিক মনোভাব নিয়ে কাজ করতে হলে

যদি ক তার মনের অশান্তি ও অস্থিরতা ঘুচিয়ে নিশ্চিত স্বস্তির সঙ্গে কাজ করতে চায় তাহলে কতকগুলি কথা বিশেষভাবে মনে রেখে তাকে সেই অনুযায়ী চলতে হবে। তাকে পরিষ্কার ক'রে বুঝিয়ে দেবে যা আমি এখানে লিখছি—

(১) এখানে সে আছে খ-এর ভাগ্নে বলে নয়, কিন্তু মায়ের একটি সন্তান বলে।

(২) এখানে খ তার অভিভাবক বা রক্ষক নয়, সে আছে মায়ের আশ্রয়ে এবং তাঁরই তত্ত্বাবধানে, সুতরাং কেবল তাঁরই প্রতি তার যা কিছু বাধ্যতা থাকবে।

(৩) তাকে ভাণ্ডারের যে কাজ দেওয়া হয়েছে তা মায়েরই কাজ, খ-এর নয়; এই কথাটি স্মরণ রেখেই তাকে কাজ করতে হবে।

(৪) খ-কে করা হয়েছে ভাণ্ডারের, বাগানের, শস্য বিভাগের অধ্যক্ষ, সে মায়ের নির্দেশ নিয়ে কাজ করে এবং মায়ের অনুমোদনের জন্য তাঁর কাছে সকল ব্যবস্থা সম্পর্কে রিপোর্ট করে—যেমন গ আছে স্থাপত্য বিভাগে, ঘ আছে ডাইনিং রুমে, ঙ বা চ আছে অন্যান্য বিভাগে। ঐ সকল বিভাগে আর যারা আছে তারা অধ্যক্ষের কাছে নির্দেশ নিয়ে কাজ করে। এ ব্যবস্থা রয়েছে কাজের সুশৃঙ্খলার জন্য, তার মানে এই নয় যে ও কাজটি খ-এর নিজস্ব, বা স্থাপত্যের কাজ গ-এর নিজস্ব বা ডাইনিং রুমের কাজ ঘ-এর নিজস্ব—সমস্তই মায়ের কাজ এবং প্রত্যেক অধ্যক্ষ ও প্রত্যেক কর্মী কেবল মায়েরই কাজ করছে। প্রত্যেকে যদি স্বাধীনভাবে কাজ ক'রে সরাসরি মায়েরই অধীনে চলতে চায় তাহলে কোনো কাজটাই করা যায় না, অথচ এখানে সেইরকম মনোভাব নিয়েই যত কিছু গণ্ডগোল ও বিশৃঙ্খলা। সমস্ত কাজই নিজের চোখে দেখে প্রত্যেক কর্মীকে নিজে নির্দেশ দেওয়া মায়ের পক্ষে সাধ্য হয় না, তার এরূপ ব্যবস্থা করা অপরিহার্য। অপরপক্ষে প্রত্যেক অধ্যক্ষও চলবে মায়ের নির্দেশে—কিংবা সেই মনোভাব নিয়ে, নিজের মতে নয়। সে যদি আপন খেয়ালে বা আপন পছন্দমত কাজ করে বা আপন সুবিধা অনুযায়ী যে ক্ষমতা পেয়েছে তার অপব্যবহার করে, তাহলে কাজ খারাপ হলে বা দ্বন্দ্ববিরোধ বাধলে বা অসত্য আবহাওয়ার সৃষ্টি হলে তার জন্য সেই দায়ী হবে।

(৫) ব্যক্তিগত ভাবে খ বা অন্য কারো জন্য যে কাজ সে করবে (আশ্রমের নয়) তা মায়ের কাজ হবে না, মায়ের সম্পর্কও তাতে থাকবে না। ক ইচ্ছা করলে তেমন কাজ করতেও পারে না-করতেও পারে।

(৬) একটা কাজ মা সরাসরি দিয়েছেন ক-কে--রান্নাঘরে বাসন ধোয়ার কাজ। ঐ কাজ তাকে নিখুঁত ভাবে সুসম্পন্ন করতে হবে মায়ের নির্দেশমত; এই সুযোগ তাকে দেওয়া হয়েছে কতটা সাফল্যের সঙ্গে সে কাজটি করতে পারে তা দেখবার জন্য, তার পরে আর যা কিছু হবে।

(৭) ছ এবং খ এর কাছ থেকে কোনো খাদ্যবস্তু বা উপহার নিতে সে বাধ্য নয়; সে যদি তা পছন্দ না করে তাহলে সে নেয় কেন? অনায়াসে সেগুলি প্রত্যাখ্যান করতে পারে। তার এখানে থাকা খাওয়া প্রভৃতি খ-এর উপর নির্ভর করে না, সে আছে কেবল মায়ের কাছে, সুতরাং তার ভয় করবার কিছু নেই।

(৮) শেষ কথা, অস্থিরতা ও কামনাদি থেকে তার প্রাণসত্তাকে মুক্ত করতে হবে--তার পক্ষে এবং সকলেরই পক্ষে ঐগুলিই হলো মনমরা হবার সর্বপ্রধান কারণ,--সে যদি এখানে না থেকে অন্য কোথাও থাকতো তথাপি তা যেতো না কারণ ঐগুলি তার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। কিন্তু এখানে থেকে সে যদি মায়ের দিকে পুরোপুরি ফিরে নিজেকে উন্মীলিত রাখে এবং তাঁরই দিকে দৃষ্টি রেখে সব কিছু কাজ করতে থাকে, তাহলে সে ঐসব থেকে মুক্তি পাবে ও আরাম পাবে এবং আলো ও শান্তির মধ্যে উন্নত হয়ে সমগ্র সত্তায় ভগবৎ সন্তান রূপে সার্থক হবে।

১৯-৩-১৯৩২

আশ্রমের কাজ ও মায়ের কাজ

মায়ের কাজ না হলে এসব কার কাজ? যা কিছু তুমি করো তা মায়ের কাজ ভেবেই করবে। আশ্রমে যা কিছু কাজ হয় সবই মায়ের কাজ।

ঐ সব কর্ম, ধ্যান করা, মায়ের "কথাবার্তা" পড়া, ইংরেজী শেখা প্রভৃতি সবই ভালো জিনিস। সব কিছুই বা যে কোনোটি তুমি মাকে উৎসর্গ ক'রে করতে পারো। ধ্যান করা মানে মায়ের দিকে নিজেকে খুলে

রেখে আস্পৃহার সঙ্গে একাগ্র হয়ে মায়ের শক্তিকে আহ্বান করা, যেন তা তোমার মধ্যে এসে কাজ করে ও তোমাকে রূপান্তরিত ক'রে দেয়।

১৮-৯-১৯৩২

মায়ের অনুমতি দেবার কারণ

ঠিক কথা, মা যে ঐ খাদ্যটি চান তা নয়, কেবল ক তাঁকে তা নিবেদন করে বলেই তিনি অনুমতি দেন। কাজের বেলাতেও সেই কথা, যদিও কাজের অন্য প্রয়োজনীয়তা আছে। খ এবং গ-কে যে দৈহিক ভাবে বাহ্য কাজ কিছু দেওয়া হয়নি তা ওদের তেমন শক্তি নেই বলে কিংবা পারবে না বলে নয়——এবং কোনো হাতের কাজ করতে শেখা সকলের পক্ষে ভালো নয় বলেও নয়। সকল দিক দিয়ে সবরকম কাজ করতে পারাই হলো কর্মীর আদর্শ, কিন্তু এখনও তা সম্ভব করা যায়নি।

২৬-৯-১৯৩৩

কর্তব্য কর্ম ও মায়ের অনুমোদিত কর্ম

> প্র ঃ মা যেসব কাজ অনুমোদন করেন তা সবই কি "কর্তব্য কর্মের" অন্তর্গত ?

উ ঃ কোনো সাধকের যদি কোনো একটা কাজে বিশেষ আগ্রহ দেখেন তখন মা তাকে বলতে পারেন, "আচ্ছা" কিংবা "তাই করোগে"। সেখানে তা "কর্তব্য কর্মের" অন্তর্গত হলো না, কেবল সেটা করতে তাকে অনুমতি দেওয়া হলো মাত্র। আর কেউ যদি এমন কাজ করতে চায় যা আপত্তি-জনক কিছু নয়, আর মা তাতে সায় দেন, সেটা তাতেই "কর্তব্য কর্মে"র পর্যায়ে উঠে যায় না।

৩১-৭-১৯৩৭

×

প্রঃ এতদিন আমি ভাবতাম যে মা যে কাজ অনুমোদন করেন তা সবই মায়ের কাজ সুতরাং তা আমাদের পক্ষে "কর্তব্য কর্ম"। তা নয় কি? কেউ যদি সংসারের ও সমাজের ও দেশের জন্য সব কর্তব্য ছেড়ে কেবল ভগবানের বা মায়ের উদ্দেশেই তার কর্মকে নিবেদন করে, সেটা কি তার "কর্তব্য কর্ম" হয়ে দাঁড়ায় না? বাইরের কথা স্বতন্ত্র, কিন্তু এখানে মায়ের কাছে তাঁর সামনে থেকে যা কিছু করব তা কি তাই হবে না? তাহলে "কর্তব্য কর্ম" কাকে বলব?

উঃ আমার কাছে জানতে চাওয়া হয়েছিল যে মা যে-কোনো কাজেই অনুমতি দিন তাই "কর্তব্য কর্ম" হয় কিনা। লোকে কত কি কারণে কত রকম কাজের জন্য মায়ের অনুমতি চায়——আর তাতে মা অনুমতি দিলেই যে তা মায়ের ইচ্ছানুযায়ী কাজ হবে এমন কথা নয়। মা নিজের থেকে যে কাজ দেন সেটা মায়ের কাজ——আর যে কাজ মাকে ঐকান্তিক ভাবে নিবেদন করা হয় তাও মায়ের কাজ, তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু "কর্ম" বলতে অনেক রকম ক্রিয়াকেই বোঝায়, কেবল হাতের কাজ নয়।

৩১-৭-১৯৩৭

মায়ের অনুমোদন ও সাফল্যের সম্ভাবনা

অনুমোদন না অনুমতি! অনেকের মধ্যে কারো কারো মাথায় হয়তো ঢুকলো যে তারা সঙ্গীতের চর্চা করবে, তাদের খুব ইচ্ছা দেখে মা হয়তো বললেন, "আচ্ছা চেষ্টা ক'রে দেখ"। তাতেই বোঝায় না যে তারা সঙ্গীতজ্ঞ হবে বলেই ঠিক করা ছিল——অথবা কবি অথবা চিত্রকর, যে যেমন চায়। চেষ্টা করতে করতে একজন কেউ হয়তো ফুটে উঠতে পারে, বাকী সকলেই ছেড়ে দেয়। ক প্রথমে খেয়ালমত ছবি আঁকতে শুরু করলে, কিছুকাল পরে সে খুব ভালোই আঁকতে লাগল। খ প্রথমে খুচরো জিনিস আঁকতে আঁকতে পরে গভীর বিষয়ে হাত লাগিয়ে রীতিমত চিত্রশিল্পী হয়ে দাঁড়াল। কিন্তু সকলের বেলা তা নয়। তবে চেষ্টা করতে দোষ নেই——কিছু শিক্ষা তো

হবে।

মে ১৯৩৫

কাজের ভুল সম্বন্ধে মায়ের মনোভাব

প্রঃ কাল মা যে কথা বললেন তাতে মনে হয় যে তাঁর মতে কাজের ভুলের দিকে বেশি নজর দেবার দরকার নেই, অন্যের ভুল শোধরাতে যাবারও দরকার নেই। আর এই বস্তুজগৎ যখন বহু জগতের মধ্যে সামান্য একটি অংশস্বরূপ অভিব্যক্তি মাত্র, তখন এখানকার বাস্তব কাজের যত কিছু খুঁটিনাটির দিকে বেশি গুরুত্ব দেবার কি দরকার?

উঃ মা বলেছেন এই কথা যে কাজের ভুল সম্বন্ধে তিনি সমস্তই জানেন, কিন্তু তিনি তাঁর আভ্যন্তর দৃষ্টিভঙ্গীতে দেখেন যে তার ভিতর দিয়ে বিশেষ কোনো শক্তির ক্রিয়া কিভাবে সফল হচ্ছে; কাজগুলোকে তিনি বাহ্য বিচারে দেখেন না, তাই তিনি কাজের ভুলভ্রান্তিতে বিশেষ আপত্তি প্রকাশ করেন না। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সাধক-কর্মীরা কোনো কাজের ভার নিয়ে তাতে যেন কোনো ভুলভ্রান্তি না হয় সেদিকে যত্ন নেবে না। অন্য কোনো সাধক যদি ভুল কিছু করে সেটা তারই দায়িত্ব, তার দৃষ্টান্ত দেখে তুমি নিজে সাবধান হতে পারো, কিন্তু একজন সাধক অন্য সাধকের ভুল সংশোধন করতে যাবে না যদি সেটা তার কাজের মধ্যে না হয়—প্রত্যেকে নিজের দোষত্রুটি নিজে শুধরে নেবে।

আমরা বাস্তব জগতেরই বাসিন্দা, অন্য কোনো জগতের নয়, কেবল ভিতরে ভিতরে একটা সংযোগ থাকা ছাড়া। আমাদের জীবন ও কর্ম সমস্তই এখানে, সুতরাং এখানকার কোনো কিছুকে আমাদের তাচ্ছিল্য করা চলে না, যদিও অবশ্য কোনো কিছুর প্রতি আমাদের আসক্তি ও কামনা থাকবে না। অন্যান্য জগতের বা স্তরের প্রকৃতি ও শক্তি সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করা দরকার এইজন্য যে তাদের সঙ্গে এখানকার যোগ রয়েছে, আর সেই জ্ঞানের দ্বারা এখানকার কাজের সাহায্য ও উন্নতি হতে পারে।

কিন্তু তথাপি আমাদের কর্মক্ষেত্র এইখানে, অন্য কোথাও নয়।

২১-৮-১৯৩৬

বাহ্য ব্যবস্থা ও আভ্যন্তর সঙ্গতি

ভুল কাজ হয়ে থাকে লোকে তাদের অহংকে ও ব্যক্তিগত পছন্দ অপছন্দকে, তাদের মর্যাদা বোধকে ও সুযোগ সুবিধাকে, তাদের গর্ব ও আপন সম্পত্তিবোধ প্রভৃতিকে কাজের মধ্যে টেনে আনে বলে। সমুচিত মনোভাব হবে কাজটা মায়ের কাজ বলে জ্ঞান করা,--নিজের কাজ এবং অন্যেরও, সুতরাং এমন ভাবে কাজ কবা চাই যাতে পরস্পবের মধ্যে সঙ্গতি থাকে। কেবল বাহ্য ব্যবস্থাতে সঙ্গতি আসে না, যদিও বাহ্য ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর নিখুঁত হওয়া, তাও চাই; কিন্তু আভ্যন্তরীণ সঙ্গতিটাই নিশ্চয় থাকা চাই নতুবা বিরোধ ও বিশৃঙ্খলা ঘটবেই।

×

প্র ঃ আপনি বলেছেন, "বাহ্য ব্যবস্থাতেই সঙ্গতি আসে না...আভ্যন্তবীণ সঙ্গতি চাই।" এই আভ্যন্তরীণ সঙ্গতির মানে কি হবে?

উ ঃ মায়ের মধ্যে সকলের মিলন।

২১-৪-১৯৩৩

×

মায়ের বিজয়লাভ মানে প্রত্যেক সাধকের নিজের মধ্যে নিজের বিজয়-লাভ। সেটি হলে তখনই সকল বাহ্য ক্রিয়ার মধ্যে একটা সঙ্গতিপূর্ণ পরিপূর্ণতা আসবে।

১২-১১-১৯৩৭

সব চেয়ে যা দরকারী

এই সাধনার পক্ষে সব চেয়ে বেশি দরকার হলো স্থিরতা ও শান্তি, বিশেষত প্রাণসত্তার মধ্যে——যে শান্তি কোনো ঘটনা বা পরিস্থিতির উপর নির্ভর করে না, কিন্তু নির্ভব করে সেই উচ্চ চেতনার সঙ্গে সংস্পর্শের উপর, যে চেতনা ভগবানের, যে চেতনা মায়ের। যাদের তা নেই বা তার জন্য কোনো আস্পৃহা নেই তারা এখানে এসে এই আশ্রমে দশ বিশ বছর কাটালেও কেমন অস্থিরচিত্ত ও দ্বন্দ্ব সংঘাত নিয়ে ছিল তেমনিই থাকবে,—— আর যারা নিজেদের মন প্রাণকে মায়ের শক্তি ও শান্তির দিকে উন্মুক্ত রাখবে তারা সব চেয়ে কঠোর ও অপ্রিয় কাজ নিয়ে অকাম্য ঘটনার মধ্যে থেকেও শান্তিতে অবস্থান করবে।

অক্‌টোবর ১৯৩৩

সাধারণ হৃদ্যতা ও নবচেতনাতে মিলন

আশ্রমবাসীদের পরস্পরের মধ্যে সাধারণ হৃদ্যতা স্থাপনের দিকে মা কোনো বিশেষ জোর দেননি (যদিও ভদ্রতা রক্ষা, বিনয়, সৌজন্য প্রভৃতি থাকবেই) কারণ আমাদের মূল লক্ষ্য সেদিক দিয়ে নয়; একটা নতুন চেতনাতে সকলে মিলবে সেইদিকেই লক্ষ্য, এবং তার জন্য প্রথমেই দরকার যাতে প্রত্যেক সাধক আপন আপন সাধনার দ্বারা সেই নবচেতনাকে লাভ ক'রে তারই মধ্যে সকলের মিলন উপলব্ধি করে।

৩১-১০-১৯৩৫

সম্পূর্ণ নির্জনবাস মায়ের অনভিপ্রেত

সম্পূর্ণ নির্জনে থাকা মা অনুমোদন করেন না। ওতে প্রকৃত সংযম আসে না, কেবল তার মিথ্যা একটা অবস্থা আসে, কারণ অবাঞ্ছিত কারণ-গুলো সাময়িকভাবে তখন চলে যায়। বাহ্য বস্তুর সংস্পর্শে থেকেও যে সংযম প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তাই কেবল খাঁটী জিনিস। সেটাকেই দৃঢ়

সংকল্প ও অভ্যাসের দ্বারা তোমাকে ভিতর থেকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। বেশিরকমের মেলামেশা ও বাক্যালাপ বর্জন করবে, কিন্তু একেবারে নিঃসঙ্গ নির্জনে থাকা ঠিক নয়। অন্ততঃ আজ পর্যন্ত তার দ্বারা তেমন আকাঙ্ক্ষিত ফললাভ হয়নি।

২৭-১১-১৯৩৬

মায়ের জন্য প্রাণশক্তিকে জয় করা

এই যোগের উদ্দেশ্য প্রাণশক্তিকে বর্জন কবা নয়, কিন্তু তার আভ্যন্তরীণ রূপান্তর ঘটিয়ে জীবনে সেই শক্তিগুলির পরিবর্তিত ভাবে সদ্ব্যবহার করা। এখন সেগুলিকে ব্যবহার করা হচ্ছে একটা অহংভাব থেকে অদিব্য উদ্দেশ্যে; কিন্তু অতঃপর তাকে প্রয়োগ করতে হবে ভগবানে সমর্পণের ভাব নিয়ে এবং দিব্য কর্মের উদ্দেশ্যে। এরই মানে মায়ের জন্য নিজের প্রাণশক্তিকে জয় করা।

বাণিজ্যিক ও আধ্যাত্মিক লাভ

মাকে টাকাকড়ি যদি দাও তাতে বাণিজ্যিক কিছু হয় না, কারণ তাতে তোমার ব্যক্তিগত লাভ কিছু নেই, যা মেলে তা কেবল আধ্যাত্মিক লাভ।

২-৪-১৯৪৪

মা ও সুন্দর পোষাক

প্রঃ মা কেন এমন দামী দামী সুন্দর পোষাক পরেন?

উঃ তোমার কি এই ধারণা যে ভগবতী দেখা দেবেন দরিদ্র ও কুৎসিত রূপে?

ভগবানের প্রকাশ যেমন জ্ঞান, শক্তি বা আনন্দ রূপে, তেমনই পরম

সুন্দর রূপেও। কেউ কি এমন প্রশ্ন করে যে মা কেন তাঁর দিব্য চেতনাকে জ্ঞান ও শক্তি রূপে অভিব্যক্ত না করে ববং অজ্ঞানতা ও অক্ষমতার রূপে অভিব্যক্ত করছেন না? তোমার প্রাণসত্তা যে তাঁর সম্বন্ধে প্রশ্ন করছে কেন তিনি সুন্দর ও শৌখিন পোষাক পরেন, এ প্রশ্নও ওর চেয়ে কম নির্বোধ ও অর্থহীন হলো না।

২৭-২-১৯৩৩

×

> প্র ঃ মা সুন্দর শাড়িই পরুন বা সাধারণ জিনিসই পরুন, তিনি প্রাসাদেই থাকুন বা অরণ্যেই থাকুন, তাতে কি তাঁর দিব্য চেতনার কিছু ইতরবিশেষ হয়? বাহ্য জিনিসের দ্বারা ভিতরের কিছু কদর বাড়ে কি? বরং হয়তো কমে যায়।

উ ঃ বাহ্য জিনিস ভিতরের কিছুর প্রকাশ স্বরূপ। সুন্দর শাড়ি বা প্রাসাদ হলো বস্তুসৌন্দর্যের অভিব্যক্তি আর সেখানেই তার যা কিছু মূল্য। দিব্য চেতনা এগুলির সঙ্গে জড়িত নয় এবং এর প্রতি আসক্তও নয়, কিন্তু কর্মক্ষেত্রে প্রয়োজন হলেও সৌন্দর্যকে পরিহার করবে এমন কথা নয়। এই আশ্রম যখন গড়ে ওঠেনি তখন মা তালি দেওয়া সুতির শাড়ি পরতেন। আশ্রমের কাজ যখন হাতে নিলেন তখন সে অভ্যাস বদলাবার দরকার হলো, তাই তিনি বদলালেন।

২২-১০-১৯৩৫

ভাব প্রকাশে মায়ের অনুমোদন

ভাব প্রকাশ করা মা পছন্দ করেন না একথা ভাবো কেন, যদি তা সঠিক জিনিসের সঠিক প্রকাশ হয়? কিংবা নীরবতা ও প্রকাশ একেবারে বিপরীত জিনিস? গভীর আভ্যন্তরীণ নীরবতা থেকেও খাঁটী ভাবের প্রকাশ হতে পারে। আধ্যাত্মিক নীরবতা মানে কেবল শূন্যতা নয়; আর সেই

নীরবতা আনতে সকল কাজ বন্ধ করার দরকার হয় না।

মায়ের ভারতীয় সঙ্গীত উপলব্ধি

একি আশ্চয ধারণা তোমার যে মা কেবল ইউরোপীয় সঙ্গীত পছন্দ করেন আর ভারতীয় সঙ্গীত ভালোবাসেন না—কেবল লোকে যাতে নিরুৎসাহ না হয় তাই তিনি তা সহ্য করেন বা পছন্দ করার ভান করেন। স্মরণ ক'রে দেখ যে মা বরাবরই তোমার সঙ্গীতের প্রশংসা করেছেন আর যাতে তা আধ্যাত্মিক পূর্ণতা ও সৌন্দয লাভ করে সেজন্য তাঁর শক্তিকেও প্রয়োগ করেছেন। আমি প্রধানত তোমার কবিতাকেই সমর্থন করেছি; কিন্তু মা তো সেগুলি পড়তে পারেন না (যদিও তার অনুবাদ শুনে ভালো বলেছিলেন) তাই তিনি তাতে সাধারণভাবেই শক্তি প্রয়োগ করেছেন, কিন্তু সঙ্গীতের বেলা সম্পূণ অন্য কথা। তুমি নিশ্চয় বলতে চাও না যে তিনি কিছুই অনুভব করেননি? আর ক-এর উন্নতি নিয়ে যা বলেছেন? তাও তো ভারতীয় সঙ্গীত, ইউরোপীয় নয়। আর আমি যখন তোমাকে তোমার সঙ্গীতের প্রশংসা ক'রে লিখি, তুমি বুঝি ভাবো যে আমি কেবল নিজের অভিমতের কথাই বলছি? বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই তাঁর কথা নিয়ে আমি দুজনের মত বলেছি।

২০-১২-১৯৩২

বিভিন্ন সাধকের পক্ষে মায়ের বিভিন্ন আচরণ

তুমি বলেছ তোমার গানের সম্বন্ধে। তুমি জানো যে আমরা তা পছন্দ করি আর নিত্য তোমাকে তোমার গান ও কবিতার বিষয়ে উৎসাহিত করেছি। কিন্তু ক-র বেলাতে তাকে গান করতে মা নিষেধ করেছেন। অতএব দেখতে পাচ্ছ যে কারো বেলাতে মা নিবারণ করেন আর কারো বেলাতে অনুমোদন করেন, যেমন খ ও গ-র বেলাতে। কিছুকাল মা কনসার্টের ব্যাপারে উৎসাহ দিলেন তার পর তা বন্ধ ক'রে দিলেন। ক-কে গান সম্বন্ধে নিষেধ করাতে আর কনসার্ট বন্ধ ক'রে দেওয়াতে তুমি ধরে

নিলে যে মা সঙ্গীত ভালোবাসেন না, কিংবা ভারতীয় সঙ্গীত নয়, অথবা তিনি মনে করেন যে সাধনার পক্ষে সঙ্গীত ভালো নয়, ইত্যাদি যত মানসিক যুক্তি। ক-কে মা নিষেধ করেছেন এইজন্য যে তোমার পক্ষে সঙ্গীত ভালো হলেও ক-র পক্ষে তা বিষবৎ––যখনই সে গানের কথা ভাবে ও শ্রোতাদের সম্মুখীন হয় তখনই তার প্রকৃতিতে ইতর রকমের অনাধ্যাত্মিক ভাব প্রকট হয়ে ওঠে। তুমি নিজেই দেখতে পাবে এখন ঐ নিয়ে সে কি করছে। আর কনসার্টের সম্পর্কে একটু স্বতন্ত্র কথা; মা সেটা বন্ধ ক'রে দিলেন কারণ তিনি দেখলেন যে অশুভ শক্তি ওর আবহাওয়ার মধ্যে এসে পড়ছে, যদিও সঙ্গীতের নিজস্ব কোনো দোষ ছিল না––তাঁর উদ্দেশ্যটা মনের তরফের কিছু নয়। আর ঐরূপ কারণেই তিনি ঘ-র মতো একটা সাধারণ বৃহৎ প্রদর্শনী থেকে সরে দাঁড়ালেন। অথচ নিজেই তিনি টাউন হলে অন্যরূপ ছবির প্রদর্শনীর ব্যবস্থা করেছিলেন। সুতরাং দেখবে যে এখানে মনের নিয়মের কথা নয়, ওর মধ্যে আধ্যাত্মিক কারণ থাকে আর তা পরিবর্তন-শীল। এতে অন্য কোনো নিয়ম বা বিচার খাটে না; সঙ্গীত, চিত্রাঙ্কন, কবিতা ইত্যাদি আরো বিভিন্ন মনোময় ও প্রাণময় ক্রিয়াকে আধ্যাত্মিক উন্নতির বা আধ্যাত্মিক কর্মধারার অঙ্গীভূত ক'রে নেওয়া যেতে পারে; কিন্তু "যে ভাব নিয়ে তা করা হয় তারই উপর সমস্ত নির্ভর করে"। এটা যদি ধার্য করা হয় তাহলে সব কিছুই নির্ভর করবে মানুষটির প্রকৃতির উপর, তার মনোভাবের উপর, প্রয়োজন ও অবস্থা অনুসারে।

×

ওটি হলো মায়ের নিজস্ব কাজ। কেবল তিনিই বলতে পারেন কার সঙ্গে কেমন আচরণ করতে হবে। তিনি যদি কেবল সকলের খুঁৎ ধরে বেড়াতেন তাহলে আশ্রমে মাত্র ছয়জনও টিকতো কিনা সন্দেহ।

২৬-৩-১৯৩৪

×

মা সাধনা পরিচালিত করেন সত্যের অনুসরণে ও প্রত্যেকের প্রকৃতির

প্রয়োজন বুঝে ও প্রকৃতির স্তর বুঝে। এর কোনো বাঁধা প্রণালী নেই।

১৩-৯-১৯৩৩

×

তোমার নিজেরই উন্নতির দিকে লক্ষ্য রাখো আর মা তোমাকে যে রাস্তা দেখাচ্ছেন সেই রাস্তাতে চলো। অন্যেদেরও তাই করতে দাও; মা রয়েছেন তাদের প্রয়োজন ও প্রকৃতি অনুযায়ী চালিত করার জন্য। তিনি তোমার বেলাতে যে পদ্ধতি নিয়েছেন অন্যের বেলাতে যদি তার বিপরীত পদ্ধতি নেন তাতে কিছু যায় আসে না। তার পক্ষে সেটা ভালো, তোমার পক্ষে এইটা ভালো।

২৫-১০-১৯৩২

×

মা বিশেষ ক'রে তাদেরই কড়া কথা বলেন বা লেখেন যাদের তিনি তাড়াতাড়ি অগ্রসর করাতে চান এবং যখন তারা তার পক্ষে উপযুক্ত, আর তারাও ওতে কোনো দুঃখ পায় না, বরং তারা সোজাসুজি ঐরকম চাপ পেয়ে খুশি হয়, কারণ নিজেদের অভিজ্ঞতা থেকে তারা জেনেছে যে ওতে তারা নিজেদের বাধাগুলি দেখতে পেয়ে তার সংশোধন ক'রে নিতে পারে। তুমি যদি তাড়াতাড়ি অগ্রসর হতে চাও তাহলে এই সব প্রাণগত প্রতিক্রিয়া, অভিমান, বেদনা বোধ, আত্মসমর্থনের যুক্তি খোঁজা, যে স্পর্শ তোমার মুক্তিকামী তাতে সোচ্চারে বিলাপ করা—এগুলি ছাড়তে হবে, কারণ যতদিন ওগুলি আছে ততদিন আমাদের পক্ষে খোলাখুলি ভাবে তোমার প্রাণপ্রকৃতির তৈরি বাধাগুলিকে নির্মূল করতে যাওয়া কঠিন হবে।

আর ক-এর সঙ্গে তোমার তর্ক ও মতভেদ সম্পর্কে: অবাঞ্ছিত যত কিছু তর্কবিতর্ক, বাচালতা, ঘোঁট পাকানো, এগুলির সম্বন্ধে মায়ের নিষেধ বলবৎ থাকবে; এই সব জিনিসকে যখন প্রশ্রয় দিতে থাকো তখন নিজেকে এমন খেলো এবং অজ্ঞান ধরনের চেতনার মধ্যে নামিয়ে আনো যাতে তোমার প্রাণসত্তার দোষগুলো ছাড়া পেয়ে বেরিয়ে আসে, আর তোমার আভ্যন্তরীণ চেতনাতে যা কিছু উন্নতি ঘটেছে তার থেকে তোমাকে বাইরে

এনে ফেলে। এইজন্যই তোমাকে আমরা বলেছি যে ক-এর কাছে গেলেই যখন তোমার মধ্যে এই সব জিনিসের বিরুদ্ধে প্রতিক্রিয়া জেগে ওঠে, তার মানে তোমার প্রাণ ও স্নায়ুসত্তার মধ্যে তখন চৈত্যের সংবেদন সজাগ হয়, এবং তা ভালোর জন্যই হয়। কিন্তু অন্যেদের সঙ্গে আচরণের বেলাতে যখন ঐসব জিনিস থেকে নিবৃত্ত হও তখন যেন তোমার মধ্যে কোনো শ্রেষ্ঠত্বের ভাব না ঢুকে পড়ে, কিংবা তোমার আচরণে বা ভাবগতিকে এমন জিনিস না প্রকাশ পায় যে তুমি তাদের হেয়জ্ঞান করছ বা তাদের বদলাবার জন্য নিজের জোর খাটাচ্ছ। তোমার নিজেরই ব্যক্তিগত আভ্যন্তরীণ প্রয়োজনে তুমি নিজেকে নিবৃত্ত করছ, এই হলো কথা। আর তাদের সম্বন্ধে, তারা ভালো হোক বা মন্দ হোক, সেটা তাদের বিবেচ্য এবং আমাদের বিবেচ্য। আমরা যখন যেমন প্রয়োজন ও সম্ভব মনে করব তখন তেমনি ব্যবস্থা করব, হয়তো একজনকে যা করতে দেবো অন্যজনকে তা করতে নিষেধ করব; শুধু যে প্রত্যেকের পক্ষে স্বতন্ত্ররকম ব্যবস্থা হবে তাই নয় কিন্তু একই ব্যক্তির পক্ষে বিভিন্ন সময়েতে বিভিন্ন রূপ ব্যবস্থাও করা হবে, আজ যেখানে উৎসাহদান কাল সেখানে নিবারণ...কোনো মানব আত্মা ও প্রকৃতির পক্ষে এক ধরনের বাঁধা মানসিক নিয়ম সবত্র চলতে পারে না; তা যদি হতো তাহলে কারো কোনো গুরুর দরকার হতো না, স্যাণ্ডোর ব্যায়ামশিক্ষার মতো বাঁধা চার্ট সামনে রেখে তাই অভ্যাস করতে করতে সকলেই সিদ্ধপুরুষ হতে পারত!

২৫-১০-১৯৩২

মায়ের মহাকালী শক্তির প্রয়োগ

এসব জিনিস নির্ভর করে ব্যক্তিবিশেষ, অবস্থাবিশেষ ও ক্ষেত্রবিশেষের উপর। মা তাঁর মহাকালী শক্তিকে প্রয়োগ করেন কেবল তাদের বেলাতে—

(১) যাদের মধ্যে প্রবল আগ্রহ ও মূলগত ঐকান্তিকতা থাকে, এমন কি প্রাণসত্তাতেও।

(২) যাদের মা জানেন অন্তরঙ্গ বলে, এবং যারা তাঁর কাঠিন্যকে ভুল বুঝবে না কিংবা তাঁর দয়া বা কৃপার প্রত্যাহার বলে মনে না ক'রে তাকে সাধনার পক্ষে তাঁর সাহায্য ও কৃপা বলেই নেবে।

অন্যেরা এ প্রণালীকে সহ্যই করতে পারবে না—এর প্রয়োগ হ'লে তাতে ভুল বুঝে হতাশ হয়ে বিদ্রোহ ক'রে হাজার মাইল দূরে ছুটে পালাবে। মা চান যে প্রত্যেকেরই আত্মা বিকাশের জন্য পূর্ণ সাহায্য পাক, তার প্রণালী দ্রুতই হোক বা বিলম্বিতই হোক, সোজা রাস্তাতেই হোক বা আঁকাবাঁকা পথেই হোক। যার যেমন প্রকৃতি সেই অনুযায়ী মায়ের ক্রিয়া।

৯-৫-১৯৩৩

×

মায়ের ধমক খেতে যদি তুমি ভয় পাও, তাহলে উন্নতি করবে কেমন ক'রে? যারা তাড়াতাড়ি এগোতে চায় তারা মহাকালীর মারকেও আদর ক'রে নেয়, কারণ তারা জানে যে সেই আঘাত ধাক্কা মেরে তাকে খুব শীঘ্র যাত্রাপথে অনেকখানি এগিয়ে দেবে।

মায়ের কর্ম পদ্ধতি

তুমি চাও যে মা তোমার সব কিছু বিষয়ে একটা নির্দিষ্ট রকমের রুটিন ব্যবস্থা ছকে দেবেন আর তাই ধরে তুমি চলবে, কিন্তু তা হতে পারে না কারণ মায়ের কর্ম পদ্ধতি এর সম্পূর্ণ বিপরীত। অধিকাংশ পার্থিব ব্যাপারে সময় অনুযায়ী একটা প্রোগ্রাম ঠিক ক'রে নিতে হয় নতুবা সব কিছু এলোমেলো এবং অগোছালো হয়ে যায়। স্থূল কাজগুলি চালাতে একটা বাঁধা নিয়ম ক'রে নিতেই হয়, যতদিন বিনা নিয়মে ঠিক ভাবে চলবার মতো উন্নতি কর্মীদের মধ্যে না আসছে। কিন্তু তুমি যে বিষয়ের কথা লিখেছ তা হলো স্বতন্ত্র জিনিস, তোমার আভ্যন্তরীণ বিকাশ ও সাধনার সঙ্গে জড়িত। বস্তুত এমন কি বাহ্য ব্যাপারেও মা তাঁর মনের দ্বারা ছক কেটে কোনো নিয়ম বেঁধে চলেন না; প্রত্যেক জিনিসের বেলাতেই সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখে নেন যে কোনটাতে কি করতে হবে আর সেই অনুযায়ী একটা ব্যবস্থা ক'রে দেন। আভ্যন্তরীণ কাজ ও সাধনার ক্ষেত্রে এমন ভাবে আগের থেকে প্ল্যান ক'রে বলা আরো অসম্ভব যে—"ঠিক এইখানে এই-ভাবে পা দিয়ে চলো, এই লাইন ছাড়া অন্য লাইনে চলবে না"। তাতে

এমন বাঁধাধরা অনড় অবস্থা ঘটবে যে কোনো কিছুই করা যাবে না; প্রকৃত কোনো গতিক্রিয়াই তাতে হতে পারবে না।

মা যে তোমাকে সকল কথা জানাতে বলেছেন তা প্রতি পদে তোমাকে উপদেশ দিতে নয় যে এই ভাবে চলো। তার কারণ প্রথমত ওতে এমন একটা ঘনিষ্ঠতা আসে যাতে তুমি মায়ের কাছে নিজেকে মেলে ধরতে পারো, আর মাও তাতে উত্তরোত্তর প্রতি পদে তোমার মধ্যে দিব্য শক্তি প্রয়োগ ক'রে তোমার মধ্যে আলো দিয়ে তোমার প্রকৃতিকে ও ক্রিয়াকে নির্দোষ করতে পারেন। এটাই ছিল বিশেষ জরুরী; বাকী সব কিছু গৌণ, যখন যেমন সহায়ক কিংবা বাধাদায়ক হয়। তা ছাড়া ওতে মা বুঝতে পারবেন যে কখন কেমন নির্দেশ দিতে হবে, সাহায্য করতে বা সতর্ক করতে হবে, সব সময় বাক্যের দ্বারা নয় কিন্তু নীরব চাপের দ্বারা। যারা মায়ের কাছে নিজেদের খুলে দেয় তাদের সঙ্গে মা এমনি আচরণই করেন, প্রতি ক্ষেত্রে বিশদভাবে মুখে কিছু ব্যক্ত করবার দরকার হয় না। বিশেষত তোমার চৈত্যচেতনা উন্মীলিত অবস্থায় থাকলে সে তখনই তা জানতে পেরে মায়ের সাহায্যকে বা সতর্কতাকে তৎক্ষণাৎ স্পষ্ট চিনে নিয়ে গ্রহণ করতে পারে। তাই হচ্ছিল যখন তোমার চৈত্য চেতনা সক্রিয় হয়েছিল, কিন্তু তোমার প্রাণসত্তার একটা বদ্ধ অংশ বারে বারে প্রকট হয়ে উঠে এই সব যত কিছু বিপত্তি ও ব্যাঘাতের সৃষ্টি করেছে।

সমস্তই নির্ভর করছে আভ্যন্তরীণ অবস্থার উপর, বাহ্য ক্রিয়া কেবল তারই অভিব্যক্তির পক্ষে সহায়ক হয়ে তাকে সক্রিয় ও সফল ক'রে তোলে। চৈত্যকে সামনে রেখে বা আভ্যন্তরীণ সত্তার স্পর্শের দ্বারা তুমি যা কিছু বলবে বা করবে তা ঠিক সফল হবে; আর যদি ঠিক সেই জিনিসটাই করো মন বা প্রাণসত্তা থেকে বা মিশ্রিত ভাব থেকে, তখন তা হয়তো একেবারে নিষ্ফল হবে। প্রত্যেক ক্ষেত্রে প্রত্যেক সময় ঠিক ভাবে ঠিক কাজ করতে চাইলে তার জন্য সমুচিত চেতনাতেই থাকা দরকার--মনের নিয়ম ধরে চলে তা হতে পারে না, কোথাও তা ঠিক লেগে যায় আবার কোথাও তা আদৌ লাগে না। সত্যের দিক থেকে সামঞ্জস্য রেখে একটা সাধারণ সূত্র ঠিক করা যেতে পারে, কিন্তু তার প্রয়োগের বেলাতে আভ্যন্তর চেতনা দিয়ে প্রতি পদে দেখে নিতে হবে যে কোথায় কোনটা কয়বে অথবা করবে না। চৈত্য জাগ্রত থাকলে আর তোমার সত্তাটি মায়ের দিকে উন্মীলিত থেকে তার অনুসরণ করলে ওরূপ কাজ ঠিকই করা যাবে।

সুতরাং ব্যবহারিক ক্ষেত্রে মনের নিয়ম নয়, সব নির্ভর করছে চৈত্য চেতনার ক্রিয়া এবং প্রাণসত্তার উপর তার আলো ফেলে তাকে মায়ের দিকে সম্পূর্ণরূপে ফিরিয়ে রাখার উপর। তুমি ক-এর কাছে ঘন ঘন যাবে কিনা তা নিয়েও ভাবতে হবে--যাওয়া কমিয়ে দেওয়া মানে তোমার প্রাণের অংশকে আগেকার দাসত্ব ক্রিয়া থেকে সরিয়ে আনা। সকল বিষয়েই এই রকম।

কিন্তু সকল বিষয়ে যে ধরনের বাহ্য বাধ্যতা মেনে চলার উপর এতটা গুরুত্ব দিয়ে তুমি পদে পদে কেমন ভাবে চলতে হবে তার নির্দেশ চেয়েছ, ওতে আসল সমর্পণ হয় না, যদিও বাধ্যতা তার বাহ্য স্বরূপ ও লক্ষণ বটে। কিন্তু সমর্পণ হবে ভিতর থেকে, মন প্রাণ দেহ সমস্তকেই মায়ের কাছে খুলে ধরা, তিনি তাকে নিজের ক'রে নিয়ে সঠিক ভগবৎ অংশ রূপে নতুন ক'রে গড়ে তুলুন; এর ফলে যা কিছু হবার তা হবে। তখন আর বাক্য মারফতে তাঁর বাহ্য আদেশ চাইতে হবে না, সত্তাটি আপনা থেকেই মায়ের ইচ্ছানুযায়ী কাজ করতে থাকবে; কেবল সেই আভ্যন্তর মিলনের ও মায়ের ইচ্ছা প্রতিপালনের অনুমোদন সূচক ছাপ মায়ের কাছে মিলবে।

১১-৬-১৯৩২

সত্যে মায়ের নিষ্ঠা

মা শুনেছেন যে ক আপত্তি করেছিল তোমার তাঁর ঘরে কাজ করা নিয়ে, কিন্তু তিনি তখনই তা অগ্রাহ্য ক'রে বলে দিয়েছেন যে তাতে কিছু যায় আসে না। এর সঙ্গে তাঁর পূর্ব নির্ধারণের কোনো সম্পর্কই নেই,-- তা করা হয়েছিল সম্পূর্ণ অন্য কারণে।

মিথ্যা মিথ্যাই, তা যেই কেন বলুক। কে কোথায় ভাবছে বা তোমাকে বলছে যে মা অমুক উদ্দেশ্য নিয়ে এই কাজটা করেছেন, আর তুমি মায়ের নিজের বলা উদ্দেশ্যের কথা মিথ্যা মনে ক'রে যে সত্য জিনিসটা জানে না তাকেই বিশ্বাস ক'রে মায়ের উপর দোষারোপ করতে যাও যে তিনি সত্য গোপন করেছেন, এবং তার ফলে তুমি অস্থির হয়ে ওঠো, সেটা কি আমাদের দোষ? এখানে আসল প্রশ্ন হলো মায়ের উপর অধিকতর আস্থা

থাকা নিয়ে,——কোনো সাধকদের কথা শুনে তোমার মনের তৎক্ষণাৎ তাই সত্য বলে ধরে নেওয়া, কিংবা তোমার প্রাণসত্তার পক্ষে সঠিক খবর না জেনে সেই রকমই নিশ্চয় বলে বোধ করতে থাকা, এগুলি হলো অবাঞ্ছিত ক্রিয়া। এগুলিকে যদি বর্জন করতে পারো তাহলে সমস্তই সহজ হয়ে যাবে।

১৫-৫-১৯৩৬

×

> প্র ঃ আমি ধরে নিয়েছিলাম যে মা যেমন মুখে বলেছেন তার চেয়ে উচ্চতর কোনো উদ্দেশ্য নিয়ে তিনি কাজ করেছেন। এটা মিথ্যা বলা নয়, এ হলো তাঁর অতিমানসিক কর্মপদ্ধতি। "মিথ্যা মিথ্যাই" এ কথা কি সব জায়গাতে খাটে? তা খাটে তাদের পক্ষে যারা নৈতিক ও সামাজিক নিয়মের বন্ধনে আবদ্ধ, কিংবা যেখানে মন্দ উদ্দেশ্য থাকে সেখানে। কিন্তু যদি কোনো উচ্চ উদ্দেশ্যে কিছু গোপন রাখার বা অন্যভাবে বলার দরকার হয় তাকে আমি মিথ্যা বলব না। বোধ করি কৃষ্ণ সব সময় খাঁটী সত্য বলতেন না, তাঁর অর্ধ-মিথ্যার কাহিনী শুনে লোকে এখনও হাসে।

উ ঃ মা যদি এক কারণে কিছু করেন আর বলেন তার অন্য কারণ, তাহলে তাকে মিথ্যা বলা ছাড়া আর কি বলব জানি না। অতিমানবিক কোনোরূপ উদ্দেশ্যই মিথ্যাকে মিথ্যা-নয় ক'রে দিতে পারে না। আর যদি তুমি প্রকৃতই বিশ্বাস করো যে ভগবান অসত্য বললেও তা অসত্য হয় না বরং তাই তাঁর ভগবত্তার একটা অংশ,——তাহলে মা সেই কর্ম করেছেন মনে ক'রে তোমার প্রতি তাঁর অসত্য ব্যবহারে অমন দুঃখিত ও বিরক্ত হয়ে অমন সরবে নালিশ জানাও কেন যে তিনি তোমার সঙ্গে খোলাখুলি ব্যবহার করেননি ইত্যাদি? তাহলে তিনি অতিমানবিক উদ্দেশ্যে তাই করেছেন ভেবে খুশি হয়ে তা মেনে নেওয়া উচিত ছিল। অন্তত সেটাই যুক্তিসম্মত।

তুমি হয়তো ধরে নিয়েছ যে দৈবী চেতনা ভালো এবং মন্দের উপরের জিনিস। কিন্তু তার মানে এই নয় যে সেই চেতনা ভালো এবং মন্দ দুই-রকমই কাজ অপক্ষপাতে করে। তার মানে কেবল এই হয় যে তা মানব

চেতনার স্তরের উপরের আলোতে কাজ করে, মানব চেতনার মাপে নয়। অর্থাৎ মানুষ যেটাকে আপাত ভালো বলে জ্ঞান করে তার চেয়ে বৃহত্তর ভালোর দিক দিয়ে তার কাজ হয়। যে বৃহত্তর সত্যের মতলবে সে কাজ করে মানুষ তার সম্বন্ধে ধারণাই করতে পারে না। এই কারণেই মানুষের মন ভগবৎ ক্রিয়াকে ও তার উদ্দেশ্যকে বুঝতে পারে না--তা বুঝতে হলে তাকেও সেই উচ্চ চেতনাতে উঠে ভগবানের সঙ্গে মিলিত হতে হবে। আর তা যখন কেউ বুঝবে তখন আর সে দিব্য ক্রিয়াকে মানুষের মনের দৃষ্টি-ভঙ্গী নিয়ে দেখবে না। দুই রকমে কখনো মিল হয় না।

কিন্তু এখানে সে কৈফিয়ৎ নয়। মিথ্যা উদ্দেশ্য আরোপ করা কোনো বৃহত্তর সত্যের ও চেতনার ক্রিয়াতে খাটে না। উদ্দেশ্যের কথা কিছু না বলে নীরব থাকা এক কথা,--কিন্তু আমি এক মতলবে কাজ ক'রে অন্য-রকম বললাম, এটা নীরব নয়, এটা মিথ্যাই। এখানে নৈতিক প্রশ্ন নয়, আধ্যাত্মিক গুরুত্বের প্রশ্ন। মা বরাবর সত্যই চান আর বরাবর বলেন যে মিথ্যা কথা বললে উপলব্ধির পক্ষে তা দুর্দান্ত প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়ায়। তাহলে তিনি নিজেই তা কেমন ক'রে করতে পারেন?

কৃষ্ণ যে কোথায় মিথ্যা বা অর্ধ-মিথ্যা বলেছিলেন তা আমার স্মরণ হচ্ছে না, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমি কিছু বলতে পারি না। কিন্তু মহাভারতে কিংবা ভাগবতে যদি ওকথা থাকেও তথাপি আমরা সেই দৃষ্টান্ত অনুসরণ করব না। বোধ করি রাম ও বুদ্ধ কখনো মিথ্যা বলেননি।

১৭-৫-১৯৩৬

×

তুমি যে ঐ বন্ধন থেকে ছাড়া পেয়েছ এটা ভালো কথা। সত্যের প্রতি নিষ্ঠা নিশ্চয় দিব্য ভাব, কিন্তু এই ধরনের কঠোরতা বা তীব্র ক্রোধ-যুক্ত যে সত্য তা খুবই মিশ্রিত জিনিস। সত্য কখনো এমন জোর করে না যে মুখে যা বলেছি সেটাকেই অন্ধভাবে নিশ্চয় মেনে চলতে হবে,--যেমন কেউ তোমার খুব ক্ষতি করেছে ভেবে যদি মুখে বলো যে ওকে আমি খুন করবো, কিন্তু তারপরে বাস্তবিক সে ক্ষতি করেনি জেনেও যদি তুমি বলেছ বলে তাকে খুন করো। একেই বলা চলে যে মুখে যা বলেছি কাজে তা করবই, এই আমার নীতি। কিন্তু প্রকৃত সত্য চায় যে তুমি সত্যের

মর্মটাকেই আঁকড়াবে, সেই অর্থে উপরের দৃষ্টান্তের ক্ষেত্রে তোমার প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ করলে তাতে মিথ্যা কিছু করা হবে না। কেউ যদি এমন প্রতিজ্ঞা করে যা প্রেম এবং অনুকম্পার বিরোধী অথবা ভগবানের প্রতি আনুগত্য ও সমপর্ণের বিরোধী, সে প্রতিজ্ঞা পালন করলে সত্যরক্ষা হবে না––কারণ তা একটা মিথ্যা বিষয়ে প্রতিজ্ঞা––আর একটা মিথ্যাকে নিয়ে সত্যপালন কেমন ক'রে হয়? তা যদি করো তাহলে সে হবে আসুরিক সত্যপালন, খাঁটী দিব্য সত্য নয়।

আর মায়ের বেলাতে তুমি দেখবে যে তিনি একবার যে ব্যবস্থা করেছেন তাকেই অন্ধভাবে অনুসরণ করেন না। যেমন মনে করো, কাউকে তিনি বললেন যে এবার যদি তুমি যৌন দুর্বলতাকে আর প্রশ্রয় দাও তাহলে তোমাকে এই আশ্রম ছেড়ে চলে যেতে হবে, কিন্তু তবুও যদি সে তাই ক'রে ফেলে এসে দোষ স্বীকার ক'রে অনুতাপ করতে থাকে, তাহলে মা হয়তো তাকে ক্ষমা ক'রে সে আদেশ প্রত্যাহার করেন। আর সাক্ষাৎদান সম্পর্কে তাঁর এই যে অনুমতি দেওয়া, এগুলি অটল বাক্যদান বা কনট্রাক্‌ট নয়–– সাময়িক ব্যবস্থা মাত্র যা বদলাতেও পারে। যেখানে আধ ঘন্টা ওর জন্য সময় নির্দিষ্ট করা হয়েছিল সেখানে তা পৌনে এক ঘন্টাও হতে পারে বা কুড়ি মিনিটও হতে পারে। সময়ের ব্যাপারে একটা নমনীয়তা থাকা দরকার, জীবনকে একেবারে কাঁটায় কাঁটায় চালাতে গেলে তা হয় একটা যন্ত্র হয়ে দাঁড়াবে নতুবা ভেঙে পড়বে। কিন্তু এই ব্যাপারটা ইচ্ছাকৃত নয়, দৈবাৎ হয়ে গেছে। তোমার নামটা ভুলবশত সকালের সাক্ষাতের তালিকাতে লেখা হয়নি, আর সে তালিকার নামগুলি শেষ হয়ে গেলে মা দরজায় ঢুকে গেলেন। তখন অনেক দেরী হয়ে গেছে আর লোক সাক্ষাতে অনেকক্ষণ থেকে থেকে বিরোধী শক্তিদের সঙ্গে নানা সংঘাতে মা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলেন তা ছাড়া তাঁর আরো অনেক কাজ ছিল এবং আমার কাছে এসে তাঁকে রিপোর্ট দিতে হলো, তাই আর তিনি ফিরে যেতে পারেন নি।

কিন্তু তোমার অজ্ঞাত কোনো কারণে মা যদি ইচ্ছা করেই তোমাকে সাক্ষাৎ না দিয়ে থাকেন তথাপি তোমার অমন প্রতিক্রিয়া ঠিক হয়নি। কারণ তোমার যোগের এই মূল ভিত্তি নিয়ে তুমি চলেছ যে মায়ের ইচ্ছা যেমনই হোক নির্বিচারে তারই বাধ্য হয়ে চলবে। এই সব জিনিস–– যদিও দৈবাৎ হয়, তথাপি তা এমনি এসে পড়ে প্রাণসত্তার পরীক্ষার জন্য,

যাতে একটা মোচড় ও ব্যথার দ্বারা তার পরিবর্তন ঘটানো যায়।

২৮-৯-১৯৩৩

মায়ের ক্রিয়াকে মনের বিচার মূল্যহীন

নিশ্চয়ই, প্রকৃতি বা নিয়তি বা ভগবান কেউই মনের নিয়মে চলে না বা মনের রাস্তায় কাজ করে না, সেইজন্য বৈজ্ঞানিক ও দাশনিকের কাছে এদের সব কাজই প্রহেলিকার মতো বোধ হয়। মাও কোনো কাজ মনের দ্বারা করেন না, সুতরাং মনের দ্বারা তাঁর কাজের বিচার করা মূল্যহীন।

৫-৫-১৯৩৬

×

মা তাঁর শিষ্যদের সঙ্গে এই সব মানসিক সমস্যা নিয়ে আলোচনা করেন না। বুদ্ধির দ্বারা এর মীমাংসা করতে যাওয়া অনর্থক। এখানে দুটি জিনিস রয়েছে,---অজ্ঞানতা, যার থেকে আসে সংঘাত ও অসঙ্গতি,---আর আছে প্রগুপ্ত আলো, ঐক্য, আনন্দ, সঙ্গতি। বুদ্ধি হলো ঐ অজ্ঞানতার অন্তর্গত। আর কেবল উচ্চ চেতনাতে যেতে পারলেই তখন মেলে সেই আলো, ঐক্য, সঙ্গতি, আনন্দ, যা বাহ্য কোনো সংঘাতে বা অসঙ্গতিতে বিচলিত হয় না। সুতরাং সেই চেতনাতে বদল হওয়াই আসল দরকার, বুদ্ধির দিকের রফাতে কোনো লাভ নেই।

মায়ের কথার ভুল অর্থ করা

কেবল ক নয়, অধিকাংশ ব্যক্তিই মায়ের কথাকে অমনি বেঁকিয়ে দেখে---এটা যেন প্রায় সর্বজনীন মানব প্রকৃতি। সে কিংবা অন্য কেউ যে খলতা থেকে করে তা নয়---তারা যখন শোনে তখন তাদের মন নীরব না থেকে সক্রিয় থাকে, তাই তাদের নিজেদের চিন্তা মায়ের কাছে যা শুনলে তার সঙ্গে মিশে গিয়ে তাকে অন্য রকম গঠন বা রং দিয়ে ফেলে। আর

তাদের প্রাণসত্তাও নিজের ইচ্ছা বা সুবিধা অনুযায়ী তাকে বাড়িয়ে কমিয়ে একটা অন্য আকার দেয়। এটা চেতনে না হয়ে বেশিব ভাগ অচেতনেই হয়ে থাকে।

বর্তমান ঘটনাতে মা যা বলেছিলেন তা সাধারণ ভাবেই, খ কিংবা গ-কে নিয়ে নয়, তিনি বলতে চেয়েছিলেন যে কামনার কড়া তাগিদের চাপে কাজের সময় স্মৃতিটা চাপা পড়ে যায়, সেই কামনা যখন মিটে যায় তখন সব মনে পড়ে যায়। কিন্তু ক ওতে নিজের ধারণা জুড়ে দিয়ে ভাবলে যে মা খ-এর ক্রিয়াটি নিয়েই তা বলেছেন এবং সে তা জেনেশুনেই করেছে—কেবল তার কামনা পূরণের জন্য। কিন্তু মা তা মনে করে বলেননি, সাধারণ ভাবেই বলেছেন।

৩০-৩-১৯৩৩

"সবই মায়ের করা" বলার বিপদ

তুমি যা লিখেছ তা অখণ্ডনীয়—গোড়ার দিকে সাধকদের এ সুযোগ দেওয়া হয়েছিল—কিন্তু মুশকিল থেকে গেল প্রকৃতির পূর্ণ ঐকান্তিকতার অভাব নিয়ে। খুব কম জনই তার যোগ্য হতে পারল আর যারা বা হলো তাও নিতান্ত টানাটানি ক'রে। ঐকান্তিকতার অপূর্ণতা ছাড়াও মস্তিষ্কের ভিতরটা আচ্ছন্ন হয়ে থাকে অহমিকা ও কামনার মেঘে, তাই সে ভাবে যে আমি তো ঠিকই করছি, যখন বাস্তবিক সে তা করে না। তাই আমি বলেছিলাম—সবই মায়ের কথা মনে করার বিপদের কথা। কেউ কেউ ভাবে যে তাদের অহং ও প্রাণসত্তা যা করছে তাও মা করাচ্ছেন, তাঁর কাছ থেকেই প্রেরণা আসছে বলে তাই করা হচ্ছে। কেউ বা স্বাধীনভাবেই আগেকার দোষগুলি চালিয়ে যায় আর বলে যে মা যখন চাইবেন তখন তিনিই বদ্‌লে দেবেন! আবার কেউ কেউ এমন কি নিজেদের মধ্যে একটা কল্পিত মা তৈরি ক'রে নিয়ে যেন তাঁরই নির্দেশে নিজেদের অহং ও কামনাকে অনুসরণ করতে থাকল, এখানকার মায়ের বাস্তব নির্দেশের বিরুদ্ধেই, আর ভেবে নিলে যে এই মা তো সবে নতুন কিন্তু ভিতরের মা-ই আসল, কিংবা এই মা সেই মায়ের বিপরীত জিনিস করতে বলে পরীক্ষা ক'রে দেখছেন যে তাতে ওরা কি করে! সত্য যা তা সত্যই থাকে, কিন্তু

মন এবং প্রকৃতির অন্যান্য অংশের বেঁকিয়ে দেখার স্বভাবের দিকেও লক্ষ্য রাখতে হয়।

১৭-১০-১৯৩৬

মায়ের কাজ ও তার সময়

তোমার ফরাসী লেখাতে অনেক ভুল আছে বলেই যে মা সংশোধন করে দেননি তা ঠিক নয়, আমিই তাঁকে যতটা পারি নিবৃত্ত করেছি যাতে তিনি আরো বেশি কাজ নিজের ঘাড়ে না নেন। এমনিতেই তিনি রাত্রেও যথেষ্ট বিশ্রাম পান না, রাত্রের প্রায় সমস্ত সময়টাই কাটাতে হয় গাদা গাদা খাতা ও চিঠি ও বিভাগীয় রিপোর্ট প্রভৃতি নিয়ে, যা নিত্যই এসে জমা হচ্ছে। রাত জেগেও সকাল পর্যন্ত সে কাজ ফুরোয় না। ঐ সঙ্গে যারা নতুন ফ্রেঞ্চ শিখছে তাদের চিঠিগুলিও যদি বসে বসে সংশোধন করতে হয়, তার মানে আরো দুই এক ঘন্টার বেশি কাজ--তাহলে তা শেষ করতে ন'টা বেজে যাবে, এখানে আসবেন ১০৷৷ঃটায়। সেটা বন্ধ করতে চাই।

×

মা যে সময়ের অভাবে কোনো চিঠি খুললেন না এমন কখনই হয় না; যে কাজই তাঁর কাছে আসুক তা সমস্তই তিনি সম্পন্ন করেন, অসুস্থ হলেও বা বিশ্রামের অভাব হলেও।

১৫-২-১৯৩৬

×

মা যখন ছাদের উপর একটু ঘুরে বেড়ান তখন তিনি চান যে তাঁর দিকে কেউ চেয়ে চেয়ে না দেখে, কারণ তখনই তিনি নিজের মধ্যে একাগ্র হবার একটু সময় পান--কিছু মুক্ত বাতাস নেবার ও চলাফেরা ক'রে স্বাস্থ্যরক্ষার প্রয়োজন ছাড়াও। এত লোকের দৃষ্টির আকর্ষণ থাকলে তা তিনি স্বচ্ছন্দে করতে পারেন না। যখন তোমাদের সাক্ষাৎ দেন তখনকার

কথা আলাদা; তার জন্য তিনি নিজেকে প্রস্তুত ক'রে নেন এবং সেটা তাঁর কাজেরই মধ্যে, সুতরাং তখন কিছু বদলাতে হবে না। এটা বলা হচ্ছে কেবল তাঁর ছাদে বেড়াবার সময়ের জন্য।

×

লোককে সাক্ষাৎ দেবার সময় মায়ের খুবই সীমাবদ্ধ––কারণ তাঁকে আরো অনেক কিছু করতে হয়। সুতরাং যেখানে খুব বেশি দরকার মনে করেন সেখানেই তিনি বিশেষভাবে সাক্ষাৎ দেন, আর যারা তাঁর সঙ্গে কাজ করছে তাদের তো সাক্ষাৎ দিতেই হয়।

১৯৩৩

সাক্ষাতের জন্য সমুচিত মনোভাব

মায়ের কাছে সাক্ষাতে যাবার সময় আপন সত্তাকে সম্পূর্ণ শান্ত ও গ্রহিষ্ণু ক'রে খুলে নিয়ে যেতে হবে, তখন যেন মনের ক্রিয়া বা প্রাণের কামনা কিছু না থাকে, কেবল থাকে সমর্পণ ও তিনি যা দেবেন তা নেবার জন্য চৈত্যের প্রস্তুতি।

২৩-২-১৯৩২

×

মায়ের কাছে যখন যাবে তখন ওসব জিনিস মনের মধ্যে নিয়ে যাবে না––কেবল নীরবে খোলা মন নিয়ে যাবে যেন তোমার যতটা সাধ্য ততটা তাঁর কাছে নিতে পারো।

১০-৪-১৯৩৪

×

এই কথাটি স্মরণ রাখা চাই যে মায়ের এমন সংস্পর্শ দান মানে

কেবল সাধারণ সামাজিক বা ঘরোয়া অনুষ্ঠান অথবা বাহ্য সৌজন্যক্রিয়া নয় যাতে হলো বা নাই হলো তাতে কিছু ইতরবিশেষ হয় না। এর বেলাতে একটা আদানপ্রদান ঘটে, তিনি তাঁর শক্তি দান করেন এবং তার বদলে অন্যেদের কাছ থেকে তাদের ভালো মন্দ এবং মিশ্রিত সব কিছুই তাঁকে নিতে হয়, তার জন্য তাঁকে যথেষ্ট আভ্যন্তরিক পরিশ্রম ও ছাঁটাইএর কাজ করতে হয়, এবং সকলের বেলা না হলেও অনেক স্থলে তাতে তাঁর দেহেতেও যথেষ্ট ধকল সইতে হয়।

১২-১১-১৯৩১

×

তোমার জন্মদিনটা মাটি হয়ে গেল একথা তুমি আগের থেকেই ধরে নেবে কেন? তোমার বাহ্য সত্তার এখনও অবিশুদ্ধ অংশ থেকে ঐসব যত কিছু অবাঞ্ছিত মনোভাব আসছে তাকে একেবারে ছেঁটে ফেলে পুরো সমুচিত মনোভাব নিয়ে মায়ের কাছে আসবে। কে কি পেয়েছে বা না পেয়েছে তাই নিয়ে একেবারেই কিছু ভাববে না—তোমার যা সম্পর্ক তা কেবল তুমি ও মায়ের মধ্যে, সেখানে অন্যেদের কোনো প্রশ্নই নেই। তোমার কাছে তখন কেবল তিনি ও তুমি ছাড়া আর কিছু নেই—তিনি যে শক্তিপ্রবাহ প্রেরণ করছেন তাই তুমি গ্রহণ করছ।

আর তা ভালোভাবে সফল করবার উপায় হলো বাক্যব্যয় ক'রে নিজের সময় নষ্ট কোরো না—বিশেষত নিজের মধ্যে যদি হতাশার অন্ধকার থাকে, তাই নিয়ে আলোচনা করলে বৃথা সময় নষ্ট করা হয়, সত্য চেতনা তাতে একটুও আসে না। নিজেকে একাগ্র করো, উন্মীলিত করো, তাহলে মা ফিরিয়ে আনবেন সঠিক চৈত্য অবস্থা এবং তার ভিতর দিয়ে তোমার ধ্যান ও নীরবতার মধ্যে যা দরকার তা ঢেলে দেবেন।

১৬-৫-১৯৩৩

জন্মদিনে সাক্ষাতের তাৎপর্য

প্রঃ মা যে সাধকদের জন্মদিনে তাদের সাক্ষাৎ দেন,

তার কি বিশেষ তাৎপর্য আছে?

উঃ জন্মদিন সম্বন্ধে: বিশ্বশক্তিগুলির নানা ক্রিয়ার মধ্যে সূর্য ও গ্রহাদিকে নিয়ে একটা গতিছন্দ থাকে। সেই অনুযায়ী প্রতি বছরের জন্মদিনটিতে প্রত্যেকের মধ্যে নূতনত্বের একটা সম্ভাবনা আসে যখন তার ভিতরের সত্তা কিছু বেশি নমনীয় হয়। সেই কারণে ঐ দিনটিতে মা প্রত্যেককে সাক্ষাৎ দান করেন।

১৮-৫-১৯৩৪

×

প্রঃ আপনি একবার লিখেছিলেন যে অন্যান্য দিন অপেক্ষা জন্মদিনটিতে দেহ সত্তা মায়ের কাছে বেশি গ্রহিষ্ণু হয়। তাই কি তিনি আমাদের জন্মদিনে বিশেষ আশীর্বাদ দেন?

উঃ ওটা দেহের জন্মদিন বা দেহ সম্পর্কিত নয়—জীবনের নতুন বছরের উদ্‌ঘাটন দিনে ভিতরে একটা নবজন্ম আসতে পারে। সেই অর্থেই মা জন্মদিনটিকে দেখেন।

৭-১০-১৯৩৬

স্বপ্নে মায়ের সঙ্গে সাক্ষাৎ

প্রঃ বহুদিন থেকে মায়ের কাছে যেতে ইচ্ছা হচ্ছিল কিন্তু সাক্ষাৎ চাইতে ইতস্তত করছিলাম। কাল রাত্রে স্বপ্নে তাঁর দেখা পেলাম ও তাঁর সঙ্গে কথা বললাম। তা কি সত্যই মাকে দেখেছি কিংবা তা স্বপ্নমানসের রচনা?

উঃ নিশ্চয়, মাকেই দেখেছ, আর চিন্তাতে দেখতে চেয়েছিলে বলেই দেখেছ।

৯-৬-১৯৩৫

×

প্রঃ অতিভৌতিকের স্তরে প্রায়ই আমি মায়ের কাছে যাই, এর কি অর্থ হতে পারে জানাবেন। আমার প্রাণ-সত্তাই কি তাঁর কাছে যায় বিশুদ্ধি ও শক্তিলাভ প্রভৃতির জন্য?

উঃ নিদ্রাতে ও স্বপ্নে এমন মায়ের কাছে যাওয়া সকল সাধকেরই হয়, একটু চেতন থাকলে। এমন কি যারা সাধক নয় বা মাকে চেনে না তারাও যায়, যদিও তা জানে না। প্রাণরাজ্যই হলো অতিভৌতিক স্তর। প্রাণসত্তা গিয়ে তার আপন স্তরে ঘুরে বেড়ায়, সেটা মনের বা চেতনার বা অনুভূতির উপর নির্ভর করে না।

১৩-৭-১৯৩৭

×

ওটা (মায়ের কাছে অতিভৌতিক স্তরে যাওয়া) কোনো উদ্দেশ্যেও হতে পারে কিংবা বিনা কোনো উদ্দেশ্যেও হতে পারে—তার কোনো নিয়ম নেই।

১৪-৭-১৯৩৭

×

প্রঃ আমি দুদিন স্বপ্নে দেখলাম যে মা নিজের হাতে আমাকে সূপ খেতে দিচ্ছেন আর আমি তাঁর পায়ে মাথা ঠেকাচ্ছি। এমন কেন দেখলাম, আর ঐ সূপ দেবার আধ্যাত্মিক অর্থ কি?

উঃ বাস্তব চেতনাতে আদানপ্রদানকে কিছু রূপ দেবার জন্যই ঐ সূপ দেওয়ার ব্যাপারটা ঘটেছে, যাতে সাধক মায়ের কাছে বাস্তব কিছু পেলে। হয়তো আগেকার কোনো অনুষঙ্গ থেকে তোমার বাস্তব চেতনা কিছু চাইলে স্বপ্নে ঐরকম জিনিস পাচ্ছে।

২৭-৭-১৯৩৩

ধ্যানের মধ্যে মায়ের ক্রিয়া

আমি আশ্রমের মন সম্বন্ধে যখন বলেছি তখন তা সংক্ষেপে "আশ্রমবাসীদের মনগুলির" কথাই বলেছি, সমষ্টিগত মন নয়। কিন্তু ধ্যানের সময়ে মায়ের যা ক্রিয়া তা সমষ্টিগত এবং ব্যক্তিগত। তিনি ঐ সময়ে আশ্রম আবহাওয়ার মধ্যে সত্য চেতনাকে নামিয়ে আনতে চেষ্টা করেন—কারণ সাধকদের মন ও প্রাণসত্তার দ্বারা তখন একটা সাধারণ আবহাওয়া তৈরি হয়। সন্ধ্যার ধ্যানের ঐ অল্প সময়ের মধ্যে যখন সকলেই অবতরণ-মুখী শক্তির দিকে একাগ্র হয় তখন তিনি এই সুযোগটুকু নেন। সাধকদের তখন এই জানা উচিত যে তারা কেবল একাগ্র হয়ে গ্রহিষ্ণু হয়ে থাকবে, মায়ের দিকে উন্মীলিত হয়ে থাকবে, অন্য কিছু সে সময়ে নয়।

নভেম্বর ১৯৩৪

×

ধ্যানের সময় বসবার জায়গা নিয়ে,—সাধকদের মধ্যে সত্য চেতনা ও আলো নামিয়ে আনবার জন্যই মায়ের এই ধ্যান। এটাকে তিনি একটা বাহ্যরীতি রূপে দাঁড় করাতে চান না, কিংবা ওখানে কোনো ব্যক্তিগত প্রশ্নও আসতে দিতে চান না। কোনো বিষয়ে কোনো ব্যক্তিগত কামনা বা দাবী বা মনোভাব উদয় হয়ে যেন তাঁর উদ্দেশ্যের বিঘ্ন না ঘটায়, শুধুই থাকবে ধ্যান ও একাগ্রতা।

২-১১-১৯৩৪

×

মায়ের দৈহিক উপস্থিতির জন্য নয়, কিন্তু ধ্যানের সময়ে মায়ের একাগ্রতার প্রভাবেই যারা গ্রহিষ্ণু তাদের মধ্যে নীরব শান্তি প্রবেশ করে।

৬-৩-১৯৩৭

×

প্র ঃ আমি বোধ করতে থাকি যে মা যখন আমাদের ধ্যান দিতে ধ্যানের ঘরে নেমে আসেন তখন ঐ ধ্যানের ঘরের আবহাওয়াটি যেন আশ্রমের সকল বাড়িতেই ছড়িয়ে পড়ে। এ ধারণা কি আমার ঠিক হয়?

উ ঃ এটা স্বাভাবিক, কারণ মা যখন তাঁর আভ্যন্তরীণ ক্রিয়াতে একাগ্র হন তখন তাঁর অভ্যাসমত আপনা হতেই তিনি তাঁর চেতনাকে সমগ্র আশ্রম জুড়ে বিস্তৃত ক'রে দেন। সুতরাং যার সূক্ষ্মবোধ থাকে সে আশ্রমের সর্বত্রই সেটা অনুভব করতে পারবে, তবে হয়তো সন্ধ্যা ধ্যানের সময় তা আশ্রমের কাছাকাছি বাড়িগুলিতেই আরো স্পষ্টতর ভাবে বোধ করা যাবে।

৭-১১-১৯৩৪

দর্শন ও প্রণামের সমুচিত প্রণিধান

দৈহিক সংস্পর্শকে (যেমন দশনে ও প্রণামের স্পর্শ) দিব্য প্রেম ও পূজাকে বাড়িয়ে তোলার কাজে লাগানো যেতে পারে; ওতে যে মানব দুর্বলতাকে অনুগ্রহ করা হয় তাও নয়, আর চৈত্যের পথে ওর যে কোনো স্থান নেই তাও নয়। বরং ওর দ্বারা ভগবৎ অভিমুখী হয়ে কিছু আলো পাওয়া এবং চৈত্য সংস্পর্শ বাস্তব হতে পারা সম্ভব হয়, সুতরাং ঠিক ভাবে গ্রহণ করতে এবং কাজে লাগাতে জানলে ওতে লাভ আছে। কিন্তু যদি এই জিনিসটির কেউ অপব্যবহার করে, কিংবা ওর মধ্যে থাকে অনা-গ্রহ বা জড়তা বা বিরোধিতা বা বিদ্রোহ ভাব, বা কোনো স্থূল কামনা, তাহলে ওর কোনো কাজ হয় না এবং বিপরীত কাজও হতে পারে—সেই কারণেই মা যাকে তাকে হাল্কা ভাবে এব মধ্যে আসতে দিতে চান না।

×

প্রণামের অনুষ্ঠানকে কেউই যেন নির্ধারিত নিয়ম হিসাবে কিংবা অবশ্য পালনীয় উৎসব হিসাবে না দেখে আর এতে আসতে বাধ্য বলে মনে না করে। ওর উদ্দেশ্য এই নয় যে সাধকেরা প্রত্যহ এসে মাকে এই ভাবে

অর্চনা করবে, কিন্তু ওর উদ্দেশ্য এই যে তারা মায়ের কাছে আশীর্বাদ নেবে এবং যে যেমন গ্রহিষ্ণু সে তেমনি ভাবে মায়ের সাহায্য বা প্রভাব-টুকুও পেয়ে যাবে। তাই ঐ সময়ে প্রত্যেকের পক্ষে শান্ত ও অবহিত থাকা দরকার।

×

তোমার কাছে যদি দর্শনের কোনো মূল্য থাকে তবে তখন নত হয়ে থাকাই ভালো। আর তাঁকে প্রত্যহ দেখা যদি ডাল ভাত খাবার মতো নিত্যকার ব্যাপার হয়, তাহলে কিছু বলবার নেই।

×

দর্শনের ফল পেতে হলে নিজেকে শান্ত ও সংযত ক'রে উন্মুক্ত থেকে মা তোমাকে যা দিলেন তা গ্রহণ করবে।

১২-২-১৯৩৭

অন্যেদের প্রণাম করার ভুল নির্দেশ

অন্যেদের প্রণাম করার নির্দেশ ঠিক নয়। মাকে যেমন ভাব নিয়ে প্রণাম করতে যাওয়া হয় তেমনি ভাবে অন্য কাউকে প্রণম্যের স্থান দেওয়া ঠিক নয়।

২৭-৭-১৯৩৪

প্রণাম ও মায়ের সংস্পর্শ

মায়ের সংস্পর্শ দিবারাত্র সকল সময়েই রয়েছে। নিজের অন্তরে যদি সারাদিন সেই সংস্পর্শটি বজায় রাখো তাহলে প্রণামের ফল খুব ভালো হবে; কারণ তুমি ঠিকভাবে গ্রহিষ্ণু হয়েই থাকবে। আর যদি প্রণামের

উপরেই তোমার সারা দিনটা নির্ভর করে, কখন বাহ্য স্পর্শটুকু পাবে তারই উপরে তোমার ভিতরকার অবস্থা নির্ভর করে, তাহলে উল্টোপাল্টা জিনিস হয়ে দাঁড়ায়। তোমার মন ও প্রাণ এই মৌলিক রকমের ভুল করছে তাই এমন কষ্ট পাচ্ছ।

১৬-৩-১৯৩৫

×

মায়ের দেখা না পেয়েও যদি তাঁর আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শ অনুভব করতে পারো তাহলে যখন তাঁর দৈহিক সংস্পর্শ মিলবে তখন তা সক্রিয় হয়ে তার প্রকৃত মূল্য উপলব্ধি করবে। নতুবা ঐ বাহ্য সংস্পর্শ হয়ে দাঁড়াবে একটা কৃত্রিম উত্তেজক স্বরূপ কিংবা নিজের লাভের জন্য মায়ের থেকে কিছু প্রাণশক্তি টেনে নেওয়া।

২-৩-১৯৩৭

×

ওরা যে দৈহিক সংস্পর্শের উপর এতই নির্ভরশীল যে ওটি না পেলে তাদের কিছুই হয় না, তার মানে এই যে তারা ওটিকে নিজেদের আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শে পরিণত করেনি; তা যদি আনতে চেষ্টা করতো তাহলে এতগুলি বছরের পর তা নিশ্চিত হয়ে যেতো। কেবল আভ্যন্তরীণ একাগ্রতা ও আস্পৃহার দ্বারাই আভ্যন্তরীণ সংস্পর্শ স্থাপিত হয়, শুধুমাত্র দৈনন্দিন বাহ্য প্রণামের দ্বারা নয়। অধিকাংশ লোক তাই করে, তারা মায়ের থেকে কিছু প্রাণশক্তি টেনে নিয়ে তাতেই নির্ভর ক'রে থেকে যায়——কিন্তু প্রণামের উদ্দেশ্য তা নয়।

৪-৩-১৯৩৭

×

হাঁ, কিন্তু তোমার প্রাণসত্তার এটা খুব নির্বোধ রকমের পরীক্ষা। মায়ের দেখা পাও বা না পাও, তোমার সাধনা যদি ঠিক ভাবে চলতে থাকে তার

মানে তাহলে একটা চৈত্য সম্বন্ধ স্থাপিত হয়ে কাজ করছে, যা বাহ্য সংস্পর্শের উপর নির্ভরশীল নয়। কিন্তু তোমার প্রাণসত্তা ভাবছে যে মায়ের দেখা যেদিন পেলে না সেদিন সাধনাও কমে যাবে, কিন্তু তার মানে এই হবে যে তোমার প্রেম ভক্তি ঐ দৈহিক স্পর্শের উত্তেজনার উপরেই নির্ভর করছে। প্রেম ও ভক্তির সব চেয়ে বড়ো পরীক্ষা এই যে তা দর্শনেও যেমন জ্বলন্ত থাকবে বহুকালের অদর্শনেও তাই থাকবে। প্রণামের দিনে ও প্রণামবিহীন দিনে যদি তোমার সাধনা একই ভাবে চলে, তার মানে এই নয় যে তোমার প্রেম ভালোবাসা তাহলে কিছু নেই, বরং তাতে এই বোঝায় যে তা সকল অবস্থাতেই সমান তেজে স্বয়ংক্রিয়।

৮-৬-১৯৩৬

×

প্র ঃ আশ্চর্য এই যে মা যখন আমাদের সঙ্গে কথা বলেন তখনকার চেয়েও যখন প্রণামের সময় তখন তাঁকে আরো বেশি কাছে পাই। একি স্থূল মনের দোষ?

উ ঃ হাঁ—অন্ততপক্ষে দেহ চেতনার কোনো অংশের।

৩০-৪-১৯৩৪

মায়ের দান দুই ভাবে

দুইরকম ভাবে মা দিয়ে থাকেন। চোখের দ্বারা তিনি দেন চৈত্য সত্তাকে, আর তাঁর হাতের দ্বারা দেন স্থূল দেহকে।

২৯-৯-১৯৩২

×

নিশ্চয়, সময় নিয়ে কিছু যায় আসে না। এক ঘন্টার স্পর্শই হোক বা এক মুহূর্তের স্পর্শই হোক—এতেও যতখানি ওতেও ততখানি দেওয়া

যায়।

১৮-৪-১৯৩৫

মায়ের ফুল দেবার তাৎপর্য

প্রঃ প্রত্যেক দিন প্রণামের সময় মা যে ফুল দেন তার তাৎপর্য কি?

উঃ ফুলটি যে ভাবের প্রতীক তারই উপলব্ধি কল্লে সাহায্য করতে।

২৮-৪-১৯৩৩

×

প্রঃ ফুল কি প্রতীক ছাড়া আর কিছু নয়? নীরবতার প্রতীক হয়ে তা কি নীরবতার উপলব্ধির পক্ষে সাহায্য করতে পারে?

উঃ শুধু প্রতীক নয়, মা তাতে নিজের শক্তি প্রয়োগ করলে তখন তা আরো কিছু হয়। তোমার যদি গ্রহিষ্ণুতা থাকে তাহলে তুমি ফুলটি পেলে তার সাফল্য খুব জোরালো হবে।

১৯-৭-১৯৩৭

×

প্রঃ আমাদের মন যেমন ফুল পেতে প্রত্যাশা করে তা তো মায়ের কাছে পাই না।

উঃ তা পাবে না—কারণ মন বাছে তার নিজের পছন্দমত কিংবা ধারণামত যে কি পাওয়া তার দরকার; কিন্তু মা তাঁর বোধির পর্যবেক্ষণ

থেকে যেটা দরকার দেখেন সেই ফুলই বাছেন।

৯-৭-১৯৩৪

প্রণামে মায়ের হাসি ও স্পর্শ সম্বন্ধে ভুল ধারণা

মা বিভিন্ন ব্যক্তির সঙ্গে বিভিন্ন আচরণ করেন, তা কোনো নির্দিষ্ট মানসিক নিয়মে নয়, যার যেমন প্রকৃতি ও প্রয়োজন তদনুযায়ী। যন্ত্র ব্যবহারের মতো সকলের সঙ্গে যে একই রকম ব্যবহার করবেন, সেটা অসঙ্গত। কিন্তু তার মানে এই নয় যে একজনকে অন্যের চেয়ে বেশি স্নেহ করেন বলেই অমন বিভিন্নতা হয়, কিংবা বেশি ভালো ও কম ভালো সাধকদের মধ্যে তাঁর স্পর্শদানের বিভিন্নতা হয়। সাধকরা নিজেদের অজ্ঞানতা ও অহংভাবে পরিপূর্ণ থাকে বলেই এই রকম মনে করে। মা কাকে কম আর কাকে বেশি অনুগ্রহ করছেন তাই নিয়ে ভাবার এবং লক্ষ্য করতে থাকার বদলে প্রণামের সময় তাদের উচিত মায়ের প্রভাবকে আপন আপন আধ্যাত্মিক প্রয়োজনে গ্রহণ করতে থাকা। প্রণামের উদ্দেশ্যই তাই, এসব জিনিস নয়, যার সাধনার সঙ্গে কোনো সম্পর্কই নেই।

হিংসা ও ঈর্ষা মানব প্রকৃতির খুব সাধারণ জিনিস, কিন্তু সাধকের পক্ষে এসব জিনিস দূর ক'রে দেওয়া চাই। নতুবা সে সাধক হয়েছে কেন? সে এখানে আছে ভগবানকে পেতে--কিন্তু ভগবৎ প্রাপ্তির মধ্যে হিংসা, ঈর্ষা, রাগ প্রভৃতির কোনো স্থান নেই। ওগুলি হলো অহংএর ক্রিয়া যা ভগবৎ মিলনের প্রতিবন্ধক স্বরূপ। এই কথাই সর্বদা স্মরণ রাখা উচিত যে তুমি ভগবানের জন্য এসেছ আর তাকেই জীবনের একমাত্র লক্ষ্য ও নিয়ন্তা ক'রে রাখবে। মাকে তাতেই সব চেয়ে বেশি সন্তুষ্ট করা হবে; এই সব ঈর্ষা হিংসা ও তাঁর অনুগ্রহলাভের প্রতিযোগিতা কেবল তাঁকে অসুখী ও পীড়িতই করে।

৩১-১০-১৯৩৫

×

মা কেমন ভাবে চাইছেন ও হাত দিয়ে কেমন আশীর্বাদ করছেন তাই

নিয়ে আশ্রমের মধ্যে যে ধারণা জন্মেছে তা নিতান্তই মিথ্যা, অযৌক্তিক, ও মূঢ়। আমি সকলকে একশোবার লিখেছি যে ওটা একেবারেই ভুল কথা এবং অনর্থক গণ্ডগোল বাধাবার জন্য বিরোধী শক্তিদের মিথ্যা প্ররোচনা। কোনো সাধক যা কিছুই ক'রে থাক তার জন্য বা আপন অসন্তোষ জ্ঞাপনের জন্য মা কখনই প্রণামেব সময় হাসতে বিরত হন না কিংবা আশীর্বাদ দিতে কোনো তারতম্য করেন না। লোকে যেমন ধারণা করে তেমনভাবে তিনি তাঁর হাসি ও আশীর্বাদের ওজন ক'রে দেন না, যেন সাধকদের ভালো ও মন্দ আচরণের পরীক্ষাতে কমবেশি নম্বর দেবার মতো, যেমন স্কুলের ছাত্রদের পরীক্ষাতে দেওয়া হয়ে থাকে। এসব ধারণা একেবারেই অসঙ্গত ও অনাধ্যাত্মিক। এই আশ্রমটি ছেলেদের ক্লাস নয়, আর যোগও প্রতি-যোগিতার পরীক্ষা নয়। এগুলি সবই হলো সংকীর্ণ মনের এবং প্রাণগত অহং ও কামনার সৃষ্টি। সাধকরা যদি প্রকৃতই উন্নতি করতে চায় তাহলে এসব ধারণা তাদের মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। তথাপি আমি যা কিছুই লিখি না কেন তারা এই ধারণাকেই আঁকড়ে রেখেছে, তাদের মন মিথ্যাকে এতই পছন্দ করে। এসব কথা মন থেকে দূর ক'রে দাও। প্রণামের সময় মা সাধককে তাঁর শক্তি দিয়ে সাহায্য করেন––তার সেটুকু নীরবে ও সরলভাবে গ্রহণ করা উচিত, নির্বোধ ধারণা মনে রেখে সে সুযোগকে নষ্ট হতে দেওয়া উচিত নয় কিংবা মায়ের হাত ও হাসি কার বেলাতে কিরকম হচ্ছে তাও লক্ষ্য করতে থাকা উচিত নয়। এসব ছেড়ে দাও।

৮-১২-১৯৩৬

×

প্রণামের পরে যে অস্থির হয়ে ওঠে সে তোমার মন নয়, সে হলো নিম্ন প্রাণসত্তা––আর তার পরেই বাকী সব ধারণাগুলো এসে হাজির হয়, কারণ ঐ অস্থিরতার দ্বারা সেগুলির জন্য দরজা খুলে গেছে। সাধনাতে বিঘ্ন ঘটাবার জন্য বিরোধী শক্তিদের এই কতকগুলি বাঁধা কৌশল আছে, তার মধ্যে একটি হলো ঐ নিম্ন প্রাণসত্তাতে ধাবণা এনে দেওয়া যে প্রণামে মায়ের পুরো আশীর্বাদ পাইনি কিংবা মা হাসেননি বা তেমন সুন্দর ক'রে হাসেননি, কিংবা মায়ের মুখখানা তখন যেন বেজায় গম্ভীর হয়ে গেল।

আর অমন বোধ করতে থাকলেই তৎক্ষণাৎ মনের মধ্যে ভিড় ক'রে আসে বিদ্রোহ নতুবা অসন্তোষ নতুবা হতাশা। ওর একমাত্র ওষুধ হলো ধৈর্যের সঙ্গে অমন ধারণাকে অস্বীকার করতে থাকা একথা নিশ্চিত জেনে যে ওটা হলো বিঘ্নকারী শত্রুর দেওয়া এক ফোঁটা বিষ।

২৮-৭-১৯৩৬

×

মা যে তোমার প্রতি "অমনোযোগী" বা "কঠোর" হয়েছিলেন এটা নিশ্চয়ই তোমার মনের কল্পনা। বরঞ্চ আশীর্বাদ দেবার সময় মা তোমার উপর বিশেষ একাগ্রতাই রেখেছিলেন, তোমাকে সাহায্যদান করতে। এমন কয়েকজন সাধক আছে যারা মাকে ঐরূপ করতে দেখলেই বলবে, "আজ কেন আপনি আমার উপর অমন অসন্তুষ্ট আর নির্দয় হলেন?" আবার অনেকে আছে যারা মায়ের ভঙ্গীর একটু ইতরবিশেষ দেখলেই ধরে নেয় যে মা ইচ্ছা করেই তাদের প্রতি অগ্রাহ্যতা বা বিরক্তি হেতু অমন করলেন; আবার তিনি যদি উৎসাহ দিতে একটু বেশি হাসেন, অমনি তারা তাঁকে চিঠি লেখে যে সেদিন তাদের প্রতি খুবই গম্ভীর ছিলেন, মোটে ভালো ক'রে হাসলেন না। এ জিনিসের ছোঁয়াচ লেগে যেন তুমি তাদের দলে ভিড়ে যেও না; কারণ ওতে আমাদের সহায়তার পক্ষে দুর্দান্ত বাধাস্বরূপ হয় এবং প্রাণসত্তার মধ্যে দারুণ অস্বস্তি জন্মাবার সুযোগ ঘটায়। পুরো আস্থা ও বিশ্বাস নিয়ে মায়ের সাহায্য পাবার দিকে সহজভাবে নিজেকে খুলে রাখো, তাহলেই আর বোধ করবে না যে মা তোমার থেকে অনেক তফাতে।

তুমি যে ক-কে কিছু বলেছ সে কথা মা তখন জানতেন না। সুতরাং মা যে তার জন্যই তোমার উপর অসন্তুষ্ট হলেন একথা ভিত্তিহীন। মা যে সাধকদের উপর অসন্তুষ্ট ও রাগিত হন আর প্রণামের সময় তাদের তা জানিয়ে দেন এ একটা মস্ত ভুল ধারণা। ভগবানের সম্বন্ধে বা জগন্মাতার সম্বন্ধে এমন একটা ভ্রান্তিকে কিছুতেই নিজের মধ্যে আসতে দিও না।

৫-৭-১৯৩৫

×

প্রণামের সময় মা যদি না হাসেন, সেটা অসন্তোষ থেকে নয়, তার একটা কিছু কারণ থাকে যার সঙ্গে সাধকের কাজের কোনো সম্পর্ক নেই––হয়তো কোথাও কিছু একটা হচ্ছে সেই দিকে তিনি একাগ্র হয়েছেন। কিন্তু ওতে কিছু যায় আসে না, যেমন তুমিও বলেছ,––আসল কথা হলো তোমার যা নেবার তা নিয়ে নাও।

৪-১১-১৯৩৪

×

তোমার ভুল হচ্ছে এমন ভাবা যে সাধকের উপর নারাজ বা অসন্তুষ্ট হওয়াতেই মা তখন হাসেননি। অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ওটি হলো তাঁর আভ্যন্তরীণ তন্ময়তা বা একাগ্রতার লক্ষণ। যখনকার কথা তুমি বলেছ তখন মা তোমার ভিতরকার আত্মাকে একটি প্রশ্ন করছিলেন।

৩১-৭-১৯৩৮

×

প্রণামের সময় মায়ের গম্ভীর হয়ে পড়া মানে মা তখন কোনো একটা কাজ নিয়ে তাতে তন্ময় হয়ে গেছেন কিংবা প্রায়ই এমন হয় যে আবহাওয়াতে কোনো বিরুদ্ধ আক্রমণ ঘটেছে।

১৯-৪-১৯৩৫

×

তোমার প্রাণসত্তার অমন দাবী অবশ্যই তুমি ত্যাগ করবে, ওতে তোমার সাধনাতে বিঘ্ন ঘটাচ্ছে। মা সকলকেই তাঁর হাসি উপহার দেন, কাউকে দিলেন আর কাউকে দিলেন না এমন কখনো হয় না। যারা অমন ভাবে তারা নিশ্চয়ই নিজেদের প্রাণসত্তার অস্থিরতা বা অনর্থক দাবী, কিংবা ঈর্ষা, হিংসা, প্রতিযোগিতার দরুন দৃষ্টিবিভ্রম আনে।

২৭-২-১৯৩৩

×

ঐদিন মা কারো দিকে চেয়েই হাসেননি, কেবল তোমার বেলাতেই নয়। কোনো একটা শক্তি তাঁর মধ্যে কাজ করছিল যা সাধারণ জিনিস ছিল না।

১০-৪-১৯৩৪

×

মা যে প্রণামের সময় মাথায় হাত রাখেননি, তা অসন্তোষের জন্য নয়, তার অনেক কারণ থাকতে পারে। লোকে যেমন মনে করে তা সম্পূর্ণ ভুল। এক সময় মা কোনো মেয়ে সাধকের মাথায় উপর্যুপরি দুদিনই হাত রাখেননি। লোকে সেই মেয়েটিকে বিদ্রূপ করতে লাগল, তাকে হীন চোখে দেখতে লাগল। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে মেয়েটি তখন গভীর উপলব্ধির মধ্যে ছিল আর প্রণামের সময় মায়ের কাছে অন্যদিনের চেয়ে অনেক বেশি শক্তি লাভ করছিল। সুতরাং ঐসব ধারণা একেবারেই ভুল।

২-৮-১৯৩৩

×

ও কথা সত্য নয়। অনেক সময় মা হাসেনও না কিংবা মাথাতে হাতও রাখেন না, সে সময়ে সমাধির অবস্থা হয় বলে। কিন্তু সাধকের গ্রহিষ্ণুতা ঠিক থাকলে তখন সে মায়ের কাছে অনেক বেশি পেয়ে যায়।

×

মা কেমন রহস্যজনক ভাবে হেসেছিলেন এটা তোমার কল্পনা—মা নিজে বললেন যে তিনি তখন তোমার প্রতি খুব সদয় ভাবেই হেসেছিলেন তোমাকে বিশেষরকম সাহায্য দেবার ইচ্ছা নিয়ে। তোমাকে আগেই বলেছি যে তোমার ও মায়ের মধ্যে কোনোরকম কল্পনাকে আসতে দিও না, কারণ তাতে মায়ের সাহায্যকে ঠেলে সরিয়ে দেয়। যেসব প্রাণময় শক্তিরা তোমাকে বিরক্ত করছে তারাই তোমার মধ্যে ঐসব কল্পনা যোগাচ্ছে যাতে তুমি মুক্ত হতে না পারো। মায়ের ও আমার সাহায্য তোমার জন্য আছেই

--কেবল নিজেকে খুলে রাখলেই তুমি তা গ্রহণ করতে পারবে।

২৭-৩-১৯৩৩

×

মা রাগ করবেন এমন কথা তুমি ভাবো কেন? আমরা নিজেরাই তোমাকে বলে দিয়েছি যে কোনো কথা গোপন না রেখে সমস্তই আমাদের জানাবে, সুতরাং তুমি যাই কেন লেখ তাতে মা বিরক্ত হবেন না। আর তিনি সাধনার বাধা ও মানব প্রকৃতি সম্বন্ধে খুব ভালোই জানেন, সুতরাং প্রকৃত আস্পৃহা ও শুভ ইচ্ছা থাকলে, যেমন তোমার রয়েছে, তাতে সাময়িক পতন বা দোষত্রুটিতে সাধকের প্রতি মায়ের অনুগ্রহ কিছুমাত্র বদলায় না। মা বলেন যে তোমার মাথাতে কেবল অল্প একটু হাত ছুঁইয়েছিলেন এ তোমার ভুল ধারণা--বরাবর যেমন করেন তাই করেছেন, এমন কোনো কারণ নেই যাতে তার অদলবদল হবে।

১৭-৪-১৯৩৩

×

কোনো কিছু কারণেই যে মা তোমার প্রতি অসন্তুষ্ট এমন কথা মনে করার কারণ কি তা বুঝলাম না। তিনি তোমার প্রতি যেমন ছিলেন তেমনিই আছেন। কোনো ভুলও যদি তুমি ক'রে থাকো, মা কিন্তু আজকাল সকল ভুলকেই ছেড়ে দেন উপরের আলোর চাপ আর সাধকের চৈত্যসত্তার দ্বারা তা শোধরাবার জন্য। তুমি যে ক-এর কাছে ফরাসী শেখা ছেড়ে দিয়েছ তার জন্য বা ঐরূপ কোনো তুচ্ছ কারণে মা অসন্তুষ্ট হবেন, তাই কখনো হয়! তুমি ভাষাটা শেখো কিংবা ছেড়ে দাও তা নির্ভর করে তোমার মনের অবস্থা ও সাধনার অবস্থার উপর, কিন্তু ঐ কারণে মা অসন্তুষ্ট হলেন এটা মনে করা আশ্চর্যের কথা। এরূপ স্নায়ুদৌর্বল্য থেকে মিথ্যা কল্পনাকে প্রশ্রয় দিয়ে তোমার ভালো অবস্থাকে নষ্ট কোরো না। এর চেয়ে আরো বেশিরকম আস্থা রাখো, তোমার মনকে অমন অমূলক বিপত্তি রচনা করতে দিও না।

×

চায়ের জন্য মা একটুও বিরক্ত হননি, তা হবেন কেন? কোনো রাগও তিনি করেননি। তিনি তোমাকে দেখে আগের মতোই হেসেছেন---তুমি অন্যমনস্ক ছিলে বলে হয়তো লক্ষ্য করোনি। অতএব তোমার অমন দুঃখিত হবার কোনোই কারণ নেই---ও ভাব মন থেকে ঝেড়ে ফেল। ঐসব তুচ্ছ কারণে মা বিরক্ত হন না।

৩০-১২-১৯৩৩

×

হাঁ, তাই আমি বলছি, "মায়ের হাসা কিংবা না হাসার সঙ্গে তোমার কোনো সম্পর্ক নেই।" আরো বলছি, "কেবল মায়ের উপস্থিতির দ্বারাই তুমি নিজের সম্বন্ধে নিজে চেতন হও---মায়ের অসন্তোষের দ্বারাও নয় কিংবা বিষণ্ণ দৃষ্টির দ্বারাও নয়।"

×

তুমি যে দৃষ্টিকে 'ভয়' পাবে, মা সে দৃষ্টি দেবার কোনো কারণই হবে না। আর তোমার দিক থেকে এমন ধারণা তৈরি কোরো না যা প্রকৃতই নেই---অনেকে এখনও তাই করছে!

×

তোমার অতীতের প্রাণসত্তার বিরোধিতা থেকেই আসছে ঐসব অস্থিরতা আর মায়ের অসন্তোষ সম্বন্ধে ধারণা। কিন্তু মায়ের মনে তোমার সম্বন্ধে কোনোই অসন্তোষ হয়নি, সাধকের মনে এরূপ ধারণা করানো সেই বিরোধী শক্তিরই কাজ যে চায় যে সাধক ছেড়ে চলে যাক বা তার মধ্যে অস্বস্তি ঘটুক। এমনি একটা ভ্রান্তি আশ্রমের আবহাওয়াতে এসেছে, এটা ব্যক্তিগত প্রাণক্রিয়া নয় কিন্তু ঐ শক্তিরই কাজ যে চায় সাধনাকে নষ্ট করতে, যদি তা সম্ভব হয়। ঐ ভাবকে যদি তুমি আমল দাও তাহলে ওতে নানারকম কষ্ট ভোগ করতে হবে। বিশেষত ঘুমের অভাব হলে স্নায়ুগুলি ক্লিষ্ট হয়ে ঐসব ভাব আরো বেড়ে যায়---কারণ দেহচেতনার ভিতর দিয়েই

ওদের আক্রমণের সুবিধা, সে চেতনা তামসিক হলে তা আরো সহজ হয়।

১৫-৯-১৯৩৬

×

মা তোমার প্রতি একটুও বদলাননি বা নিরাশও হননি---নিজেরই মনের নিরাশ ভাব ও অযোগ্যতার ভাবকে তুমি মায়ের উপর আরোপ করছ। মা কিন্তু বদলাননি, তিনি জানেন তোমার প্রাণসত্তার দুর্বলতার কথা এবং আশা করেন যে তা তুমি কাটিয়ে উঠবে। চরিত্রের মধ্যে এমন কিছু দুর্বলতা থাকে যা সর্বোত্তম সাধকের পক্ষেও কাটিয়ে ওঠা কঠিন হচ্ছে, কিন্তু তাই বলে তা অসাধ্য নয়। কেবল চলে যাবার ঝোঁকটিকে আদৌ আমল দেবে না---কারণ আস্কারা পেলে বিরোধী শক্তিরা ঐ দিকেই জো'র দেয়। আর মায়ের শক্তির দিকে ঐ অংশকে খুলে রাখো, মায়ের স্নেহ যে তোমার প্রতি কম একথা ভুলে যাও কারণ প্রণামের সময় ঐ ধারণাই বিঘ্ন ঘটায়। আমাদের স্নেহ, সাহায্য, সমর্থন সব সময়েই রয়েছে ---তারই দিকে মন স্থির রেখে ঐসব চিন্তাকে মন থেকে দূর ক'রে দাও।

২৬-১-১৯৩৭

×

মা যথারীতি তোমার মাথায় হাত রেখেছিলেন। আর তিনি দেখেও ছিলেন যে তোমার বিশেষ রকম সাহায্য পাওয়া দরকার, তা তিনি দেবার চেষ্টাও করেছিলেন। কিন্তু ঐরূপ অবস্থা যখন তোমার আসে তখন তুমি এমনই নিশ্চেষ্ট নাচার হয়ে থাকো যে ঐ ভাবটি ছাড়া অন্য কোনো কিছুই তোমার মধ্যে ঢুকতে পারে না। আমাদের সমর্থন ও সাহায্য তোমার জন্য বরাবরই আছে; তাকে ফিরিয়ে নেবার কোনোই কারণ নেই। আশ্রমের মধ্যে কারো কোনো দুর্গতি ঘটলে তা আমাদের ও বিশেষত মায়ের ঘাড়েই পড়ে---সুতরাং কেউ কষ্ট পেলে আমরা খুশি হতে পারি এমন মনে করাই ভুল। দুঃখ কষ্ট, পীড়া, প্রাণসত্তার আবেগাদি (বিদ্রোহ, ক্রোধ, লালসা), এগুলো হলো আমাদের অভীষ্ট কাজের দারুণ বাধা। ওগুলিকে যত শীঘ্র দূর করাই আমাদের ইচ্ছা, থাকতে দেওয়া নয়।

যদি তোমার ঐ হতাশ ভাব থেকে নিজেকে বিচ্ছিন্ন ক'রে সরিয়ে নিতে পারতে, ওরই স্রোতে গা ভাসিয়ে না দিয়ে! তাহলে আমাদের সাহায্য তুমি কিছু অনুভব করতে পারতে আর বিরোধী আক্রমণের বিরুদ্ধে লড়তেও পারতে।

২৮-৬-১৯৩৫

×

মা আজ তোমাকে ঠেলে সরিয়ে দিলেন একথা একেবারেই মিথ্যা। কোনো কোনো দিন হয়তো তন্ময় থাকাতে তাঁর হাতটা কখন কি করছে তার অত খেয়াল থাকে না। কিন্তু আজ প্রণামের সময় তিনি তোমার সম্বন্ধে সজাগ ছিলেন, তোমার শান্তি স্থিরতা ও নিরাপত্তার জন্য তিনি শক্তি প্রয়োগ করছিলেন। হাতের ভঙ্গীটা যেমনই হোক বস্তুত এই কাজই তিনি করছিলেন। সে বিষয়ে কোনো ভুল নেই কারণ আজকের তাঁর উদ্দেশ্য ও ক্রিয়া সম্বন্ধে তিনি বিশেষ সচেতন। ব্যাপারটা এই হয়েছে যে তোমার ভিতরকার কোনো অংশ চাপ অনুভব ক'রে এটা তোমার বাহ্য মনকে বুঝিয়েছে যে মা তোমাকেই ঠেলে দিচ্ছেন, তোমার বাধাবিঘ্নকে নয়। এই এক দৃষ্টান্ত যার থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় যে সাধকরা কত সহজে মা যা করেন তার ঠিক উল্টোটা ভেবে নেয়। প্রায়ই এমন হয় যে মা যখন তাদের দুর্গতিকে হটিয়ে দেবার জন্য সাহায্য করতে খুব একাগ্র হয়ে ওঠেন, তার পরেই তারা তাঁকে লিখে জানায়, "আজ সকালে আপনি আমার প্রতি খুব গম্ভীর ও নারাজ ছিলেন"। এই সব ভুল প্রতিক্রিয়া দূর করার একটি-মাত্র উপায় হলো মায়ের উপর পুরো চৈত্য আস্থা স্থাপন করা, এইটি স্থির বিশ্বাস রাখা যে ভগবতী মা যাই করুন তাদের ভালোর জন্যই তা করছেন, বিরুদ্ধভাবে কখনই নয়। তাহলে এমন কিছুতেই হবে না। এই বিশ্বাস নিয়ে যারা থাকে তারা মায়ের একাগ্রতার পুরো সাহায্য পায়, তিনি নাই হাসুন বা হাত দিয়ে স্পর্শ নাই করুন। তাই আমি সাধকদের নিত্যই বলে থাকি যে প্রণামের সময় মায়ের চেহারা বা ক্রিয়া যেমনই হোক তার অর্থ নিজের মন থেকে ক'রে নিও না––কারণ তা নিশ্চয়ই ভুল হবে আর

তাই থেকে বিরোধী শক্তির আক্রমণের ও অহেতুক হতাশার দ্বার খুলে যাবে।

২৩-১-১৯৩৫

×

মায়ের হাসি ও স্পর্শ সম্বন্ধে ঐ বাঁকা মনোভাবকে দূর করতে হবে, কারণ ওটি হলো বিরোধী শক্তিদের এক বিশেষ অস্ত্র যার দ্বারা সাধকদের বিচলিত ক'রে তাদের উন্নতিকে বিঘ্নিত করা যায়। এমন অনেক দৃষ্টান্ত আমি দেখেছি যেখানে সাধক বেশ উচ্চ অনুভূতি পেয়ে এগিয়ে চলেছে এবং তার চেতনার মধ্যে পরিবর্তন আসছে, কিন্তু হঠাৎ এমনি একটা ধারণা এসে সমস্ত বিপর্যস্ত ক'রে দিয়ে রাগ, দুঃখ, হতাশার সৃষ্টি ক'রে ভিতরের কাজ নষ্ট ক'রে দিয়েছে। বেশির ভাগ ক্ষেত্রে এতে এমন সংবেদনমূলক বিভ্রম এনে দেয় যে মা যখন বিশেষভাবে ভালো করেই হাসেন কিংবা সকল শক্তি দিয়ে আশীর্বাদ দান করেন, তখনও তারা বলে, "আপনি হাসেননি, স্পর্শ দেননি কিংবা সামান্য একটু ছুঁলেন মাত্র"। আর এমন ঘটনাও হয়েছে, মা এসে আমাকে বললেন, "আজ দেখলাম যে ক বেচারা খুবই বিচলিত, তার মধ্যে বিপরীত ইঙ্গিত আসছে, তাই আজ তার দিকে চেয়ে আমি খুব মিষ্টি ক'রে হেসে আশীর্বাদ দিলাম,"—আর তার ঠিক পরেই ওরই কাছ থেকে উল্টো রকমের চিঠি এলো, "আপনি আজ হাসেন-নি, ইত্যাদি"। আর সকলেই অমনিভাবে তোমরা মায়েরই ওপর দোষ চাপাও, কারণ নিজের চোখে তাই যখন দেখেছ, চোখকে তো ফাঁকি দেওয়া যাবে না! কিন্তু এমন কি যদি হাসি বা স্পর্শ কিছু কমই হয় আর তার মধ্যে কোনো মতলব না থাকে তাহলে তাতেও অমন দোষ দেওয়া উচিত হয় না, কারণ আমরা নিত্যই তোমাদের বলছি যে আমাদের ওরূপ কোনো মতলব থাকে না। তবে তার একটা কারণ এই যে সাধকরা প্রায়ই মাকে যেমন ভালোবাসে তা হলো সাধারণ প্রাণগত মানবীয় ভালোবাসার ক্রিয়া, আর তেমন ধরনের ভালোবাসার পদে পদে থাকে সন্দেহ, ভুল বোঝা, ঈর্ষা, ক্রোধ, হতাশা। কিন্তু যোগের বেলাতে তা নিতান্তই অবাঞ্ছিত—এই যোগেতে মায়ের উপর আস্থা, তাঁর দিব্য প্রেম সম্বন্ধে নিশ্চয়তা থাকা খুবই জরুরী; যা কিছুই তাকে অস্বীকার করবে তার দ্বারা ভুল প্রতিক্রিয়া ও বিঘ্নের দরজা খুলে যাবে। তবে প্রাণগত ভালোবাসা যে থাকবে না সে

কথা নয়, কিন্তু তা ঐ সকল প্রতিক্রিয়া থেকে মুক্ত হয়ে চৈত্য সত্তার সশ্রদ্ধ ও আস্থাপূর্ণ আত্মদানে পর্যবসিত হওয়া চাই। তবেই পুরোপুরি উন্নতি আসবে।

২৯-৬-১৯৩৫

×

ওসব জিনিসকে একেবারে প্রত্যাখ্যান করা দরকার। ওগুলি উদয় হলে তখন চেতনাকে তা এমনই মোচড় দেয় যে দৃষ্টিকে এবং মনো-ভাবকেও ভুল বাৎলাতে থাকে। মা নিত্যই এসে বলেন যে তিনি যাদের দিকে হেসেছেন তারা এসে বলেছে যে তিনি কট্‌মট্‌ করে চেয়েছেন কিংবা তিনি অসন্তুষ্ট না থাকলেও তারা বলেছে যে তিনি অসন্তুষ্ট ছিলেন, আর তাই ভেবে তারা বিগ্‌ড়ে গেছে।

১০-৪-১৯৩৩

মায়ের অসুস্থতার হেতু

শীঘ্রই তোমাকে লিখব ভেবেছিলাম, কিন্তু পেরে উঠিনি। কিন্তু আজ সকালে চিঠি দেবো বলেছিলাম, তাই আপাতত ঐ বিষয়টিতে বলে রাখি, আমি ওকথা বলিনি যে তুমি কিংবা সাধকরা সাধারণভাবে মায়ের অসুস্থ-তার জন্য কোনো প্রকারে দায়ী। আরো একজন ব্যক্তিগত দিক থেকে এই কথা লিখেছিল, তাকেও জানিয়েছি যে মায়ের অসুস্থতা ঘটেছে বিশ্বশক্তিদের সঙ্গে সংঘাতের ফলে, যাদের কাজ ব্যক্তিগত বা সমষ্টিগত সকল ক্রিয়ার গণ্ডী ছাড়িয়ে। মায়ের অতিরিক্ত ক্লিষ্টতার কথা যা লিখেছিলাম তা হলো তাঁর অতিরিক্ত কাজের পুনঃপ্রয়াস সম্বন্ধে––যাতে এমন অবস্থার সৃষ্টি হয় যে তাঁর কাজ অতঃপর ভালোভাবে সম্পন্ন হতে পারে, ভবিষ্যতে ঐসব শক্তি আর কোনো সুযোগ পেতে না পারে। বিগত দিনে অবস্থা খুবই দুঃসহ ছিল নানা অপরিহার্য ব্যাপার এসে পড়াতে, কিন্তু তার জন্য আমি কাউকেই দায়ী করি না; কিন্তু এমন সাধনা নেমে এসেছে নিতান্ত বাস্তবের স্তরে যেখানে বিরোধী শক্তিদের পক্ষে আঘাত করা খুবই সম্ভব, তাই এখন

একটা পরিবর্তন দরকার যা সব চেয়ে ভালো ভাবে হতে পারে সাধকদের আভ্যন্তরিক অবস্থার পরিবর্তনে, কারণ তাতেই বাহ্য অবস্থাও সহজ হবে-- যতদিন না অতিমানসের আলো এবং শক্তি্র অবতরণ ঘটে। চিঠির শেষপ্রান্তে এর চেয়ে আর বেশি লেখা গেল না।

১৬-১১-১৯৩১

×

মায়ের অসুস্থতার কথা নিয়ে আমি এখনও কিছু লিখিনি, তার কারণ এতে অনেক কথাই ভাববার আছে, যারা এই ধরনের কাজের কেন্দ্রে রয়েছে তাদের কেমনতরো হতে হবে, মানবীয় বা পার্থিব প্রকৃতি ও তার সংকীর্ণতা নিয়ে কি কাজ তাদের করতে হবে, আর রূপান্তর আনার কতখানি ভার তাদের বহন করতে হবে। এসব কথা মনের দ্বারা বোঝাও খুব কঠিন আর আমার পক্ষে তা লিখে বোঝানোও কঠিন, বিশেষত তাদের বোঝবার পক্ষে যারা আমাদের মতো চেতনা বা আমাদের অনুভূতি পায়নি। হয়তো লেখা দরকার, কিন্তু তার উপযুক্ত ভাষাভঙ্গী জানা নেই, সময়ও নেই।

১৯-১১-১৯৩১

×

সাধকের পক্ষে মায়ের উপর আস্থা নিয়ে আরোগ্য হতে পারা অনেক সহজ, কিন্তু মায়ের নিজের রোগমুক্ত থাকার বেলা সে কথা নয়---কারণ তিনি যে কাজ নিয়েছেন তাতে তাঁকে সাধকদের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যেতে হয়েছে, অর্থাৎ তাঁকে যাতে তাদের সকল বিঘ্নবিপদকে সামলাতে হয় আর তাদের প্রকৃতির সকল বিষকে নিজের মধ্যে গ্রহণ করতে হয়, তা ছাড়াও সমগ্র বিশ্বপ্রকৃতির যত কিছু বিপত্তিকে, এমন কি মৃত্যু ও রোগপীড়া সমেত বিতাড়িত ক'রে দেবার জন্য তাঁকে কাজ করতে হয়। তিনি যদি এ ভার না নিতেন তাহলে এখানে একজন সাধকও যোগ করতে সক্ষম হতো না। এখানে দেবতাকেও এসে মানবতা নিতে হয় যাতে মানব দেবতাতে উঠতে পারে। এ খুবই সহজ সত্য, কিন্তু কেউই যেন এটা বোঝে

না যে দেবতা এখানে এসে তা করলেও সে দেবতাই থাকে।

×

> প্রঃ আশ্রমের সকলে মনে করছে যে তাদের যত কিছু কষ্ট ও ব্যাধি মা নিজের মধ্যে নিচ্ছেন বলেই তাঁকে মাঝে মাঝে ভুগতে হচ্ছে। এমন হতে থাকলে বহু সাধকের এই সব জিনিস মায়ের উপর আরো ভিড় ক'রে আসবে। আমার একটা ইচ্ছা হচ্ছে, ঐসব কষ্ট ও ব্যাধির ভার যদি আমিও খানিকটা গ্রহণ করি এবং মায়ের সঙ্গে সঙ্গে খুশি মনে সেগুলো সহ্য করতে থাকি?

উঃ খুশি মনে? তোমার পক্ষে এবং আমাদের পক্ষেও তা খুশির কথা হবে না।

ব্যাপারটা যেমন বলেছ ঠিক তেমন নয়। মা তাঁর কাজের জন্য আপন সত্তার মধ্যে সকল সাধককে আশ্রয় দিয়েছেন; কেবল নির্ব্যক্তিক ভাবে নয়, ব্যক্তিগত ভাবে তাদের নিজের ভিতরে গ্রহণ করাতে তাদের যা কিছু দোষত্রুটি ও রোগপীড়া এমন ভাবে তাঁর উপর পড়েছে যা হতে পারত না যদি তিনি স্বতন্ত্রভাবে আত্মরক্ষা করা জিনিসটাও পরিত্যাগ না করতেন। কেবল তো রোগের আক্রমণই তাঁর দেহের উপর নয়—কোন দিক থেকে কেন আসছে দেখে তিনি তাকে ঝেড়ে ফেলতে পারেন—কিন্তু আরো আছে তাদের আভ্যন্তরীণ বিপত্তি, তাদের বিদ্রোহ, ক্রোধ, ঘৃণা তাঁরই বিরুদ্ধে, এগুলির কুফল আরো বেশি। আভ্যন্তরীণ বিপত্তিকে জয় করা যায় কিন্তু ঐগুলি বিপজ্জনক; আর জড়বস্তু এবং দেহ আমাদের যোগের পক্ষে খুবই দুর্বল স্থান, কারণ আজ পর্যন্ত আধ্যাত্মিক শক্তি ওগুলিকে জয় করেনি, প্রাচীন যোগে ঐ দিকটা ছেড়ে দিয়ে কেবল মন প্রাণের শক্তি নিয়েই কাজ করেছে, সমগ্র আধ্যাত্মিক শক্তি নয়। তাই এই আশ্রমের আবহাওয়াতে মায়ের কঠিন অসুখ হবার পরে আমি তাঁকে আংশিক বিশ্রাম নিতে বলেছি যাতে তাঁর উপর চাপটা কমে যায়। অবশ্য দৈহিকের দিকে জয় হলে একটা বিরাট পরিবর্তন আসবে, কিন্তু এখনও তার জন্য সংগ্রাম

চলছে।

৩১-৩-১৯৩৪

×

প্র ঃ আমাদের রূপান্তর সাধনার ব্যাপারে প্রত্যেক সাধকের মধ্যে যে এই সব প্রতিরোধ, প্রতিক্রিয়া, বিপত্তি ও বিদ্রোহ এসে পড়বে এটা কি অপরিহার্য নয়? এমন কোনো উপায় কি নেই যাতে সাধনার গোড়া থেকেই এসব জিনিসকে বাদ করা যায়, তাহলে এগুলোকে আর মায়ের নিজের ঘাড়ে নিতে হয় না?

উ ঃ পার্থিব চেতনা ও মানব প্রকৃতির বর্তমান অবস্থাতে এগুলি কতকটা অপরিহার্যই বটে। খুব কম ব্যক্তি এগুলিকে এড়াতে পারে কেবল অল্পস্বল্প বিরোধী ক্রিয়ার উপর দিয়ে। কিন্তু কিছুকাল পরে এগুলি থাকবে না। ব্যক্তিগতভাবে তা ঘুচেও যায়—কিন্তু এই আশ্রমের আবহাওয়াতে তা যেন খুব কঠিন হয়ে উঠেছে—একজনের মধ্যে যখন জেগে ওঠে তখন অন্যেদের মধ্যে তা ছড়িয়ে পড়ে। অবশ্য এর পিছনে রয়েছে অজ্ঞানতা ঘটিত জীবনের একটা দিক—গভীর ভাবে শিকড়গাড়া প্রাণ প্রকৃতি। কিন্তু আমাদের সাধনার লক্ষ্যই হলো ওটিকে জয় ক'রে সেখানে দিব্য শক্তির প্রতিষ্ঠা।

১-৪-১৯৩৪

×

তুমি ঠিকই দেখেছ, কিন্তু সাধকের মনোভাব যদি চৈত্য ধরনের হয় তাহলে মাকে তাতে আঘাত করে না; কোনো কিছু ভারবহন না করেই তিনি তার উপর কাজ করতে পারেন।

২২-১-১৯৩৭

×

সাধকরা তাদের অশুচি জিনিসগুলোকে মায়ের উপর নিক্ষেপ করাতেই এমন হয়েছে।

স্থূল দৈহিকের পরিবর্তনের আগে এর কোনো উপায় করা সম্ভব নয় বলে মনে হয়। মা যদি তাঁর নিজের ও সাধকদের মাঝখানে একটা আভ্যন্তরীণ দেওয়াল রাখতেন তাহলে এমন হতো না, কিন্তু তাতে ওরা মায়ের কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করতে পারত না। কিন্তু ওরা যদি আরো সতর্কতার সঙ্গে নিজেদের উচ্চ ও গভীরতর চেতনা নিয়ে মায়ের কাছে আসতো তাহলে এমন কিছু ঘটবার সম্ভাবনা কমই হতো।

×

যত কিছু অশুভ ইচ্ছা ও অশুচিতা মায়ের উপর নিক্ষিপ্ত হতে থাকায় তাঁ· দেহের উপর তার ক্রিয়া হতে পারে, কারণ মা আপন চেতনার মধ্যে সাধকদের সম্পূর্ণ গ্রহণ করেছেন। আর এসব জিনিসকে তিনি ফিরিয়ে দিতেও পারেন না, কারণ তাতে তারাই আবার আহত হবে।

১৭-৩-১৯৩৬

×

অন্যের বিপত্তিতে সাহায্য করার বিপদ এই যে তাতে নিজেরই উপরে সেই বিপদগুলো এসে পড়ে। নিজেকে বাঁচিয়ে যদি সাহায্য করা হয় তাহলে তা হতে পারে না। কিন্তু সাহায্য করতে গেলেই প্রার্থী ব্যক্তিকে আপন বৃহত্তর সত্তার মধ্যে আংশিক বা পুরোপুরি ভাবে নিয়ে নেওয়া আপনা হতেই এসে পড়ে। সাধকদের সম্পর্কে মাকে সেইরকমই করতে হয়েছে, আর সেই কারণেই তাঁকে মাঝে মাঝে ভুগতে হয়, কারণ সব সময়েই নিজেকে আগলানো যায় না কোনো কিছুর বিরুদ্ধে ...

তুমি যখন তন্ময় থাকো বা আপন কাজের মধ্যে নিমগ্ন থাকো, তখন এই মুশকিল হয় যে তুমি যাকে সাহায্য দিচ্ছ সে তোমার উপর সে ভারটি ছেড়ে দেয় না যে কতটা তুমি দিতে পারো বা দেওয়া উচিত, তার বদলে সে নিজেই তোমার শক্তির উপর তার জোর দিয়ে টানতে থাকে, সুতরাং

তার জন্য অনেক কিছু সম্ভাবনা তোমাকে সইতে হয়।

×

নিজেদেব যত কিছু কামনা বাসনা, ত্রুটি বিচ্যুতি, অশুচিতা, রোগ-পীড়া, সমস্তই নিজেদের ঘাড়ে না রেখে মায়ের উপর চাপিয়ে দেওয়া, তিনিই তার ফলভোগ করুন, এ বড়ো আশ্চর্য মনোভাব। খ্রীষ্ট মানুষের কষ্টগুলোকে নিজে নিয়ে ক্রুশে বিদ্ধ হয়েছিলেন, এ বোধ হয় তারই নকল। কিন্তু এই রূপান্তরের যোগে তার কোনো সম্পর্কই নেই।

১-১১-১৯৩৬

মায়ের সম্বন্ধে অশুভ চিন্তাতে অগ্রগতি ব্যাহত

ক-কে সতক ক'রে দেওয়া ভালো যে মায়ের সম্বন্ধে এই সব বিকৃত মন্তব্যে যেন কান না দেয়, তা সে যারই কাছ থেকে আসুক, আর যদিও কিছু শোনে তা যেন সে চারিদিকে বলে না বেড়ায়। মায়ের কাছে নিজেকে উন্মীলিত রেখে সে ভালোই উন্নতি করছিল; কিন্তু এই সব নির্বোধ উক্তিকে নিজের মনের মধ্যে স্থান দিলে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে সেই উন্মীলন বন্ধ হয়ে গিয়ে তার অগ্রগতি ব্যাহত হতে পারে।

আর খ সম্বন্ধে, সে যদি মায়ের সম্বন্ধে ঐরূপ কিছু বলে থাকে বা ভেবে থাকে, তাহলে বোঝাই যাচ্ছে যে কেন সে সম্প্রতি এত অসুস্থতায় ভুগেছে। নিজেকে তুমি যদি বিরোধী শক্তিদের প্রচারক করো আর তাদের মিথ্যাগুলিকে বিজ্ঞাপন করতে থাকো, তাহলে তোমার নিজের মধ্যে কিছু বিগ্‌ড়ে যাবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

৭-১-১৯৩২

×

প্রঃ আপনি কাল বলেছেন মায়ের আদেশের কথা। তা কি কি? আমি তা মেনে চলবো।

উঃ তা সকলেই জানে। তুমি ঠিক পথে চলবে আর ঐকান্তিক ভাবে যোগ করবে।

১৪-৬-১৯৩৩

×

প্রঃ বলা হয় যে সাধক আন্তরিক হলে মা ভালোভাবে কাজ করতে পারেন। তার অর্থ কি?

উঃ আন্তরিক সাধনা মানে কি? মায়ের সংজ্ঞাতে বলে আন্তরিক হওয়া মানে "কেবল ভগবৎ শক্তির কাছে খুলে থাকা" অর্থাৎ অন্যান্য সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান করা।

২১-৪-১৯৩৬

×

যারা এখানে মায়ের আশ্রয়ে থেকে মানব জীবনের নানা দুর্গতি ও দুঃখকষ্টের হাত হতে রক্ষা পেয়ে আছে, তারা শূন্যের মধ্য থেকে নানা দুঃখকষ্ট ও হতাশার সৃষ্টি করে। তাদের প্রাণপ্রকৃতি চায় দুঃখবোধ আর নালিশ করা আর কান্নাকাটি করা, যদি তার কোনো সঙ্গত কারণ খুঁজে না পায় তখন তুচ্ছ ও কুকারণের সাহায্য নেয়।

১-৩-১৯৩৬

×

প্রঃ আমার বিশ্বাস ছিল যে যারা এখানে এই যোগ করতে আহূত হয়েছে তারা এই জন্মেই অল্পবিস্তর সময়ের মধ্যে ভগবৎ উপলব্ধি পাবে। কিন্তু একজন বললে, "মা অবশ্য তাদেরই বেছে নিয়েছেন যাদের যোগ করবার সামর্থ্য আছে, কিন্তু লক্ষ্যে পৌঁছতে প্রাণের রূপান্তর দরকার। তা যদি না হয় তাহলে উপলব্ধি মিলবে পরজন্মে।" এ কথা

কি ঠিক?

উঃ মা পরজন্মের সম্বন্ধে কখনো কাউকে কিছু বলেননি। তবে সাফল্য পেতে হলে অবশ্য প্রাণসত্তার রূপান্তর দরকার।

১৫-১-১৯৩৪

আশ্রমে চেতন শক্তি'র ক্রিয়া

এখানে কেমন ভাবে কাজ হয় সে কথা বুঝিয়ে বলা দরকার মনে করি। কারণ খুব কম জনেই তা জানে, আরো কম জনেই তা উপলব্ধি করে।

এখানে কখনই কোনো ব্যাপারে মনের মতলবে কিছু ক'রা হয়নি, আগের থেকে পরিকল্পনা রচনা ক'রে কিছু করা হয়নি। সমস্তই চেতনার ক্রিয়াতে (চিৎ-তপস) প্রাণবন্তভাবে আপনা হতে গড়ে উঠেছে, ফুটে উঠেছে এবং স্থায়ী রূপ নিয়েছে। সেই চিৎশক্তি জড়স্তরে নেমে এসে তার অভি-ব্যক্তি'র জন্য আপন যন্ত্রগুলিকে বেছে নিয়েছে। বলা বাহুল্য সেই যন্ত্র যতই মুক্ত এবং গ্রহিষ্ণু হবে ততই তার কাজ অবাধ ও সুসঙ্গত হবে, ততই তার সাফল্য ঘটবে। সাধকদের ভিতর দিয়ে তার ক্রিয়া দুই রকমভাবে বিঘ্নিত ও ব্যাহত হতে পারে :

(১) যেখানে পূর্বকল্পিত ও মনগড়া ধারণা থাকাতে চিৎশক্তি'র ক্রিয়া এবং প্রভাবকে প্রতিরুদ্ধ ক'রে দেয়।

(২) যেখানে প্রাণসত্তার ঝোঁক এবং ব্যক্তি'গত পছন্দ তার ক্রিয়াকে নাকচ ক'রে দেয়।

এগুলি আসে অহংভাব থেকে। এগুলি না থাকলে আমার হস্তক্ষেপ দরকার হতো না। তুমি ঠিক বলেছ, মায়ের "পছন্দ" বা "অপছন্দ" বলে কোনো কথাই নয়, ওটা ছেলেমানুষি কথা।

স্পষ্ট ভাবেই এখানে চেতনা ও শক্তি কাজ করছে, যেখানে সে কাজ বিকৃত হয়ে যায় এবং চেতনা তার ক্রিয়াতে বাধা পায় সেখানেই আমাকে হস্তক্ষেপ ক'রে তা সংশোধন ক'রে দিতে হয়। প্রায়ই মিশ্রণের ব্যাপার এসে পড়ে, সেখানে বিশুদ্ধ জিনিসের থেকে বিকৃত জিনিসকে আলাদা ক'রে

দিতে হয়।

নতুবা সকলকেই মুক্তভাবে চলতে দেওয়া হয়, কারণ চিৎশক্তি অসংখ্যরূপে নানাভাবেই নিজেকে অভিব্যক্ত করতে পারে, তার সম্পূর্ণতার জন্য আগের থেকে কোনো কিছুকে বাদ দেবার দরকার হয় না, কাউকে বেছে নেবার আগে পরীক্ষা ক'রে দেখে নেওয়া হয়।

২২-৮-১৯৩৯

দাবি ও কামনা

প্র ঃ কোন জিনিসকে "দাবি ও কামনা" বলা হবে? তার ঠিক স্বরূপ কেমন?

উ ঃ বিশিষ্ট কিছু নেই, সব কিছুর বেলাতেই তা হতে পারে, তা বিষয়গত নয়, ভাবগত। যখন তুমি কিছু চাইছ, সেটা দাবি, আর কামনা সাধারণ কথা। যদি কেউ চায় যে প্রণামের সময় মা তাকে দেখে হাসুন, এবং না হাসলে সে বিরূপ হয়ে ওঠে, তাই হলো দাবি। যদি সে তাতে কেবল দুঃখ পায় কিন্তু বিদ্রোহের ভাবপ্রকাশ না ক'রে চুপ ক'রে থাকে, তাই হলো তার কামনা। মায়ের হাসি পেলে যদি 'খুশি হয় আর না পেলে শান্ত থেকে ভাবে যে মা যা করেন তাই ভালো, সেখানে দাবি বা কামনা নেই।

×

প্র ঃ ভগবানের সম্বন্ধে আপনি বলেছেন "যা তোমার বাস্তবিক প্রয়োজন তা ভগবান তোমাকে দিতে পারেন, কিন্তু লোকে ভাবে যে তারা নিজেরা যেটা দরকার মনে করছে ভগবান তাই তাদের দেবেন। তাও তিনি দিতে পারেন, কিংবা তা নাও দিতে পারেন।" তবে তিনি তো আমাদের চৈত্যের যা অভাব তা পূরণ করবেন।

উঃ শেষ পর্যন্ত তাই; কিন্তু লোকে চায় যে তিনি নিত্যই তাদের দিতে থাকুন, সেটা সকল সময়ে হয় না।

৩০-১-১৯৩৬

×

প্রঃ আমাদের কামনা যদি ত্যাগ করতে হয়, তবে কেন মা কখনো কখনো তা পূরণ করেন?

উঃ তোমার কামনা তুমি ত্যাগ করবে। মা যদি তার পূরণ না করেন এবং তুমি তোমার কামনাকে বাঁচিয়ে রাখো তাহলে সে কামনা বাইরের প্রভাবে বলবান হয়ে ওঠে। ভিতর থেকে তার উপর ক্রিয়া করতে হয়।

৪-৯-১৯৩৩

×

প্রঃ ক বলে যে না চাইতে যা আমরা পাবো তা আমরা প্রত্যাখ্যান করব না। যেমন, কেউ যদি আমাকে মিষ্টান্ন খেতে দেয় তা আমি গ্রহণ করব। কিন্তু কাম্যবস্তু না পেলে তাতে আমরা ক্ষুব্ধ হবো না। এ বিষয়ে আপনি কি বলেন?

উঃ এ নিয়ম কেমন ক'রে টেঁকে? কেউ যদি তোমাকে মাংস বা মদ দেয় খেতে, তাই কি তুমি গ্রহণ করবে? নিশ্চয়ই না। এমনি আরো শত শত দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। মা যেটা দেন বা নিতে বলেন সেটা তুমি নেবে।

২৪-৩-১৯৩৩

আশ্রমের কাজে একমাত্র মায়ের আধিপত্য

আশ্রমে কেউ যদি অন্যেদের উপর প্রভাব করতে বা প্রভুত্ব খাটাতে চায় সেটা অন্যায় হবে। সেটা হবে প্রাণসত্তার ভুল প্রভাব, তাতে মায়ের কাজে বিঘ্ন হবে।

কেবল মায়ের নির্দেশেই সব কাজ চলবে। তাঁর মুক্ত নির্ধারণে সব চলা দরকার। যার যেমন স্বতন্ত্র ক্ষমতা অথবা একত্রে যা করণীয় সেই অনুযায়ী কাজ হলেই তা সকলের পক্ষে ও কর্মীর পক্ষেও সবচেয়ে ভালো।

কেউ কাউকে আপন অধীনস্থ বলে মনে করবে না। যার উপর কোনো কাজের ভার দেওয়া আছে সে আপন সহকর্মীদের উপর প্রভুত্ব খাটাতে যাবে না, কেবল মায়ের ইচ্ছা ব্যতীত নিজের কোনো ইচ্ছাকে তাদের উপর আরোপ কববে না। কেউ নিজেকে অধীনস্থ মনে করবে না যদিও তাকে ভারপ্রাপ্ত কারো নির্দেশে কাজ করতে হয়।

সকলেরই সকলের সঙ্গে সামঞ্জস্য রেখে কাজ করা চাই, কেবল দেখা চাই যে কেমন ভাবে কাজটা সার্থক হয়ে ওঠে; ব্যক্তিগত মনোভাব সেখানে যেন না থাকে, কারণ তাতেই যত কিছু গণ্ডগোল ও ব্যর্থতার সৃষ্টি হয়।

কাজের সম্বন্ধে যদি এই সত্যটিকে মনে রাখো তাহলে তার সকলরকম বিপত্তিই ঘুচে যাবে; কারণ তোমার দৃষ্টান্তে অন্যদের মনের দুর্বলতা কিংবা বিকৃতি দূর হয়ে যাবে, তারাও ঐভাবে কাজ করতেন তোমার কোনো বাধা থাকবে না।

×

মায়ের সঙ্গে তোমার সাক্ষাৎ হবার কোনো হেতু নেই আর এটা তার সময়ও নয়। এই নিয়ে আলোচনা করবারও কোনো অবকাশ নেই।

দুটি কথা স্পষ্ট ক'রে বোঝা দরকার। এখানকার সব কাজই মায়ের কাজ, তিনি সে বিষয়ে যেমন খুশি আদেশ দেবেন, সকলকে তাই মানতে হবে। যেমন ভাবেই আদেশ দেওয়া হোক, কারো তা অমান্য করা চলবে না, নিজের ইচ্ছা বা ধারণা বা মতলব সেখানে খাটানো চলবে না। বিনা শর্তে যদি তুমি তাঁর আদেশ পালন করতে রাজী থাকো তাহলে তুমি ও কাজ করো, নতুবা কাজ ছেড়ে দাও।

দ্বিতীয়ত জোর জবরদস্তি ছেড়ে দাও। এই আশ্রমে যদি থাকতে চাও তাহলে ওরূপ আচরণ বন্ধ করতে হবে।

১৮-৭-১৯৩৭

×

আমি যে প্রাণসত্তা সম্বন্ধে বলেছি তা আশ্রম সম্পর্কে নয়, সাধারণ মানব জীবন সম্পর্কে। তা সর্বত্রই আছে, আশ্রমেও আছে, যার বিশৃঙ্খল শক্তিতে আসে রাগ, গর্ব, ঈর্ষা, প্রভুত্বের কামনা, আপন ইচ্ছার গোঁড়ামি, ওতেই আশ্রমের কাজ বিঘ্নিত হয়। এর প্রতিবিধান হলো মায়ের ইচ্ছা ও মায়ের নিয়মকেই মেনে চলা, কারো আপন অহংএর ইচ্ছা নয়। অনেকে আছে যারা মায়ের ইচ্ছাকেই নাম মাত্র মানে এবং নিজের ইচ্ছাকে জাহির করে। আভ্যন্তরীণ পরিবর্তন ছাড়া তা শোধরাবে না। এই আশ্রমে কড়া নিয়ম চলবে না। আভ্যন্তরীণ বাধ্যতাই দরকার, তার থেকে বাহ্য বাধ্যতা আসবে। চেতনার মধ্যে স্বর্ণকমলের অবতরণ চাই, যেমন তুমি স্বপ্নে দেখেছ। তারই প্রভাবে প্রকৃত সত্যচেতনার কাজ হবে এবং তার ফলে আশ্রম জীবনেও পরিবর্তন আসবে।

১৪-২-১৯৩৬

×

আমার চিঠিতে যা বলেছি তা এই যে মা নিজে চিন্তা ক'রে এসব কাজ করেন না, প্রত্যেককে বলে দেন না যে কেমনভাবে কোন কাজটা করতে হবে, নিতান্ত বিশেষ কোনো ব্যাপারে ছাড়া। কোনো বিভাগের কাজেই তিনি তা করেন না। সাধারণভাবে সকল কাজের উপর তিনি দৃষ্টি রাখেন, কোথাও অনুমোদন কোথাও অননুমোদন করেন, যেখানে যেমন দরকার বোধ করেন। খুব কম ক্ষেত্রেই তিনি নিজের প্ল্যান বলে দেন এবং বিশিষ্ট রকমের আদেশ দিয়ে থাকেন। এম্‌ব্রয়ডারি বিভাগে ক তাঁর কাছে কিছু কিছু জেনে নেয়, কেউ হয়তো মাকে জানিয়ে তাঁর ব্যবহারের জন্য রুমাল, এপ্রন, চাদর বা শাড়ি তৈরি করে। মা কখনো বা তা পছন্দ ক'রে থাকেন বা অপছন্দ ক'রে বলে দেন কেমন জিনিস করতে হবে। এই ভাবে

কাজ করাও মায়ের ইচ্ছাতে কাজ করা হয়, অর্থাৎ যেন তাঁরই মতলবে সব কিছু করা হচ্ছে। আমি বুঝি না কেন তুমি একে বলছ মায়ের ইচ্ছার সঙ্গে মিল না রেখে কাজ করা অথবা নিজেকে সমর্পণ না করা। আসল কথা হলো আভ্যন্তরীণ সমর্পণ ও নিবেদন, তাতেই কালক্রমে সমর্পণের ক্রিয়া সম্পূর্ণ হয়ে ওঠে।

১৭-৯-১৯৩৬

×

তুমি খোলসা ক'রে বলে ভালোই করেছ। নিশ্চয়, একথা ঠিকই যে আভ্যন্তর সত্তার কেবল মায়েরই দিকে উন্মুখ থাকা চাই। আর কাজের সম্পর্কে, তার ভিতর দিয়ে আভ্যন্তরীণ ও চৈত্য আধ্যাত্মিক উন্নতিই মুখ্য কথা, কাজটা সেখানে গৌণ। মাকে নিবেদন হিসেবে যে কাজ তুমি করছ তা সাধনারই একটা অঙ্গ, আভ্যন্তরীণ উন্নতির একটা পন্থা। তা ক্রমে ক্রমে জানবে যখন চৈত্যসত্তা আরো বিকাশ পাবে। সে কথা ছাড়া কাজটাও করা দরকার আশ্রমের প্রয়োজনে, কারণ আশ্রমই মায়ের ক্রিয়ার ক্ষেত্র।

×

তুমি চিঠিতে যা বলেছ তা সত্য নয়। ওটা দেহগত মনের ভুল যা সত্যকে বিকৃত করে। তুমি ক-এর সম্বন্ধে যা বলো তাতে মা অসন্তুষ্ট হন একথা মনে করা ভুল। এমনি ভুল সাধকরা প্রায়ই ক'রে থাকে, তারা ভাবে যে এই কারণে মা হাসলেন বা বিরূপ হলেন, কিন্তু কারণটা তাদেরই মনগড়া, মায়ের চেতনার সঙ্গে তার সম্পর্কই নেই, মায়ের চেতনা মানুষদেব মতো খুশি অখুশিতে নিত্য আন্দোলিত হয় না। সাধকদের এ কথা আমি পুনঃপুনঃ বলেছি, কিন্তু তারা ভাবে যে তারাই অভ্রান্ত, আমি যা বলি তা ঠিক নয়। সুতরাং আমি কেবল এই বলতে পারি যে তুমি ভুল করছ।

পুনশ্চ—আমি যখন লিখি যে তুমি ভুল করছ, তুমি যা বলছ তা ঠিক নয়, তখন তুমি ভাবো যে আমি অসন্তুষ্ট হয়েছি, তোমার উপর বিরক্ত হয়েছি। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। তোমার চিঠির জবাবে আমাকে লিখতেই

হয় যা আমার কাছে ও মায়ের কাছে উচিত বলে মনে হয়, দৃষ্টিভঙ্গীর ভুলটা দেখিয়ে দিতে হয়। তার মানে যে অসন্তোষ কিংবা বিরক্তি এমন কথা নয়।

×

এখানে সাধনার ব্যাপারে একথা ঠিক নয় যে কতক ব্যক্তিকে এখানে রাখা হয়েছে তারা টাকা দিয়েছে বলে, আর কতক ব্যক্তিকে রাখা হয়েছে তারা কাজ করে বলে। প্রকৃত সত্য এই যে অনেকেরই চেতনা গভীর ধ্যানের পথে চলবার জন্য প্রস্তুত নয়, কাজের ভিতর দিয়ে তারা প্রস্তুত হতে পারে। কিন্তু যারা গোড়া থেকেই ধ্যান করতে পারে, তাদের পক্ষেও এই যোগে কর্মের ভিতর দিয়ে সাধনার দরকার। কেবলই ধ্যানের দ্বারা লক্ষ্যে পৌঁছনো যায় না। তোমার বেলাতে দেখা গিয়েছিল যে অনেক দিন ধরে তোমার সাধনার কাজ ভালোভাবেই চলছিল। কিন্তু কারো দক্ষতাই যথেষ্ট নয়, সকলেই সীমাবদ্ধ, কেবল নিজের ক্ষমতাতে সামান্যই কাজ হতে পারে। সেইজন্য দিব্য শক্তির উপর, মায়ের শক্তির উপর ও আলোর উপর নির্ভর করা ও খুলে থাকা দরকার হয়, সেটাই হলো আসল দক্ষতা। কিছুকাল তুমি তাই করছিলে, কিন্তু তোমার দৈহিক প্রকৃতি প্রকট হয়ে ওঠাতে তা ঢাকা পড়ে গেছে, যেমন অনেকেরই হয়। এই অবস্থাতে প্রায় প্রত্যেকেরই তাই হয়ে থাকে, কিন্তু সেটা স্থায়ী জিনিস নয়। দেহ চেতনা যদি নিজেকে খুলে রাখতে মনস্থ করে তাহলে সাধনার উন্নতির পক্ষে আর কিছু দরকার নেই।

১০-৭-১৯৩৭

×

স্মরণ রেখো আমি যা বলেছি যে মা চাইছেন যে তুমি নীরবে থেকে তোমার কাজ ক'রে যাবে তোমার যথাসাধ্য ভাবে, এই সব ব্যাপার নিয়ে বিচলিত না হয়ে। এই আশ্রমে জীবনের ও কাজের উন্নতির পক্ষে প্রত্যে-কেরই সত্য চেতনার দিকে খোলা থেকে কাজ করা চাই, তাতেই আধ্যাত্মিক উন্নতি আসবে, অন্যে কি করছে সেদিকে দৃষ্টি না দিয়ে। অন্য কোনো

উপায়ে ভুলভ্রান্তি শোধরাবে না। এই কারণেই মা সাধকদের মধ্যে ঝগড়া বিবাদে হস্তক্ষেপ করা ছেড়ে দিয়েছেন। তিনি চান যে প্রত্যেকেই ভিতরে ভিতরে উন্নীত হয়ে উঠুক, তাহলে সব বাহ্য বিপত্তি দূর হবে বা নগণ্য হয়ে যাবে।

২১-৪-১৯৩৮

×

আমি জানি না কেন তুমি ভাবছ যে মা তোমার চিঠিতে অসন্তুষ্ট হয়েছেন। আমার চিঠিতে আমি তো খুবই নরম ক'রে লিখেছিলাম, তার মধ্যে অসন্তোষ কিছুই ছিল না। তুমি যা যা লিখেছিলে সে বিষয়ে আমি নীরব ছিলাম, কারণ আমি মনে করি যে ওতে তোমার মনের ভার লাঘব হয়ে যায়। তাই আমি প্রায়ই নীরব থাকি কিংবা অন্যের সম্পর্কিত বিষয়ে বলি যে সাধকদের আভ্যন্তরীণ চেতনা খুলে গেলে তখন তাদের দোষ ত্রুটি সব ঘুচে যাবে। নীরব থাকা মানে একথা বলা নয় যে দোষত্রুটি কিছু নেই। সকলেরই নানারকম দোষ ও ভুলভ্রান্তি আছে, উৎকৃষ্ট সাধকও তার থেকে বাদ যায় না। মানুষের স্বভাবই হলো রাগ করা, নিন্দা করা, দোষ দেওয়া, মা যদি ওগুলো কিছু না করেন বা কড়ামেজাজ না হন, তাতে মনে করা উচিত নয় যে তিনি তাঁর প্রিয় ব্যক্তির জন্য পক্ষপাতে অন্ধ হয়ে তার দোষত্রুটি কিছু দেখলেন না। মা অন্ধ নন; তিনি সকল সাধকেরই প্রকৃতি জানেন, তাদের দোষগুণের কথা সমস্তই জানেন, তিনি বিলক্ষণ জানেন যে মানুষের মতো আচরণ ক'রে সে সব কিছু শোধরানো যাবে না। সেইজন্য তিনি সকলকেই ভালোবাসেন ও ক্ষমার চক্ষে দেখেন এবং ধৈর্য রাখেন, কেবল যারা ঐকান্তিক, কাজে বা সাধনাতে, তাদেরই নয়।

আশ্চর্য যে তুমি ভাবছ তোমাকে তিনি কোনো মূল্য দেন না। প্রথম থেকেই তোমার উপর মায়ের বিশেষ অনুগ্রহ আছে; তোমাকে তিনি এতই সমর্থন করেন যে লোকে তাঁকে তোমার সম্বন্ধে পক্ষপাতিত্ব করার দোষ দিয়েছে, যেমন ক-এর সম্বন্ধেও সেই দোষ দেয়। তুমি যখন কষ্ট ও বিপত্তির মধ্যে বিদ্রোহী হয়ে উঠেছিলে, তখন তিনি ধৈর্যের সঙ্গে ভালোবেসে তোমাকে বরাবর সাহায্য করেছেন। তারপর যখন থেকে তোমার সাধনা

খুলল তখন থেকে আমরা তোমার প্রতি লক্ষ্য রাখছি---আমি প্রত্যহই তোমাকে এত লিখছি, জ্ঞান দিচ্ছি, প্রেম ও যত্নের সঙ্গে তোমার অগ্রগতিতে সাহায্য করছি। তোমাকে মূল্য না দিলে আমরা এত কিছু করতে যেতাম কেন?

তুমি অবশ্য জানো এই সব কথা, কেবল তোমার দেহগত মন অতি সক্রিয় হয়ে উঠে তোমার অনুভূতিকে মেঘাচ্ছন্ন করেছে। এইরূপ অবস্থা থেকে আভ্যন্তরীণ সত্তার মধ্যে তোমার ফিরে যাওয়া দরকার।

৩০-৮-১৯৩৬

×

তোমার সঙ্গে ক-এর যে বিবাদ হয়েছে তা খুব তুচ্ছ ব্যাপার, দুই তরফের একটু শুভ ইচ্ছা থাকলেই তা মিটে যাবে, তার গুরুত্ব চলে যাবে। ঝগড়া বিবাদ টিকে থাকে কারণ প্রত্যেক পক্ষই মনে করে যে অপরজনের ব্যবহার খারাপ হচ্ছে, কিন্তু কোনো পক্ষই সমুচিত ব্যবহার করে না। ঝগড়া মানেই দুই পক্ষেরই তাতে ভুল হয়। তা ছাড়া কাজের ব্যাপারে এত স্পর্শকাতর হওয়া উচিত নয়। মা যাকে কাজের ভার দিয়েছেন তার বাধ্য হয়ে চলতেই হয়। অন্যান্য ব্যাপারে আপন স্বাধীনতা বজায় রেখে সম্পর্ক ঠিক রাখতে হয়।

তোমার কাজের কিংবা তোমার বাসস্থানের বদল ক'রে কোনো লাভ নেই, যদিও তা সম্ভব হতে পারে। আভ্যন্তরীণ মনোভাবটাই ঠিক রাখা দরকার, সঙ্গতি বজায় রাখা দরকার। কাজ বদ্‌লে কিছু লাভ নেই। বাড়িতে ভালো বা মন্দ রকমের আবহাওয়াতে কিছু যায় আসে না। নিজের আবহাওয়া নিজে তৈরি ক'রে নিতে হয় যাতে কোনো প্রভাবই তাকে নষ্ট করতে না পারে, এবং তা সম্ভব হবে মায়ের সঙ্গে নৈকট্য রাখলে।

২-১০-১৯৩৫

×

তুমি ঠিক কথাই লিখেছ। কর্মীদের মনের এইসব ভুল ধারণা আদৌ ঠিক নয়। কিন্তু আমরা সাধকদের মন রাখতে কাজ করছি না, আমরা

করছি মায়ের কাজ আর ভগবানের কাজ বলে, সেকাজ সুশৃঙ্খল ও সুসম্পূর্ণ হওয়া চাই। কর্মীরা তাতে খুশি না হলেও ঠিক ভাবে তাদের কাজ করতে হবে। তাদের প্রকৃতির বদল হলে তখন তারা নিজেদের ভুল বুঝবে, তখন তাদের মনোভাব বদলাবে। কারো কারো শুভ ইচ্ছা রয়েছে, কেবল তাদের সুস্পষ্টভাবে দৃষ্টি পেয়ে মনের বিচার সংশোধন করা দরকার। অন্যেরা যদিও যথেষ্ট অহং ভাবাপন্ন ও অন্ধ, তবু তারা সময়ে শুধরে যাবে। ততদিন পর্যন্ত আমরা দৃঢ়চিত্তে ধৈর্যের সঙ্গে কাজ ক'রে যাবো।

×

ওর উপায় হলো অপরদের সঙ্গে সম্পর্কের কথা আদৌ না ভেবে কেবল আরো বেশি ক'রে মায়েরই কথা ভাবা। ক যেমন করছে তেমনিভাবে চেষ্টা করবে মায়ের মধ্যেই অপরদের দেখতে, স্বতন্ত্ররকম সম্পর্কের কথা না ভেবে চেতনার মধ্যে মায়েরই সঙ্গে মিল রাখতে। তাহলে এই সব গণ্ডগোল ঘুচে গিয়ে একটা সঙ্গতি স্থাপিত হবে--তখন আর কাউকে খুশি রাখার জন্য চেষ্টা করতে হবে না--সকলেই মায়ের ভালোবাসার মধ্যে মিলিত হয়ে মায়ের জন্যই কাজ ক'রে যাবে।

×

এই যোগের মূল নীতিই হলো অন্য সব কিছুর সঙ্গে সম্পর্ক ছেড়ে কেবল মায়ের কাছেই সমর্পিত হয়ে থাকা, এবং দিব্য মাতৃশক্তির সঙ্গে সংযুক্ত হয়ে নিজেদের মধ্যে নামিয়ে আনা আলো, শক্তি, বিশালতা, শান্তি, শুদ্ধতা, সত্যচেতনা ও অতিমানস দিব্য আনন্দ। সে ক্ষেত্রে কারো সঙ্গে কোনোরূপ সম্পর্ক স্থাপনা বা কোনো আদানপ্রদান চলতে পারে না। কারণ তাতে আত্মাকে নিম্ন চেতনাতে টেনে আনে ও নিম্ন প্রকৃতিতে নামিয়ে দেয়, ভগবানের সঙ্গে প্রকৃত মিলনে বাধা জন্মায়, এবং অতিমানস সত্য চেতনাতে উত্তরণ ও অতিমানস ঈশ্বরীশক্তির অবতরণ উভয় ক্রিয়াকেই ব্যাহত করে।

×

সাধকদের মধ্যে যৌন বিড়ম্বনা দূর করতে মা খুব সচেষ্ট, ওটা নিতান্তই যাওয়া চাই।

২৯-১০-১৯৩৪

ভিতরে অবস্থান

মায়ের সঙ্গে ভিতরে অবস্থান করতে শিখতে হবে মায়ের চেতনার সংস্পর্শে থাকতে হবে, অন্যেদের সঙ্গে কেবল বাইরের দিক দিয়ে সম্পর্ক থাকবে।

×

মা যাই কেন করুন, তা সাধকদের ও সাধনার ভালোর জন্য।

৯-১২-১৯৩৫

×

প্র ঃ প্রাণসত্তাকে কেমন ক'রে বোঝাই যে মা কখনো পক্ষপাতিত্ব করেন না?

উ ঃ এক উপায় মায়ের উপর অটুট পূর্ণবিশ্বাস রাখা—–অন্য উপায় এ কথা জেনে রাখা যে মায়ের জ্ঞান তোমার চেয়ে অনেক বেশি, তিনি যাই কেন করুন তার নিশ্চয় কিছু কারণ আছে যা তোমার বুদ্ধিতে আসবে না।

২২-৩-১৯৩৪

×

প্র ঃ আমি জানি যে মায়ের সব কাজেরই যুক্তিযুক্ত কারণ আছে, প্রত্যেকের পক্ষেই যা দরকার তাই করেন,

কিন্তু প্রাণসত্তা তা মানে না। প্রলোভনের বদলে মনকে কেমন ক'রে তা মানাবো?

উঃ বিশ্বাসকে প্রতিষ্ঠিত করতে হবে। প্রাণ বা মন যতক্ষণ ভাবছে যে সে মায়ের চেয়ে বেশি বুদ্ধিমান ও বিচারক্ষম, ততক্ষণ কেমন ক'রে এ বোকামি দূর হতে পারে?

২২-৩-১৯৩৪

×

প্রঃ মায়ের সঙ্গে কি এমন সম্পর্ক হওয়া সম্ভব যাতে তিনি বিনা বাধাতে মুক্তভাবে আমার ভুল দেখিয়ে সংশোধন ক'রে দেন, আমার মনোভাবের দিকে না চেয়ে?

উঃ নিশ্চয়, দিব্য চেতনার উপলব্ধি হলে মায়ের ও সাধকের ইচ্ছার তফাৎ থাকে না।

মায়ের সঙ্গে ঐরূপ সম্পর্ক রাখতে হলে মহাকালীর ক্রিয়াকে ভয় করবে না আর কোমল ব্যবহার চাইবে না। মহাকালীর আঘাতকে তার আশীর্বাদ বলে জানতে হবে। তার কথা এবং আচরণের উপর অটুট আস্থা রাখতে হবে, নতুবা তোমার অহংএর বিরুদ্ধে কিছু করতে গেলেই তোমার অহং অমনি বেঁকে বসবে, নিজেকে অভ্রান্ত ভেবে কটূবাক্য বলবে, যেমন আশ্রমে অনেকেই ক'রে থাকে তাদের মতের বিরুদ্ধ কিছু হলেই। এখানে খুব অল্পজনেই মায়ের মহাকালী আচরণ আংশিকভাবে মেনে নিতে পারে, মা তাদেরই সঙ্গে ঐরূপ আচরণ করতে পারেন। অন্যেদের বেলাতে তাঁকে স্বতন্ত্ররূপ আচরণ করতেই হয়--যার যেমন প্রকৃতি সেই বুঝে তাঁকে চলতে হয়।

×

মা যখন নিজে তোমাকে কিছু বলবেন তখনই তুমি বলতে পারো

"মা বলেছেন"।

৯-৭-১৯৩৩

×

যারা এখানে প্রথম আসে তাদের সঙ্গে মা সাধারণত সাক্ষাতের সময় কোনো কথা বলেন না। প্রত্যেকের সঙ্গে সাক্ষাতের সময় কথা বলতে হলে সময় মেলে না। তা ছাড়া বাক্য বা উপদেশের দ্বারা মা সাধকদের চেতনার উপর ক্রিয়া করেন না, নীরব প্রভাবের দ্বারা তিনি কাজ করেন, তা গ্রহণ করতে নিজেকে খোলা রাখতে শিখতে হয়।

তুমি আশ্রম জীবনের জন্য প্রস্তুত কিনা তা তুমি নিজে জানবে, তোমার সংসার সম্পর্কে তার কেমন প্রতিক্রিয়া হবে——সেদিকে টান থাকলে তোমার মারাত্মক পতন ঘটবে। সত্য কথা শুনতে বা নির্দেশ পেতে সাধকরা অভ্যস্ত হয়ে মেনে নেয়——আহত বোধ ক'রে কান্নাকাটি করাকে জয় করতে হয়। চৈত্য ক্রন্দন আসে ভিতরের আত্মা থেকে। সেটা হয় প্রকৃতির প্রতিরোধ জনিত দুঃখ থেকে, কিংবা আনন্দ ও ভক্তি থেকে, তাতে কোনো পতন ঘটে না, বরং আত্মাকে আবরণমুক্ত করে; ওতে একটা বিশুদ্ধতা আনে, কোনো কষ্ট বা ব্যথা থাকে না। আহত প্রাণসত্তার কান্না সে রকম নয়, তার ভিতরকার অভিমান এসে প্রকৃতিকে বিপর্যস্ত ক'রে দেয়।

১৬-৩-১৯৩৭

×

প্র ঃ আমি চাই যে কাল মায়ের কাছে যাবার আগে যেন আমার নিম্ন প্রকৃতির যা কিছু সব ঘুচে যাক। নতুবা আমি মাকে আমার মুখ দেখাতে চাই না।

উঃ এও তোমার নিম্ন প্রকৃতির প্ররোচনা। ঐ কথা বলে সে তোমাকে মায়ের কাছ থেকে তফাতে রাখতে চাইছে।

×

> প্রঃ আমি বোধ করছি যে কাল আমার জন্মদিনে যখন মায়ের সাক্ষাতে গেলাম তখন নিজের সম্বন্ধে অনেক কিছু শিখলাম। হয়তো মায়ের শক্তিতেই আমি এক ধরনের জ্ঞানলাভ করলাম। এখন আর নিজেকে দুর্বল অসহায় ও দোষত্রুটির অধীনস্থ বলে মনে করি না, বরং নিশ্চয় জানি যে আমার নিম্ন প্রকৃতি এবার ঘুচে যাবে।

উঃ একেই আমরা বলি চেতনা আসা—যার ভিত্তি হলো চৈত্যে যদিও মনে প্রাণে বা দেহেও তা আসতে পারে। অবশ্য মায়ের শক্তিই তা জাগিয়েছে।

৯-৯-১৯৩৭

×

কেবল মা-ই এখানে আদেশ দিতে পারেন।

মা চান যে তুমি ধ্যানে ও প্রণামে আসবে সমস্ত অহং, ঈর্ষা, রাগ, অন্যেদের সঙ্গে ঝগড়াঝাঁটি বর্জন ক'রে, সমস্ত দাবিদাওয়া পরিত্যাগ ক'রে, কেবল শান্তভাবে আপন সাধনার কথা ভেবে এবং মা যা বহুমূল্য বস্তু দিচ্ছেন তাই গ্রহণ করতে থেকে।

২২-৯-১৯৩৬

×

> প্রঃ মায়ের সামনে যখন ধ্যান করি তখন কেবল ভাবি মা কি নামিয়ে আনছেন।

উঃ ওটা মনের মন্দ ক্রিয়ার বদ অভ্যাস। মা কি আনছেন তাই নিয়ে মনের প্রশ্ন ক'রে কোনো লাভ নেই, কেবল নীরব থেকে নিবিষ্টভাবে শক্তিকে কাজ করতে দেবে।

১১-১-১৯৩৪

×

প্রঃ একাগ্রতা আনতে গিয়ে কেবল অবান্তর চিন্তা ও কামনাদি এসে পড়ে, পরে যদিও তা ভুলে যাই। কেমন ক'রে তা স্মরণ রেখে মায়ের কাছে খুলে ধরব?

উঃ সেই সময়ে আস্পৃহা করবে--তাহলে আপনা হতে সব খুলে যাবে।

২৬-৬-১৯৩৩

×

সেই মেয়েটিকে মায়ের কাছে আনবে না। বড়ো জোর তাকে দর্শনে আনতে পারো যেমন ভাবে বলেছি, কিন্তু তাকে আশীর্বাদ নিয়েই সরে যেতে হবে, বিলম্ব করা চলবে না। অসুস্থ বা অপ্রকৃতিস্থ কাউকে আরোগ্যের জন্য দর্শনে আনা ভুল, দর্শন সেজন্য হয় না। তাদের জন্য যা করবার তা দূর থেকেই করা যেতে পারে। দর্শনের সময় যে শক্তি কাজ করে তা অন্যরূপ ধরনের, অসুস্থ ব্যক্তিরা তা গ্রহণ করতে অপারগ, বরং তাতে উল্‌টো ফল হতে পারে। সে শক্তির কাজ ছাড়া দর্শনই ব্যর্থ। এই কারণেই ছোটো শিশুদের দর্শনে আনা নিষিদ্ধ।

১৩-৮-১৯৩৭

×

প্রঃ মাকে প্রণামের পরেই আমি অনুভব করলাম হৃদয়ের মধ্যে গভীরতা ও অগ্নিস্ফুরণ।

উঃ সে গভীরতা ও সে অগ্নি হলো চৈত্যের।

৫-৫-১৯৩৬

×

প্রঃ মা যখন ক-এর মাথাতে হাতের চাপ দিচ্ছিলেন,

তখন আমার মনে হলো যেন আমারই মাথায় তিনি হাত রাখলেন। এ কেমন ক'রে হয়?

উঃ এতে বোঝায় যে তোমার সূক্ষ্মদেহ চেতন হয়ে উঠছে, তাই মায়ের যে আশীর্বাদ ও স্পর্শ সর্বদাই রয়েছে সেটা তুমি অনুভব করছ।

২০-৩-১৯৩৫

×

প্রঃ আশ্রমে দূর থেকেও কি মায়ের প্রভাব মেলে, যেমন প্রণামে গেলে হয়?

উঃ তা সম্ভব, কিন্তু সমানভাবে নয়। দেহচেতনাতে সে স্পর্শের অভাব হয়।

৩০-৫-১৯৩৩

×

প্রঃ আপনি লিখেছেন, "আভ্যন্তর স্পর্শ না পেলে আভ্যন্তর সত্তা কাজ করে না"। ঠিক বুঝলাম না। প্রণামের সময় মায়ের যে সাক্ষাৎ স্পশ পেয়ে হয় তার মতো ফল সূক্ষ্ম স্পর্শে হলো না। তা এসেই কয়েক মুহূর্তে সরে গেল, তার ফল কিছু রইল না। কিন্তু প্রত্যক্ষ স্পর্শের ফল অনেককাল থাকে, মন অবসাদগ্রস্ত ও বিমুখ থাকলেও।

উঃ তুমি আভ্যন্তর সত্তার বদলে বাহ্য সত্তাতে থাকাতেই অমন হয়েছে। আভ্যন্তর স্পর্শের দিকে যদি নিজেকে না খুলে দাও, তাহলে সত্তার উন্নতি হয় না।

৩-২-১৯৩৭

×

প্রঃ যখন আমি অনুভূতি ও উপলব্ধি পেলাম তখন কেন স্পর্শ পেলাম না, কারণ শুনেছি যে আভ্যন্তরীণ সত্তার উন্মীলন ছাড়া তা হয় না?

উঃ স্পর্শ পাওনি কারণ আভ্যন্তরীণ সত্তা জাগ্রত ছিল না--কেবল ফলটাই পেয়েছ--তা আভ্যন্তরীণ সত্তার অনুভূতি নয়, আত্মার অনুভূতি।

৬-২-১৯৩৭

×

প্রঃ আপনাকে চিঠি লিখতে গেলেই উচ্চতর জিনিসগুলি প্রবল হয়ে ওঠে কেন?

উঃ তার কারণ চিঠি লিখতে বসলেই তুমি মায়ের ও মাতৃশক্তির সংস্পর্শে আসো।

১০-৫-১৯৩৬

×

মা তোমাকে সংক্ষিপ্ত আশীর্বাদ দিয়েছেন তোমার নিজের দোষে নয়। প্রথমে যারা আসে তাদের কাজে যাবার জন্য তিনি তাড়াতাড়ি করেন। দীর্ঘ আশীর্বাদ পেতে হলে ওর পরে আসা চাই। কিন্তু তুমি যদি শান্ত ও খোলা থাকো তাহলে সংক্ষিপ্ত আশীর্বাদেও কাজ হবে।

×

মা আগের আগের বছরে দৈহিক স্পর্শ দিতেন। সাধকদের প্রতিক্রিয়া যদি সঠিকভাবে হতো তাহলে কি তিনি সেটা এত কমিয়ে দিতেন? কেমনভাবে স্পর্শ নিতে হয় তা জানা বড়ো কথা, কিন্তু সেজন্য দৈহিক নৈকট্য দরকার নেই। তাতে বরং উচ্চ শক্তির চাপ প্রবল হয়ে ওঠে, আর কজন

তা নিতে পারে?

২২-৪-১৯৩৩

×

জেনে রাখো যে মা প্রণামের সময় মা সন্তোষ বা অসন্তোষ প্রকাশ করেন না, প্রণাম সেজন্যই নয়। ও সময়ে মায়ের ভাব বদলাতে পারে কেবল যদি আধ্যাত্মিক জীবনে নিতান্ত নিয়মবহির্ভূত কাজ করে বা যোগ ও মায়ের প্রতি বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। তাতেও তিনি প্রণামের সময় অসন্তোষ দেখান না, কেবল তাঁর কৃপার প্রত্যাহার করেন, সে অন্য কথা।

×

> প্র ঃ আমরা চাই মায়ের আচরণে আমাদের প্রতি তাঁর স্নেহের অভিব্যক্তি দেখতে। তা পেলে আমাদের উন্নতি হবার আশা পাই।

উ ঃ স্নেহের বাহ্য অভিব্যক্তির জন্য এরূপ দাবি দূর করতে হবে। ওতে সাধনার পথে মারাত্মক প্রতিবন্ধক জন্মায়। ঐরূপ প্রশ্রয় পেলে যে-রকম উন্নতি আসতে পারে তা নিতান্ত অস্থায়ী, যে কোনো মুহূর্তে তার পতন হতে পারে ঐরূপ শক্তিরই দ্বারা।

৮-১০-১৯৩৫

×

> প্র ঃ শুনেছি অনেক সাধিকা মাকে এত বেশি ভালোবাসে যে তার জন্য তারা মরতেও প্রস্তুত। কিন্তু মায়ের দিক থেকে প্রেমের কোনোরূপ অভিব্যক্তি না দেখলে তাদের ভালোবাসা ব্যাহত হয়, তখন তারা কান্নাকাটি করে, উপবাস করে।

উঃ তারা তাদের আত্মপ্রেম থেকে ওরূপ করে। ওটা হলো বাইরের মানুষদের প্রাণধর্মী প্রেমের মতো জিনিস (নিজেরই জন্য প্রিয়কে ভালোবাসা)। সাধনার ক্ষেত্রে সে প্রেমের কি সার্থকতা? ওতে বরং বাধারই সৃষ্টি করে।

১৫-১০-১৯৩৫

×

> প্রঃ মা না হেসে গম্ভীর হয়ে থাকলে সকলে দুঃখিত হয়। মা হয়তো কোনো কারণে অসন্তুষ্ট হয়েছেন এ কথা না ভেবে কেউ থাকতে পারে না।

উঃ এ বিষয়ে সমস্ত জিনিসটাই ভুল। মা গম্ভীর থাকলে প্রত্যেকেই মনে করে মা "আমার" উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, প্রত্যেক সাধকই মনে করে "বুঝি আমিই"। আমি একশো বার বলেছি যে তা ঠিক নয়, কিন্তু কেউ আমার কথা শোনে না।

১৯-৪-১৯৩৫

×

> প্রঃ মা যখন আমাদের দিকে চেয়ে হাসেন তখন জানি যে তিনি খুশি আছেন, আবার অন্যান্য সময় তিনি গম্ভীর হয়ে থাকেন।

উঃ কেন হবেন না? মা কি নিজের কারণে গম্ভীর হতে পারেন না? কেবল সাধকদের উপর অসন্তুষ্ট হলেই তিনি গম্ভীর হবেন?

১৮-৬-১৯৩৩

×

মা খুবই অসুস্থ হয়েছিলেন, এখন ২৪শে নভেম্বরের জন্য তাঁর শক্তিকে

সংহত করতে হবে। এখন প্রত্যেককে দেখা দেওয়া সম্ভব নয়, একটি সকালেই তিনি ক্লান্ত হবেন। এ তো লৌকিকতার সাক্ষাৎ নয়, এতে শক্তির আদানপ্রদান হয়, তাতে ভালোমন্দ অনেক কিছুই আসতে পারে, তার সামঞ্জস্য ঘটাতে অনেক মেহনত লাগে। দুই তিন জন হলে কথা ছিল না, কিন্তু সমগ্র আশ্রম উন্মুখ হয়ে আছে দরজা খুলে দেবার জন্য। সেরে ওঠার আগে তাঁকে সে ধকল নিতে বলতে পারো না! মা নিজের শরীরের বিষয়ে কখনই গ্রাহ্য করতেন না তাতেই এমন হয়েছে––কিন্তু কাজের সুবিধার জন্য আমাকে বাধ্য হয়ে কেবল অল্প কিছু করতে আদেশ দিতে হয়েছে; যতটুকু তাঁর স্বাস্থ্যের পক্ষে সহ্য হতে পারে। যারা তাঁর ভালো চায়, আশা করি তারা সকলেই এর অনুমোদন করবে।

১২-১১-১৯৩১

×

মা যে ক্রমশ আমার মতো অন্তরালবর্তী হচ্ছেন এ কথা ঠিক নয়। কেবল বিশেষ কয়েকজনকে মাত্র তিনি সুযোগ সুবিধা দেন, তাদেরই তিনি সব কথা বলেন, আর তোমার বেলা নীরব থাকেন, এ নালিশের অর্থ বুঝলাম না। এই পুরানো নালিশের কোনো ভিত্তি নেই। কেউ যদি এমন কথা বলে থাকে সেটা অহংভাব থেকে বলা, তা অযৌক্তিক। তোমার আসল কথা এই যে মা আবার কেন সূপ বিতরণ করছেন না। আমি আগেই বলেছি যে অসুস্থ হওয়াতে তার পর তিনি ওটা ছেড়ে দিয়েছেন, ওটা নিতান্ত গতানুগতিক ব্যাপার হয়ে দাঁড়িয়েছিল। সাধকরা মনে করতো ওটা একটা আধা-ধর্মীয় অনুষ্ঠান। সাধকদের এমনি সব মনোভাব থেকেই যোগের বিরুদ্ধ আবহাওয়ার সৃষ্টি হয়েছে যাতে মহা অনিষ্ট ঘটতে পারে ––তারই সূত্রপাত হচ্ছে। পূর্বের মতো সূপ বিতরণ আবার আরম্ভ করলেই আবার সেই একই অবস্থার সৃষ্টি হবে। অসুখের পর থেকে মা ধীরে ধীরে অন্যরূপ ভাবে নতুন পন্থা নিচ্ছেন, কিন্তু তিনি দেখবেন যাতে সেই পূর্বাবস্থা ফিরে না আসে যার সম্বন্ধে তুমি নিজেও লক্ষ্য করেছিলে। এবার সাধকদের নিজেদেরই সে পথ নিতে হবে (মনোভাব বদ্‌লে এবং নিম্ন দেহ-প্রাণ স্তরে সত্য চেতনাকে এনে) যাতে মায়ের সঙ্গে সঠিক ভাবে মিলন ঘটানো সম্ভব হয়। এখন এর চেয়ে বেশি কিছু বলতে চাই না,

পরে আরো বলব কোনো ব্যক্তিগত কথায় না গিয়ে, কারণ প্রত্যেকের যোগ সম্বন্ধে যে কথা ব্যক্তিগত তা পৃথক পৃথক ভাবে তাদেরকে বলাই সমুচিত।

তোমার অন্যান্য প্রশ্নের উত্তর দেবো অন্য চিঠিতে। এই বলতে পারি যে যা ঘটছে তা "ভালোর" জন্যই, অর্থাৎ অবশেষে সকল বিপত্তি সত্ত্বেও ভগবানের জয় নিশ্চয় হবে––তাই আমি বরাবর দেখে আসছি, আমার বিশ্বাসে সেই নিশ্চয়তার কথাই বলে––যদি তুমি আমার কথা সত্য বলে নিতে চাও। কিন্তু তার মানে এই নয় যে তোমাকে তোমার ক্ষোভ ও হতাশা নিয়েই চলতে হবে! যত শীঘ্র তোমরা ওগুলোকে চূড়ান্তভাবে দূর ক'রে দিতে পারবে, ততই শীঘ্র মা এবং আমি দুর্গম চূড়ার দিকে অগ্রসর করতে পারব, এবং তোমাদের পক্ষেও যা চাও তার উপলব্ধি সহজে আসবে, অর্থাৎ পরিপূর্ণ ভক্তি এবং আনন্দ।

২৮-১২-১৯৩১

×

আকাঙ্ক্ষা, পছন্দ প্রভৃতি পরিপূরণ করা দরকার। এই মনে করে মা সাধকদের সুখে-স্বাচ্ছন্দ্যে থাকার উপকরণগুলি যোগান না। যোগের পথে এই সব আকাঙ্ক্ষা প্রভৃতি বর্জন করতে হবে। এখানে তারা যা পাচ্ছে তার দশমাংশও তারা অন্য কোন আশ্রমে পেত না––নানারকম অসুবিধা, অভাব, কঠোর জীবন প্রভৃতি সহ্য করতে হ'ত––আর যদি অভিযোগ করত, তারা যে যোগের পক্ষে উপযুক্ত আধার নয় বলা হ'ত। এখানে যদি পৃথক কোনও নিয়ম থাকে, তার উদ্দেশ্য এটা নয় যে আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা দরকার। বরঞ্চ, উদ্দেশ্য হ'ল এই যে আকাঙ্ক্ষনীয় বস্তুর সামনে আকাঙ্ক্ষা দমন করতে হবে, তার অনুপস্থিতিতে নয়। যা আসে, কম বা বেশী, তাই নিয়েই সাধককে সন্তুষ্ট থাকতে হবে, এটা হ'ল যোগের প্রথম সূত্র। যদি জিনিস থাকে তা উপভোগ করতে হবে, আকাঙ্ক্ষা বা মমতা দিয়ে নয়। জিনিস যদি না থাকে, সাধকের তাতে যেন কিছু যায় আসে না।

৭-১-১৯৩৭

×

মাকে তুমি লিখেছ যে স্বীকারোক্তি করছ, কিন্তু এর ভিতরের ভাব হচ্ছে যে তুমি নিজে যে নির্দোষ সেটাই প্রমাণ করতে চাইছ, আর তার সঙ্গে আছে মায়ের বিরুদ্ধে অভিযোগ--প্রিয়জন তোষণ, বদ মেজাজ, অবিচার। আমি লক্ষ্য করেছি যে তুমি যা ঘটনার বিবরণ দিয়েছ তা ভুল, এবং মার সম্বন্ধে বীভৎস। যে বিষয়ে তোমার কিছু বলবার আছে তার উপরেই তুমি জোর দিয়েছ--আর যে সব বিষয়ে তোমার দোষ আছে, সেগুলি বেমালুম চেপে গেছ। যাই হোক আমি ধরে নেব যে এর সবটাই অনিচ্ছাকৃত আর তোমার প্রাণশক্তি যে চিঠির ভাব-ভঙ্গীকে নিয়ন্ত্রিত করেছে, সে সম্বন্ধে তোমার কোনও জ্ঞান ছিল না।

অপরদের সঙ্গে তোমার সব সময়ই দ্বন্দ্ব দেখা যায়। এই বিষয়ে আমি বলব, যে যখনই কিছু ঘটে, তখন তুমিই ঠিক, আর সবাই ভুল করছে, তোমার এই ধারণা যদি ছেড়ে দাও, সেটাই হবে ভাল। নিজের চিন্তাধারারও নিরপেক্ষ সুবিবেচক থাকাই বুদ্ধিমানের কাজ, দেখতে হবে কোন জায়গায় তুমি ভুল করেছ, অপরের দোষ দেখার চেয়ে নিজের দোষত্রুটির দিকে বেশী লক্ষ্য রাখা ভাল। এতেই অপরদের সঙ্গে তোমার সম্পর্ক ভাল হয়ে উঠবে; অন্ততঃ তোমার আধ্যাত্মিক অগ্রগতির অনুকূল হবে এই মনোভাব আর ঝগড়ায় জেতার চেয়ে এটা আরো প্রয়োজনীয়। নিজের সাফাই গাওয়ার মনোভাব ও নিজের বা মার কাছ থেকে নিজের দোষ ত্রুটি লুকিয়ে রাখার প্রচেষ্টা ভাল নয়।

যতক্ষণ পর্যন্ত তোমার ধারণা থাকবে যে তোমার নিজের বুদ্ধি দিয়ে তুমি মায়ের মন বুঝতে পারবে, আর সেই ভুল তথ্য দিয়ে মার এবং তাঁর কাজের উপর রায় দেবে, ততক্ষণ পর্যন্ত মায়ের উপর তোমার সন্দেহ যাবে না। মার কাজ তোমার পছন্দমত না হলেই বা তোমার ক্ষুদ্র বুদ্ধি দিয়ে বুঝতে না পারলেই তাঁর উপর তোমার বিশ্বাস যদি চলে যায়, তাহলে এ সন্দেহ সহজে যাবে না। যদি তোমার এ বিশ্বাস না থাকে যে মার চেতনা তোমার তুলনায় বিশালতর, মহত্তর এবং মানুষী বুদ্ধি দিয়ে তা মাপা যায় না, অন্ততঃপক্ষে তাঁর যৌগিক চেতনা আছে, তাহলে তুমি কি অধিকারে তাঁর অধীনে যোগসাধনা করছ, বুঝতে পারি না। যাঁরা সব সময়ই মাকে সন্দেহ করে, সমালোচনা করে, তাঁর কাজে দোষ দেখে বা নিকৃষ্ট মানুষী উদ্দেশ্য আরোপ করে, অথচ তাঁকে স্বীকার করে, আমাকে বা আমার যোগকে গ্রহণ করে, তারা নির্বোধ ও অর্বাচীন ছাড়া

কিছু নয়। বোঝার কথা আলাদা। সাধারণ মনোবৃত্তির উর্দ্ধে তোমায় উঠতে হবে, এবং সত্যিকারের চেতনায় উদ্বুদ্ধ হতে হবে, তাঁর কাজ বোঝবার চেষ্টার আগে। আর তার জন্য প্রয়োজন বিশ্বাস, আত্ম-সমর্পণ, ধৈর্য্য, এবং সরলতা।

৬-১১-১৯২৯

×

তুমি কি করে মায়ের মত বা তাঁর কাজ করবে? এটা দুরাশা বা অহংকার ছাড়া কিছু নয়।

৫-১১-১৯৩২

×

লোকের যে প্রয়োজন আছে, 'ক'র সে ধারণা ভুল নয়। এখন যারা কাজের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আছে, তারা চলে গেলেও এবং তাদের জায়গায় অপর কেউ এলেও যে কাজ চলবে, সে কথা ঠিক। কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সে কাজ খারাপ ভাবে অন্ততঃ আগের চেয়ে খারাপ ভাবে চলবে, এবং অপরে যে আগেকার লোকেদের তুলনায় মায়ের আরও ভাল যন্ত্র হবে, সে কথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না।

'ক', 'খ' বা 'গ' যেসব বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হয়ে আছেন, সেই সব বিভাগ যাঁরা চালাবেন, তাঁদের মধ্যে কতগুলি গুণের সমাবেশ দরকার—যেমন সেই কাজ করবার দক্ষতা, ব্যক্তিত্ব, অপরদের চালাবার ক্ষমতা, এবং সবচেয়ে প্রয়োজন বিশ্বাস, মায়ের ইচ্ছা পালন করবার ঐকান্তিকতা। আরুমে এবং শস্যভাণ্ডারে এখন যে কাজ হচ্ছে, 'ক'-কে ভার দেবার আগে, সেখানে ছিল বিশৃঙ্খলতা, অপচয়, আত্মতুষ্টি, মার আদেশ অগ্রাহ্য করা প্রভৃতি। এখন যদিও কাজ নিখুঁত হয়নি, কেননা যারা কাজ করছে তারাই নিখুঁত নয়, তবুও সে সব চলে গেছে। রান্নাঘরে তোমার এবং শস্যভাণ্ডারে 'ঘ'র উপস্থিতি এই পরিবর্তন আনতে অনেক সাহায্য করেছে। মা যেভাবে চেয়েছেন সেভাবে তোমার সাহায্য ছাড়া গড়ে তোলা খুবই কষ্টকর হ'ত, এবং এই দুটি কাজ অসম্ভব হ'ত। ভগবানের ইচ্ছা তো

রয়েছেই, কিন্তু যে ইচ্ছাকে রূপান্তরিত করতে হয় মানুষের ভিতর দিয়ে-- এবং একটি যন্ত্রের সঙ্গে অন্য যন্ত্রের পার্থক্য থাকে-- সেইজন্যই লোক-বিশেষের প্রয়োজন।

×

'ক' যা উপদেশ দিয়েছে তুমি তা অমান্য করেছ এরকম কোনও কথা আমি বলেছি বলে মনে পড়ছে না। তার কাজের ধারা সম্বন্ধে তুমি যা সমালোচনা করেছ, সেই সম্বন্ধেই বলেছি। বিশেষতঃ তার উপদেশ অনুসারে কাজ করতে যে তোমার ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা হয়, বা মা তোমাকে তার হাতের পুতুল হিসাবে দেখতে চান, তোমার সেই ধারণা বদলে নেবার ইচ্ছাই আমার ছিল। সেখানে অনেক লোককে মিলেমিশে কাজ করতে হয় একটি কোনও বিশেষ উদ্দেশ্যে যেটা কারও ব্যক্তিগত নয় কিন্তু সর্ব-সাধারণের, সেখানে কাজ সুষ্ঠুভাবে করতে হলে, প্রত্যেক লোকের মধ্যেই শৃঙ্খলা বোধ থাকা চাই আর উঁচু নিচু পদ থাকবেই। এ নিয়ম সর্বক্ষেত্রেই, শুধু এখানে সীমাবদ্ধ নয়। 'ক'-কে কাজ করতে হয় মাব অধীনে, তাঁর উপদেশ পালন করতে হয়--তিনি যেমনভাবে চান সেইভাবে চলতে হয়। মা যে ধারা ঠিক করে দিয়েছেন, তাকে সেই ধারা অনুসারে চলতেই হয়--সে ধারা পরিবর্তন বা তার বিপরীত কিছু করার অধিকার তার নেই। যেখানে কাজের জন্য তার নিজের মত দিতে হয়, সে মতও মার ধারা অনুবর্তী হওয়া চাই, মায়ের কাছে তাকে বিবরণী পেশ করতে হয়, তাঁর অনুমতি নিতে হয়, এবং সব বিষয়ে মায়ের মতকেই গ্রহণ করতে হয়, এমন কি যদিও সে মত তার নিজের মতের বিরুদ্ধে যায় তবুও তাকে সেই মত অনুসারেই কাজ করতে হয়। খাবার ঘরের কাজ যে তার ধারণা অনুসারে হয়, মার অনুসারে নয়, এটা ভুল। এ-সবই কাজ করার জন্য দরকার, কারও ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য করার জন্য নয়। ঠিক সেইভাবে তোমাকেও 'ক'র উপদেশ অনুসারে কাজ করতে হবে, কেননা মা তাকেই ভার ও অধিকার দিয়েছেন। খাবার ঘরে যারা কাজ করে তাদের সকলকেই 'ক'র উপদেশ অনুসারে কাজ করতে তাকেই সব জানাতে হয়, কেননা সব কিছুর জন্যই সে মার কাছে দায়ী, এবং এ অধিকার তার না থাকলে তার দায়িত্ব সে পালন করতে পারবে না। ঠিক সেই ভাবে 'খ'-কে তোমার

উপদেশ মানতে হয় রান্নাঘরে কেননা রান্নাঘরের ভার তোমার উপরে। এসবই তোমার বা 'খ'র ব্যক্তিত্বকে অগ্রাহ্য করা নয় বা 'ক'র ব্যক্তিত্বকে তোষণ করা নয়—এরকম বন্দোবস্ত না থাকলে, কাজ সুষ্ঠুভাবে সম্পন্ন হতে পারে না। কাজের প্রয়োজনেই এটা দরকার। এই সবই তোমাকে আমি বোঝাতে চেয়েছিলাম।

অপরদিকে তোমার উপরও কাজের কর্তৃত্ব আছে এবং কাজ করাটা তোমারই হাতে—যদি কোনও অসুবিধা দেখা দেয়, তা 'ক'-কে জানাবার এবং সমাধান চাইবার অধিকার তোমার আছে। তার পক্ষেও তোমার কাছে খবর এবং তোমার মতামত জানবার দরকার আছে। সব জানবার পর সে যদি মনে করে যে তার মত অনুসারেই কাজ হবে, তোমার অনুসারে নয়, তাতে তোমার কিছু মনে করার নেই। দায় তার, আর মায়ের অনুমতির পরিপ্রেক্ষিতে তার নিজের মত অনুসারেই তাকে কাজ করতে হবে। যখনই তুমি তাকে খবর দিয়েছ আর তোমার মতামত জানিয়েছ, তখনই তোমার দায় শেষ। তার মত যদি ভুল হয়, সেটা বদলাবার দায়িত্ব মার।

আশা করি সব কিছুই পরিষ্কারভাবে বলতে পেরেছি। 'ক'র মতের সঙ্গে তোমার মত মিলবার কোনও দরকার নেই—আর কাজের বাইরে, তার কথা তুমি মানতে বাধ্য নও। সেখানে তুমি সম্পূর্ণ স্বাধীন। একমাত্র কাজের বেলায়, কাজের খাতিরেই এটা প্রয়োজন।

মা তোমার কাছ থেকে কি চান, সেটা জানতে চেয়েছিলে বলেই এতো লিখলাম। তোমার উপর কোনও চাপ দিচ্ছি না—সব জিনিষটা বিশদভাবে কারণ দিয়ে বুঝিয়ে দেবার এবং তোমাকে পথ বাতলে দেবার দরকার ছিল বলেই লিখলাম।

৫-৭-১৯৩৭

×

তুমি যদি ব্যাপারটি সম্পূর্ণভাবে মায়ের উপর ছেড়ে দাও, তাহলে বলতে পারি যে মা চান তুমি যে কাজটা করছ সেইটাই ভালভাবে চালিয়ে যাবে, যেসব কথা তোমার চিঠিতে লিখেছ তা দিয়ে এতটুকু বিরক্ত না হয়ে, তোমার নিজের মতের বা প্রাণসত্তার উসকানির উপর জোর না দিয়ে। যা তোমরা করছ সেটা মায়েরই কাজ, নিজেদের নয়, এই নিয়মটা সকলে-

রই পালন করা উচিত। নিজের মত অনুসারে কাজটা করতে হবে এ দাবী করা চলবে না——কেননা তার মানে দাঁড়াবে যে যে কাজটা সে করছে, সেটা তার মায়ের নয়। যদি অসুবিধা, গোলমাল প্রভৃতি দেখা দেয় বা কাজটা সে যেমন ভাবে চায় সেইভাবে হচ্ছে না, তাহলেও সেই অবস্থায় যতোটা সম্ভব, ততোটা ভালভাবে কাজটা চালিয়ে যাওয়া উচিত। বাইরের ঘটনাবলী দিয়ে বিচলিত না হয়ে, স্থিরভাবে নিজের ক্ষমতা অনুসারে কাজটা চালিয়ে যাওয়া, ফল মায়ের উপর ছেড়ে দিয়ে——এটা সাধনার একটা নিয়ম। নিজে যেটা ভাবছ সেটা ঠিক হলেও, সব জিনিসটা এখানে নিখুঁত হবে, এটা এখন আশা করা যায় না। মা যেমন চান সেরকম নিখুঁত ভাবে আশ্রম বা কাজ চলছে না, কিন্তু মা জানেন যে এখনকার পরিস্থিতিতে এবং তাঁর যন্ত্রদের দোষত্রুটির জন্য সেটা এখনও সম্ভব নয়। এখন যতোটা সম্ভব সেই ধারণা নিয়েই তিনি কাজের বন্দোবস্ত করেন। মায়ের বন্দোবস্ত অনুসারে, এই মনোভাব নিয়ে কাজ করে যেতে হবে——আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে ভক্তি, নিয়মানুবর্তিতা, মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ বাড়াবার উপায় হিসাবে কাজটা করতে হবে, নিজের মত, পছন্দ অপছন্দ প্রভৃতির উপর জোর না দিয়ে। এটা করতে পারলে, চেতনায় আধ্যাত্মিক অনুভূতির ও সাধনায় অগ্রসর হবার পথ সুগম করা যায়।

মা কি এবং কেন চান, সেটা বুঝিয়ে বলবার চেষ্টা করেছি। সব রকমের অসুবিধা দোষত্রুটি থাকা সত্ত্বেও স্থিরভাবে, যতোটা সম্ভব ভালভাবে কাজ চালিয়ে যাও এটাই তিনি চান। 'ক' কি করছে বা কিভাবে বন্দোবস্ত করছে তা দিয়ে তুমি বিচলিত হবে না——সে যদি ভুল করে, মায়ের কাছে সে দায়ী হবে, আর মা-ই দেখবেন কি করা উচিত। এইটাই তিনি তোমার কাছে আশা করেন——তুমি যদি এইভাবে চলতে পারো কাজ সুশৃঙ্খলভাবে চলবে, এবং তাঁর লক্ষ্যের দিকেই সব জিনিষ তিনি নিয়ে যেতে পারবেন। তোমার সাধনার পক্ষে এটাই সবচেয়ে ভাল হবে।

৫-৭-১৯৩৭

×

রান্নাঘর থেকে তোমাকে সরিয়ে নিয়ে যাওয়া এবং অপরদের তোমার কাজ করতে দেওয়া চলবে না। এরকম সমাধান তোমার পক্ষে খারাপ

হবে। এর মানে হবে এই যে যে কাজে এতদিন ধরে মায়ের শক্তি তোমার পিছনে ছিল, সেটা হারাবে, আর তোমার ঘরে বসে বসে ভাবা তোমার পক্ষে মোটেই মঙ্গলকর হবে না। রান্নাঘরের পক্ষেও এটা ক্ষতিকর হবে—তোমার কাজ আর কারও দ্বারা সম্ভব হবে না, তাদের নিজস্ব ক্ষেত্রে যতই ভালভাবে কাজ করুক না কেন তারা—মা তোমাকে যে ভার দিয়েছেন, আর কারও উপরে সেটা দেওয়া চলবে না।

যেসব অসুবিধার সম্মুখীন তুমি হয়েছ, সেসব অসুবিধা আশ্রমের প্রতিটি অফিসে বা বিভাগে আছে। সাধকদের নিজেদের দোষত্রুটি এবং তাদের প্রাণসত্তাই এর জন্য দায়ী। তুমি থাকার জন্যই এসব অসুবিধা দেখা দিয়েছে আর তুমি চলে গেলেই সে সব দূর হবে, তোমার এই ধারণা ভুল। সেই একই অবস্থা অপরদের মধ্যে চলবে—মতান্তর, ঝগড়া, হিংসা, কড়া কথা, অপরদের নির্মম সমালোচনা। তোমার কাজে তুমি দৃঢ়, সতর্ক মনোভাব দেখাও বলেই 'ক'র বা আর সকলের তোমার বিরুদ্ধে অভিযোগ। 'খ' বা আর সকলে যারাই মার কাজ সযত্নে করে, তাদের সকলেরই বিরুদ্ধে ঐ একই অভিযোগ। রান্নাঘরে যেমন তোমার বিরুদ্ধে, অন্যত্র তাদেরও বিরুদ্ধে ওঠে সেই একই গুঞ্জন-ধ্বনি ও হিংসা, যে অধিকার তারা মার কাছ থেকে পেয়েছে সেটা ব্যবহারের জন্য। 'খ' বা আর যারা মায়ের বিশ্বাসভাজন, তারা চলে গেলেই এবং অপরে যারা অতো সযত্নে কাজ চালাতে পারবে না, তারা ভার নিলেই সমস্যার সমাধান হবে না।

তোমারও রান্নাঘরের কাজ সম্বন্ধে সেই একই কথা—এটা সমাধান নয়। একথার সমাধান আসতে পারে যদি সাধনার ফলে সাধকদের স্বভাবের পরিবর্তন হয়। ততদিন পর্যন্ত তুমি ধীরভাবে অপরদের আচরণে বিচলিত না হয়ে, তোমার পক্ষে যতটা সম্ভব, ভাল করে কাজ করে যাবে, 'খ' বা মার বিশ্বাসের ও সাহায্যের উপর আস্থা রেখে। তুমি মায়েরই কাজ করছ, আর মা-ই তোমাকে সেই কাজ করতে সাহায্য করছেন। তারই উপর তোমার বিশ্বাস রাখো—অন্য কিছুতে বিচলিত হয়ো না।

১৪-৭-১৯৩৫

×

তোমাকে যারা ঘৃণার চোখে দেখে, তোমার লেখা তাদের বিবরণ পড়ে বিস্মিত হলাম। 'ক'র কথা বাদ দিলে, যারা তোমার সঙ্গে কাজ করছে, তাদের মধ্যে এমন কেউ নেই যে সাধনায় খুব এগিয়ে গেছে, বা যাকে মা অপরদের তুলনায় নিজের বলে মনে করেন। রান্নাঘরে যারা কাজ করে, তাদের মত তুমিও মায়েরই। তিনি সব সময়ই বলেছেন যে তুমি তাঁরই সন্তান, তাঁরই ছোট তারকা--এর চেয়ে বেশী আর কে হতে পারে? কাজেই আমি বুঝতে পারছি না, যে আর কারও ব্যবহারে তুমি এতটা বিচলিত হচ্ছ কেন। আমি তোমাকে বলেছি যে আশ্রমের লোকেদের ভিতরে, এমন কি যাদের কিছু কিছু আধ্যাত্মিক অনুভূতি বা উন্মীলন ঘটেছে তাদেরও ভিতরেও অহঙ্কার, ভুল ধারণা, ভুল পথ অবলম্বন প্রভৃতি রয়েছে। তার জন্য মর্মাহত বা হতাশ হওয়া চলে না। তোমার পক্ষে কর্তব্য হচ্ছে শুধু মায়ের দিকে তাকিয়ে থাকা, আর তাঁর উপর বিশ্বাস রেখে, স্থিরভাবে, তোমার কাজ ও সাধনা চালিয়ে যাওয়া, যতদিন পর্যন্ত না সাধকরা জেগে উঠবে আর পরস্পরের সঙ্গে ব্যবহারে আরও সহযোগিতা ও ঐক্য চাইবে। কেবলমাত্র তোমার আধ্যাত্মিক পরিবর্তন ও অগ্রগতির দিকেই জোর দেবে, আর তার জন্য প্রয়োজন একমাত্র মায়ের শক্তি ও করুণার প্রতি আস্থা। কোনও ঘটনায় বা কারও ব্যবহারে বিচলিত হয়ো না--আধ্যাত্মিক সত্য ও মায়ের পূর্ণচেতনার আলোর দিকে অগ্রসর হওয়ার তুলনায় এসব জিনিষের কোনও মূল্য নেই।

৬-১২-১৯৩৫

×

তোমার চিঠি যে তোমার পুরানো চেতনায় প্রত্যাবর্তন সূচিত করছে, এটা লিখেছিলাম এর সুর দেখে। তুমি লিখেছিলে "আমি এসব সহ্য করব না--আমার পক্ষে চলে যাওয়াই ভাল প্রভৃতি"। এসব সেই পুরানো উসকানি--তোমার যে অন্তঃসত্তা নিজেকে এবং সব কিছুই মায়ের কাছে সমর্পণ করতে চেয়েছিল, তার নয়। তোমার অন্তঃসত্তার ভাব বাইরের জিনিস সম্বন্ধেও প্রসারিত হওয়া উচিত--যা কিছু দোষত্রুটি আছে, প্রত্যেককেই তার নিজের ভিতর থেকে বার করে দিতে হবে, যেমন তোমাকেও করতে হবে, মার সাহায্যে তাঁকে তোমার ভিতরে কাজ করতে দিয়ে।

তোমার আগের চিঠি সম্বন্ধে এই সব লিখলাম। তোমার এই চিঠি সম্বন্ধে বলতে পারি যে যা তুমি দেখ, তা লেখায় কোনও দোষ নেই, কিন্তু তুমি যা দেখছ তার উপর রায় দিচ্ছ সেটা ঠিক নয়। 'ক'র ভুল উদ্দেশ্য, কাজ ভুল-ভ্রান্তির উপর তোমার অভিমত প্রকাশ করেছ। এই সমস্ত কথা বা অভিমত তুমি মায়ের সামনে ধরে দিচ্ছ কেন? যাতে তিনি এই বিষয়ে কিছু করেন, তাই নয় কি? কিন্তু তা করতে হলে, তাঁকে নিজে সিদ্ধান্তে পৌঁছতে হবে এবং তার জন্য দরকার ঘটনার ঠিক ঠিক বিস্তৃত বিবরণ,—সাধারণ ভাবে লেখায় নয়। 'ক' যাকে অন্ধভাবে বিশ্বাস করে বলেছ, তার নাম না জানালে, মা কি করে বুঝবেন 'ক' ভুল করছে কি না? যদি 'ক' কোনও কোনও লোকের কথা শুনে চলে, অপরদের নয়, তাহলে মার জানা দরকার সেই লোকেদের পরিচয় এবং ব্যপদেশে 'ক' তাদের সঙ্গে আলোচনা করে। তবেই তিনি বুঝতে পারবেন 'ক' ভুল করছে না ঠিক করছে। সব জিনিস সম্বন্ধে ঐ একই নিয়ম। অনেকেই 'ক'র বিরুদ্ধে খুব সাধারণভাবে অভিযোগ করেছে, কিন্তু যখনই তলিয়ে দেখা হয়েছে, দেখা গেছে যে দু একটি ছোট খাট ক্ষেত্রে মা 'ক' যা করতে চেয়েছে বদলে দিয়েছেন, তাছাড়া সাধারণভাবে তার কাজ মায়ের নির্দ্ধারিত ধারা অনুসারেই চলেছে। কথা বলার ধরন, চরিত্রের দোষত্রুটি ছোটখাট বিষয়ে ভুল সিদ্ধান্ত—এসব অন্য ব্যাপার। প্রত্যেকেরই এসব দুর্বলতা আছে এবং আমি যা প্রায়ই বলে আসছি, এসব ভিতর থেকে বদলাতে হবে। কিন্তু আমি বাইরের জিনিষ, কোনও বিশেষ ঘটনা, বা বিশেষভাবে কোনও কাজ করার কথাই বলছি। তার কোন বিশেষ কাজে অভিযোগ উঠছে সেটা সবিশেষ মাকে জানাতে হবে।

যদি তোমার অভিযোগ, খাবার ঘর ও আরুমে বাড়ীতে কাজ সম্বন্ধে, সাধারণভাবে না হয়, কিন্তু তোমার নিজের বা তোমার কাজ সম্বন্ধে হয়, সে ক্ষেত্রেও সে কি করেছে বা করেনি, সেটা সবিশেষ জানাতে হবে; তবেই মা সিদ্ধান্ত নিতে পারবেন বা কিছু বলবেন বা করবেন। তোমার কাজ বা তোমার সম্বন্ধে ঠিক কেন জিনিষটা সে মাকে বলেনি বা ভুল বলেছে? কি কি সুবিধা তুমি চেয়েছ, যা সে দেয়নি?

আমার মনে হচ্ছে যে তুমি চাও 'মা' কিছু করেন, তাই এতো লিখলাম। এ অভিযোগটা ঠিক কি, এর ভিত্তিই বা কি, বা তিনি এটা করবেন কিনা বা কাজের দিক দেখলে করা উচিত কিনা, এসব তাঁর জানা দরকার।

খাবার ঘরে আর আরুমে বাড়ীতে ঝগড়া-ঝাঁটি ও অহংয়ের বিরোধ চলেই আসছে, কিন্তু তার উপর ভিত্তি করে তিনি কোনও কাজ করতে চান না। এসব বিষয়ে তিনি কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন না। কাজের জন্য ঠিক কোনটা করা উচিত বা দরকার তাই তাঁর দেখা দরকার।

৩-১০-১৯৩৬

×

এটা যদি ঐরকম হয়, তার কারণ সম্ভবতঃ তুমি বাইরের জীবন যাপন করছ এবং বাইরের ঘটনাবলীকে তোমাকে বিচলিত করবার সুবিধা দিচ্ছ। অন্তরের জীবন যাপন না করলে, স্থায়ী আনন্দ কেউ পায় না। কাজ, কর্ম সবই মাকে সমর্পণ করতে হবে, শুধু তাঁর জন্যই করতে হয়, নিজের কথা, ধারণা, পছন্দ, অপছন্দ, প্রভৃতির কথা চিন্তা না করে। যদি এই সব জিনিষের দিকে নজর থাকে, তাহলে প্রতি পদেই মনের বা প্রাণের জগতে সংঘাত ঘটে, বা মন ও প্রাণ যদি অপেক্ষাকৃত শান্ত থাকে, অন্ততঃ দেহে বা স্নায়ুতে তা ঘটে। কেবলমাত্র অন্তরে যদি কেউ মায়ের সঙ্গে যুক্ত-ভাবে বাস করতে পারে, তবেই শান্তি বা আনন্দ স্থায়ী হয়।

২-১-১৯৩৭

×

ওটা ঠিকই। কিন্তু যা আমি লিখেছিলাম সে নিয়ম কেবল তোমার একার জন্য নয়। 'ক' বা আর সকলেরই এ নিয়ম পালন করা উচিত। কাজকর্ম যখন ঐভাবে করা হয়, কেবলমাত্র ভগবানের জন্য, নিজের কথা না ভেবে নিজের মতামত প্রভৃতির উপর জোর না দিয়ে, তখনই তা সাধনার রূপ নেয় সম্পূর্ণভাবে, এবং অন্তরের ও বাইরের প্রকৃতিতে একটা ছন্দ আসে। অন্তঃপুরুষের পক্ষে তখন বাইরের কাজকে গ্রহণ করা, আলোকিত করা, নিজের পিছনে মায়ের শক্তি কাজ পরিচালিত করছে সে বিষয়ে সচে-তন হওয়া আরও সহজ হয়।

৩-১-১৯৩৭

×

সময় নির্দিষ্ট করে দেওয়া সম্ভবপর নয়, উচিতও নয়। তোমার নিজের পক্ষেই সময় এমনভাবে ভাগ করে নেওয়া দরকার, যাতে তার সর্বচেয়ে ভাল ব্যবহার হয়, আর সেটা তুমি মাকে জানাবে।

সবচেয়ে দরকারী হচ্ছে অন্তরে কেবলমাত্র মায়ের দিকেই তাকানো, বাইরে বহুলোকের সঙ্গে সম্পর্ক এড়ানো দরকার এই কারণেই। কিন্তু লোকের সঙ্গে সম্পূর্ণভাবে সম্পর্ক ত্যাগ করা দরকারীও নয়, উচিতও নয়। আসল দরকার হ'ল, ঠিক মন নিয়ে এই সব সম্পর্ক স্থাপন করা,--এগুলিকে উপরের জিনিষ হিসাবে দেখা, এতে আসক্ত বা নিমগ্ন না হওয়া।

হ্যাঁ, নিশ্চয়ই তোমাব অন্তরে একমুখী অবস্থায় মার সঙ্গে সংস্পর্শ ঘটেছিল। ফুল সবসময়ই চেতনার কোনও স্তরে (সাধারণতঃ চৈত্যের) উন্মীলন বোঝায়।

২৮-১০-১৯৩৩

×

প্র ঃ বাহ্য মন দিয়ে কি মায়ের কাজ ঠিক বোঝা যায়?

উ ঃ না, যতক্ষণ পর্যন্ত না এ উপরের সত্য চেতনায় ও জ্ঞানে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠে।

৪-৭-১৯৩৬

প্রণামের সময় মা কি করেন

প্র ঃ প্রণামের সময় মা কি অধিমানস স্তর থেকে কাজ করেন?

উ ঃ সাধারণ অধিমানসের স্তর থেকে নয়, তার উপরের শক্তি থেকে। স্বভাবতঃই অধিমানসকে পথ হিসাবে ব্যবহার করতে হয়।

২২-১১-১৯৩৩

×

প্রঃ সন্ধ্যার সময় যখন আমার দেরী হয়ে যায় আর মার দেখা পাই না, উপস্থিত থাকলে যেমনভাবে পেতাম, সেইভাবেই কি তাঁর আলো পাই?

উঃ সব সময়ই তাঁর আলো পেতে পারো––সামনে থাকলে যতটা পাও তার চেয়ে কিন্তু কিছু কম।

১-৯-১৯৩৩

×

অন্তরের স্পর্শ মানে অন্তঃপুরুষে মায়ের প্রভাব।

৬-২-১৯৩৬

×

প্রঃ প্রণামের সময় মার কাজ ঠিক বুঝতে পারি না তিনি কি দেন বা আমি কিভাবে তা নিই। আমার মাথার উপর তাঁর পরশের বা আমার চোখের ভিতর তাঁর চেয়ে দেখার গুহ্য মানে কি?

উঃ অন্তরে স্বতঃস্ফূর্তভাবে জবাব দেওয়ার ক্ষমতাটা তোমায় আগে বাড়াতে হবে। অর্থাৎ কিনা, মন দিয়ে দেখা বা চিন্তা করা কমিয়ে অন্তঃ-চেতনা দিয়ে করতে হবে। অধিকাংশ লোকেই মন দিয়ে সব করে। কিন্তু মন কি সত্যই জানতে পারে? জানবার জন্য মনকে ইন্দ্রিয়গুলির উপরই নির্ভর করতে হয়।

১০-৭-১৯৩৬

×

প্রঃ প্রণামের সময়, বিশেষভাবে চেয়ে মা কি বোঝাতে চান? সেই সব লোকেদের কাজে সন্তুষ্ট কি অসন্তুষ্ট,

তাই কি?

উঃ তিনি কোন কিছুই বোঝাতে চান না। সাধকদের কাজের বা দোষত্রুটির সঙ্গে এর কোনও সম্পর্ক নেই। প্রণামের মানে এটা নয় যে তোমরা সে সময় লক্ষ্য রাখবে মার দৃষ্টির দিকে, বা তিনি কার সঙ্গে কি রকম ব্যবহার করেন, কিভাবে তিনি হাসেন, বা কতোটা হাত দিয়ে তিনি আশীর্বাদ দিচ্ছেন। সাধকদের এভাবে ব্যস্ত থাকা শিশুর মনোবৃত্তি, আর অধিকাংশ সময়ই এ থেকে আসে ভুল অনুমান, কল্পনা, ঔৎসুক্য, আড্ডা দেওয়ার প্রবৃত্তি, সমালোচনা প্রভৃতি। মানর এরকম অবস্থা সাধনার প্রতিকূল হয়, অনুকূল নয়। আত্মসমর্পণ, সোজা সরলভাবে মা যা দিচ্ছেন তা গ্রহণ, ধীর অচঞ্চলভাবে সত্তার উন্মীলন তাঁর কাজের জন্য, এইসবই হচ্ছে ঠিক মনোভাব।

×

অনেক সাধকই মনে করে যে মা তাদের উপর অসন্তুষ্ট হয়েছেন, বা হাসছেন না, বা রাগ করেছেন, প্রকৃতপক্ষে যদিও তার উল্টোটাই ঠিক। সচরাচর, যখন তাদের চেতনা অশান্ত থাকে, বা তারা তাদের দোষত্রুটির বা অন্যায় কাজের কথা ভাবে, বা সে সম্বন্ধে সচেতন থাকে, তখন এটা ঘটে। 'মা' রেগে গেছেন এটা কল্পনা মাত্র। যদি অস্বাভাবিক কিছু হয়, সেটা সাধকেরই অন্তরে মায়ের নয়।

×

মায়ের শক্তি ধীরে ভালভাবে নামতে পারে, তার সঙ্গে ধড়্ফড়ানি, মাথা-ঘোরা, বা বমির ভাবের কোনও সম্পর্ক নেই।

মা তোমার উপর মোটেই রাগ করেননি, মনে হয় তুমি ভয় করেছিলে যে তিনি রাগ করবেন এবং ঐভাবে দেখবেন।

সব সাধকই ঐরকম করে মায়ের মুখে বা ব্যবহারে তাদের নিজেদের কল্পনার রং ফলায়। তাদের এ অভ্যাস আমি আজ পর্যন্ত বদলাতে পারলাম না।

×

মা তোমার উপর কঠোর হয়েছিলেন এরকম চিন্তাধারা আসতে এবং তোমাকে নীচে নামিয়ে দিতে দিয়েছিলে, এটা বড়োই পরিতাপের বিষয়। এরকম ধারণা সব সময়ই ভুল, আর যখনই কোনও সাধক এরকম ধারণাকে আমল দেয়, তখনই পুরানো সব অভ্যাস তাকে অভিভূত করে ফেলে। মায়ের ভালবাসা বা করুণা সব সময়ই একইভাবে তোমার উপরে আছে বা থাকবে। মা তোমার উপর কঠোর বা অসন্তুষ্ট হয়েছেন, এরকম ধারণা মনে বিন্দুমাত্র স্থান দিয়ো না। ভুল, ত্রুটি, অসুবিধা তোমার যাই থাকুক না কেন। মায়ের শক্তি সব সময়ই তোমাকে উদ্ধার করবে, আর চৈত্যের উন্মীলন ও শান্তি ফিরিয়ে আনবে। যা তুমি এবার অনেক দিন ধরেই পেয়েছিলে, তা ফিরে আসবেই এবং কিছু কাল পরে স্থায়ী হবে।

১৯-১১-১৯৩৫

×

প্র ঃ লোকেরা যখন মার সামনে দিয়ে প্রণামের জন্য যায়, তখন সময় সময় একটা অবসাদ এসে ঘিরে ফেলে। মা হাসেন কি না হাসেন, তার সঙ্গে এর বিশেষ সম্পর্ক আছে।

উ ঃ অনেক সাধকেরই এরকম ধারণা আছে বলে এটা হয়। অচঞ্চল একাগ্র হয়ে মায়ের কাছে কিছু নেওয়ার পরিবর্তে, তারা লক্ষ্য করে মা হাসছেন কিনা, কিভাবে হাসছেন, বা কি করছেন। কাজেই সেখানকার আবহাওয়া এতেই পূর্ণ।

৬-১০-১৯৩৩

×

প্র ঃ মায়ের চোখে চোখ রাখবার সময় বাহ্য সত্তা চায় যে মা যেন হাসেন। এটা কি কোনও রকমের আকাঙ্ক্ষা?

উ ঃ হ্যাঁ। এটা না এলেও উতলা হবে না (কেননা এর মানে অস-

ন্তোষ বা ঐ ধরণের কিছু নয়)। তাহলেই পাওয়ার আনন্দ আরোও পবিত্র হবে।

১১-১২-১৯৩৩

×

প্রঃ মা না হাসলে বা মাথায় হাত না দিলে আমাদের অহং যদি বিদ্রোহ ঘোষণা করে, তাহলে এ অবস্থায় কখনও কখনও এ শান্ত থাকে কি করে?

উঃ অহং যখন প্রধান থাকে, তখন এসব ঘটে। যখন এর প্রাধান্য, বা উপস্থিতি পর্যন্ত থাকে না, তখন এই সব উদ্দেশ্য বিফল হয়ে যায়। অহং চালাচ্ছে বা অন্য কিছু চালাচ্ছে, সেটাই হল মূল প্রশ্ন। যদি উচ্চতর চেতনা প্রবলতর থাকে, তাহলে মা না হাসলেও বা মাথায় হাত না দিলেও, অহং চুপ থাকে। সমাধিস্থ থাকার জন্য 'মা' একবার একটি সাধিকার সঙ্গে এইরকম ব্যবহার করেছিলেন, কিন্তু ফলে হ'ল কি সে মায়ের শক্তি ও আনন্দ আরও প্রবলভাবে পেল। মা আগে তার মাথায় পুরা হাত রাখলে যা পেত তার চেয়েও বেশী।

১১-১১-১৯৩৫

×

প্রঃ কাল প্রণামের সময় মা আমার মাথায় হাত দিয়ে আশীর্বাদ করেননি, কিন্তু স্বাভাবিকের তুলনায় আমি ঢের বেশী আনন্দিত ও খুশী হয়েছিলাম। কেন এতে আমি বেশী আনন্দ পেয়েছিলাম? কেবল আমার বেলায়ই এটা হ'ল কেন?

উঃ এটা ঠিক নয়---অপরদের বেলায়ও এটা ঘটেছে। তাদের মধ্যে অন্ততঃ একজন এরকম অবস্থায় আগের তুলনায় ঢের বেশী মায়ের শক্তি

নিজের মধ্যে প্রবাহিত হতে দেখেছিল।

×

প্রঃ আমি লক্ষ্য করছি যে প্রতিদিন সন্ধ্যায় কোনও সত্তা আমাকে ভুল পথে নিয়ে যাবার জন্য মিথ্যা বলছে "ভগবান তোমাকে পছন্দ করেন না"। আজকাল তাদের জোর বেড়েছে। আমি খুব চেষ্টা করছি সেগুলি অপসারণ করতে, কিন্তু পারছি না। মা যেন এই সত্তার আমার কাছে আসা বন্ধ করেন। কে এই সত্তা? প্রাণজগতের কেউ কি?

উঃ হ্যাঁ, এ একটি প্রাণজগতের মিথ্যার সত্তা। সত্যের পরিবর্তে এর মিথ্যা প্রেরণা নেবার জন্য ও যাতে সেই লোক সোজা পথ ছেড়ে দেয় এবং অবসন্ন হয় বা মার বিরুদ্ধে ঘুরে দাঁড়ায়, এই চেষ্টাই এ করে। তুমি যদি একে প্রত্যাখ্যান করো বা এর কথা শোনা বা বিশ্বাস করা থেকে নিবৃত্ত হও, তাহলে এ পালাবে।

৩০-৩-১৯৩৩

×

সাধকের পক্ষে যেমন অপবিত্রতা নিজের মধ্যে টেনে আনবার কোনও কারণ থাকে না, মার বেলায়ও তাই। অপবিত্রতাকে প্রত্যাখ্যান করতে হবে, টেনে আনতে হবে না।

১৮-৩-১৯৩৬

×

মায়ের সাময়িক অপসরণের কারণসমূহ

যতদিন পর্যন্ত প্রাণসত্তা ভুল স্থান থেকে মার দিকে অগ্রসর হবে,

যেমন তার আশা আকাঙক্ষা মা পূরণ করছেন কিনা, ততদিন পর্যন্ত বাহ্য মনের ও প্রাণসত্তায় সন্দেহ, আলোড়ন, বিশৃঙ্খলা আসবেই। নিজের ইচ্ছাকে ভগবানের উপর না চাপিয়ে ভগবানের ইচ্ছার কাছে সমর্পণ করাই সাধনার অনুকূল প্রকৃত মনোভাব। "এটা আমার চাই, আমার দাবী, অধিকার বা প্রয়োজন--কেন আমি এটা পাচ্ছি না" এটা না বলে, নিজেকে সম্পূর্ণভাবে উজাড় করে উৎসর্গ করে দেওয়া, ভগবানের কাছ থেকে যা পাওয়া যায় সেটাই সানন্দে গ্রহণ করা, দুঃখ বা বিদ্রোহ না করা, এই হচ্ছে সত্যিকার পথ। তাহলে সে যা পাবে সেটাই তার প্রাপ্য। এসব তুমি ভাল করেই জান। তবে কেনই বা তোমার বাইরের প্রাণসত্তাকে এটা ভুলে যেতে দাও, বা আগেকার ভুল পথে টেনে নিয়ে যেতে দাও?

কাজের ও সাধনার প্রয়োজনেই মা সাধকদের সম্পর্কে তাঁর পূর্বেকার কর্মসূচীর পরিবর্তন করেছেন। সব জিনিষটাই একটা ভুল আবর্তে পড়ে রাজসিক তামসিক পাকে খাঁচায় কাঠবেড়ালের মত ঘুরপাক খাচ্ছিল, নানারকম জিনিস মিশে গিয়েছিল, ভুল মনোভাব এসেছিল--কোনও সমাধান পাওয়া যাচ্ছিল না। এইভাবে যে আর চলা যাবে না, মায়ের অসুখ সেইটাই সূচিত করেছিল স্পষ্টভাবে। সাধকদের ভুল আচরণই জড়জগতে সত্যের অবতরণে বাধা দিচ্ছিল, এবং এখন একটা নতুন কার্যসূচী, কর্মধারা গড়ে তুলতে হবে যাতে আগেকার ভুলত্রুটির স্থান একেবারেই থাকবে না। একদিনে এর ভিত্তি স্থাপন করা যাবে না--কিন্তু মাকে সরে দাঁড়াতেই হয়েছে, তা না হ'লে একে গড়া অসম্ভব।

৭-১২-১৯৩১

১০

বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা

বিপদে মায়ের রক্ষাকারিতা

বিজয় সুনিশ্চিত

নিশ্চয় ক'রে জানবে, পথে তোমাকে চালিয়ে নিয়ে যেতে মা সর্বদাই তোমার সাথে সাথে আছেন। কত বিপদ আসে আবার বিপদ চলেও যায়, কিন্তু তবু মা যখন তোমার সাথে আছেন তখন বিজয়লাভ সুনিশ্চিত।

১৮-৭-১৯৩৬

মায়ের ক্রিয়াতে আস্থা

বাইরে যাই দেখা যাক, তার পিছনে মায়ের কাজ হচ্ছে এই বিশ্বাসটি নিয়ে থাকো, দেখবে যে ওতেই তোমাকে সব কিছু পার করিয়ে দেবে।

৩১-৮-১৯৩৫

×

মায়ের উপর পুরো আস্থা রেখে সবই মায়ের হাতে ছেড়ে দিলাম, তিনিই পথ পার করিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছে দেবেন, এই হলো যথার্থ মনোভাব।

২-৩-১৯৩৬

×

কেউ তার আপন শক্তিতে বা আপন গুণে দিব্য পরিবর্তন লাভ করতে পারে না; ওতে কেবল দুটি জিনিস চাই,—মায়ের শক্তির ক্রিয়া, আর সাধকের ইচ্ছার সেই দিকে উন্মীলন, মায়ের ক্রিয়াতে বিশ্বাস রেখে। তোমার ঐ ইচ্ছাকে ও তোমার বিশ্বাসকে অটুট রাখো, আর কোনো কিছুকে গ্রাহ্য-

মাত্র না ক'রে––বাধাবিঘ্ন সকলেরই বেলাতে আসে যারা সাধনা করে।

১৩-৫-১৯৩৬

×

তোমার চৈত্য প্রকৃতি যদি জাগ্রত হয়ে ওঠে আর মায়ের চেতনা ও শক্তি তার পিছনে তোমার মধ্যে কাজ করতে থাকে, তাহলে কোনো কিছুই অসম্ভব নয়।

১৯-১০-১৯৩৫

×

মায়ের উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে যদি চৈত্যভাবে উন্মীলিত হয়ে থাকো, তাহলে মায়ের শক্তি সব কিছুই করবে, তোমায় কেবল তাতে সম্মতি দিয়ে খোলা থেকে আস্পৃহা করতে হবে।

১২-১১-১৯৩৫

×

উন্নতি শীঘ্রই হোক কিংবা বিলম্বেই আসুক, মায়ের উপর পূর্ণ আস্থা ও নির্ভরতা সর্বদাই সমানে অটুট রাখতে হবে। তোমার যে উন্নতিটা হয়েছে তা যেমন তোমার আপন গুণে বা আপন চেষ্টাতে নয় কিন্তু মায়েরই শক্তির ক্রিয়ার উপর নির্ভরতার দ্বারাই তা হয়েছে এটা তুমি জানছো–– তেমনি এ কথাও জানবে যে বিলম্ব কিংবা বাধাও তোমার নিজের দোষে নয়, তোমার কাজ শুধু নির্ভরতা নিয়ে থাকা আর মায়ের শক্তিকে কাজ করতে দেওয়া––দ্রুত কিংবা বিলম্বিত হওয়াতে কিছু যায় আসে না।

১৪-১১-১৯৩৫

×

তা নয়। হয়তো তোমার প্রাণসত্তার বা দেহ চেতনার কোনো অংশ

ঐরকম ধারণা ক'রে নিয়েছে। কিন্তু এ পথ নিঃসহায় মরুপথও নয়, আর তুমিও নিতান্ত নিঃসঙ্গ নও, কারণ মা যে তোমার সাথে সাথেই আছেন।

২-১১-১৯৩৩

মা সর্বদা হাঁ-এর দিকে

মা কখনো ভবিষ্যতের বিঘ্ন বিপদ বা পতনের সম্বন্ধে ভাবেন না। সর্বদাই তিনি একাগ্র থাকেন প্রেম ও আলোর দিক দিয়ে, বিপত্তি কিংবা পতনের দিকটা ভাবেন না।

×

জগতে সর্বোচ্চ বাস্তব সত্যকেই মা আনছেন—যা ছাড়া বাকী সব কিছুই অজ্ঞান ও মিথ্যা।

৩-৮-১৯৩৪

একমাত্র যা করণীয়

একবার যখন যোগের পথে পা দিয়েছ, তখন তোমার একমাত্র কাজ হবে অটুট সংকল্প স্থির ক'রে রাখা যে শেষ অবধি তোমাকে যেতেই হবে, তাতে যাই কেন ঘটুক বা যত বাধাই আসুক। কারোই আপন ক্ষমতায় সিদ্ধিলাভ হয় না—তোমার মাথার উপরে যে বৃহত্তর শক্তি কাজ করছে তারই দ্বারা তা আসে—সুতরাং সকল রকম উত্থান পতনের ভিতর দিয়ে নিরবচ্ছিন্নভাবে তাকেই নিরন্তর আহ্বান করতে থাকো, ওতেই সিদ্ধি মিলবে। এমন কি যদি সক্রিয়ভাবে আস্পৃহাও না করা যায়, তথাপি সাহায্যের জন্য মাকেই ডাকতে থাকো—সর্বক্ষণের জন্য এই একমাত্র করণীয়।

৩-১-১৯৩৪

×

যে কেউ মায়ের দিকে ঝুঁকেছে সেই আমার যোগ করছে। এই পূর্ণ যোগ যথার্থপক্ষে কেউই "করতে" পারে, অর্থাৎ নিজেব চেষ্টাতে এর সকল দিক পূরণ করতে পারে, এমন মনে করা মস্ত ভুল। কোনো মানুষই তা পারে না। তবে যা করা দরকার তা হলো এই—মায়ের হাতে নিজেকে সঁপে দেওয়া, এবং তাঁর কাজ ও সেবাব ভিতব দিয়ে এবং ভক্তিব দ্বারা ও আস্পৃহার দ্বারা নিজেকে তাঁর দিকে খুলে রাখা; তখন মায়ের আলো এবং শক্তি তোমাব মধ্যে গিয়ে কাজ কববে, আব তাতেই তোমাব সাধনা হবে। আর এও খুব ভুল করা হয় যদি তুমি উচ্চাকাঙ্খা কবো যে আমি মস্ত বড়ো এক পূর্ণযোগী হবো কিংবা অতিমানস সত্তা হবো, আব কেবল দেখতে থাকো যে ঐদিকে কতখানি এগোলাম। তাব বদলে ঠিক জিনিস হবে যদি তুমি মাকে ভক্তি ক'বে তাঁব কাছে উৎসর্গীকৃত হয়ে থাকো, তোমাকে নিয়ে তাঁর যা ইচ্ছা তাই করুন। তোমাব সম্বন্ধে বাকী যা কিছু করবার তা তিনিই স্থির করুন।

এপ্রিল ১৯৩৫

×

একটা কথা প্রত্যেকেরই স্মরণ বাখা চাই যে সব কিছুই করতে হবে যোগের এবং সাধনাব দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে, মায়েব চেতনাতে দিব্যজীবনে প্রবেশের দিক দিয়ে। নিজের মনের ধাবণাকে আঁকড়ে থাকা, নিজের প্রাণের অনুভব ও প্রতিক্রিয়া অনুযায়ী চালিত হতে থাকা, এখানকার জীবনে সে নিয়ম চলবে না। ওর থেকে নিজেকে পৃথক ক'রে সরিয়ে নিতে হবে, তার বদলে সেখানে উপরের সত্য জ্ঞানকে এবং ভিতরের চৈত্যের সত্য অনুভূতিকে স্থান দিতে হবে। কিন্তু মন ও প্রাণ যদি সমর্পিত না হয়, যদি আপন অজ্ঞানতাকেই সঠিক সত্য ও ন্যায়সঙ্গত বলে তাকে ছাড়তে না চায় তাহলে ওটা হতে পারে না। যত কিছু কষ্ট এবং গণ্ডগোল ওর থেকেই আসে। ওগুলিকে যদি জয় করতে পারো, তাহলে জীবনের ও কর্মের মধ্যে একটা সঙ্গতির ভিত্তি স্থাপিত হবে, আর বর্তমানের যা কিছু দুঃখ দুর্গতি উত্তরোত্তর ভগবৎ মিলনের দ্বারা সমস্তই ঘুচে যাবে।

বিপদে মায়ের শক্তিতে বিশ্বাস

চাই কেবল অধ্যবসায়—নিরুৎসাহ না হয়ে এই কথা জানা যে প্রকৃতির ও মায়ের শক্তির ক্রিয়া সকল বিঘ্নবিপদের ভিতর থেকেও কাজ ক'রে যাচ্ছে এবং যা করা দরকার তা করবেই। আমাদের অক্ষমতায় কিছু যায় আসে না—এমন কোনো মানুষ নেই যে তার প্রকৃতির কোনো অংশেই অক্ষম নয়—কিন্তু অপরপক্ষে দৈবী শক্তিও বর্তমান। তার উপরেই যদি বিশ্বাস রাখো তাহলে ঐ অক্ষমতাও রূপান্তরিত হয়ে যাবে ক্ষমতায়। বিপদ এবং সংঘাত, এইগুলোই তখন সার্থকতা লাভের উপায়স্বরূপ হয়ে যাবে।

২৭-৫-১৯৩৬

×

এ কথাকে কখনই মনে স্থান পেতে দিও না যে, "আমি অশক্ত", "আমার যথেষ্ট করা হচ্ছে না"; এগুলি হলো তামসিক প্ররোচনা, ওতে আনে হতাশা, আর তার থেকে এসে পড়ে অন্যায় শক্তিদের আক্রমণ। ওর বদলে এই মনোভাবটি নেওয়া চাই, "আমার যেমন সাধ্য তাই ক'রে যাই; মায়ের শক্তি তো রয়েছে অথবা ভগবানই রয়েছেন, তিনিই দেখবেন এবং যথাসময়ে সব কিছুই হয়ে যাবে"।

৪-১১-১৯৩৫

×

বিচলিত না হয়ে স্থির ও আস্থাবান হয়ে থাকাই ঠিক জিনিস, কিন্তু তাছাড়া মায়ের সাহায্যও গ্রহণ করা চাই, কোনো কারণে তাঁর দান থেকে সরে না দাঁড়িয়ে। নিজের অক্ষমতা বোধ, ঠিক মতো সাড়া জাগছে না, নিজের দোষত্রুটি ও ব্যর্থতার কথাই ভেবে ভেবে মনকে অনর্থক পীড়িত ও লজ্জিত করা,—এসব জিনিসকে প্রশ্রয় দেওয়া উচিত নয়, কারণ ওতে কেবল দুর্বলতাই আসে। বিপত্তি কিংবা ব্যর্থতা কিংবা পদস্খলন যদিও হয়, তথাপি তাকে স্থিরভাবে লক্ষ্য ক'রে শান্তভাবে অবিরাম প্রার্থনা করবে তাকে দূর

ক'রে দিতে মায়ের সাহায্যের জন্য, কিন্তু নিরাশ বা কাতর বা উদ্‌ভ্রান্ত কোনোমতেই হবে না। যোগের পথ নিতান্ত সহজ নয় আর প্রকৃতির সম্পূর্ণ রূপান্তর এক দিনেই হতে পারে না।

×

এই ধরনের শোক করা ও নিরাশ ভাব আনা সাধনার পক্ষে সব চেয়ে মারাত্মক অন্তরায় সৃষ্টি—ওকে কিছুতেই প্রশ্রয় দেবে না। তুমি নিজে যেটা করতে পারছ না তা মায়ের শক্তিকে ডেকে করিয়ে নেবে। মায়ের শক্তিকে গ্রহণ ক'রে তাকে তোমার মধ্যে কাজ করতে দেওয়াই হলো সাধনাতে সাফল্য লাভের প্রকৃষ্ট উপায়।

×

বাধাবিঘ্ন যদি তবুও কিছু থাকে তাও উত্তীর্ণ হয়ে যাবে। তার জন্য বাহ্য সত্তাতে উদ্বিগ্ন হতে হবে না—মায়ের শক্তি এবং তোমার ভক্তি ঐসব বাধাকে দূর করার পক্ষে যথেষ্ট।

×

নিরুৎসাহ হবার কোনোই কারণ নেই। তিনটি মাত্র বছর প্রকৃতির প্রস্তুতির পক্ষে যথেষ্ট নয়, এমনি নানা ব্যতিক্রমের ভিতর দিয়েই ক্রমশ সেই অবস্থাতে পৌছানো যায় যখন বিনা ব্যতিক্রমে অগ্রগতি হতে পারা সম্ভব হয়। অবস্থা যেমনই হোক তার পিছনে মায়ের কাজ ঠিক চলছে এই বিশ্বাসটিকে আঁকড়ে থাকো, এতেই তোমাকে সব কিছু পার করিয়ে দেবে।

৩১-৮-১৯৩৫

×

এমন ক'রে বিষাদ ও হতাশাকে প্রশ্রয় দিও না—তার কোনো কারণ

হয়নি। মায়ের কৃপা তোমার দিক থেকে এক মুহূর্তের জন্যও সরে যায়নি। অন্য কোনো শক্তির আক্রমণ যেন তোমাকে এমন ক'রে নাড়া দিতে না পারে—যখন তুমি জানোই যে তাদের কি মতলব—তা ছাড়া একটা আবেগের সুযোগ পেয়ে তারা যা করতে পেরেছে তা আর পারবে না। মা তোমাকে রক্ষা করছেন, তোমার ভয় পাবার বা দুঃখ করবার কিছু নেই। মায়ের উপর বিশ্বাস রেখে এগুলিকে দুঃস্বপ্নের মতো ঝেড়ে ফেল। আমাদের কৃপা ও ভালোবাসা ঠিকই রয়েছে তোমার জন্য একথা জেনে রাখো।

×

তোমার আপন মনের ক্রিয়া ও ইচ্ছার উপর বড় বেশি নির্ভরতা রেখেছ—তাই কোনো উন্নতি হচ্ছে না। মায়ের শক্তির উপর নীরবে নির্ভর করতে যদি শিখে নিতে পারো—কেবল তোমার প্রয়াসকেই সমর্থন করতে মাকে ডাকা নয়—তাহলে ঐ বাধা তোমার অনেক কমে আসবে আর শেষ পর্যন্ত ঘুচেও যাবে।

×

মায়ের ক্রিয়ার দিকে যতই উন্মীলিত হতে পারবে ততই সকল বিপত্তির সহজ মীমাংসা হয়ে ঠিক জিনিস এসে যাবে।

২১-৯-১৯৩৪

×

নির্দেশ না নিয়ে নিজে ব্যক্তিগত প্রয়াস করতে গিয়েছিলে তাই এমন বিঘ্নসূচক উত্তপ্ত অবস্থা ঘটেছিল যে ধ্যান প্রভৃতি কিছুই করা যায়নি। আমি তোমাকে ও চেষ্টা ছেড়ে দিয়ে নীরব হয়ে থাকতে বলেছিলাম, তাই তুমি তখন করেছিলে। আমার উদ্দেশ্য ছিল এই যে নীরব থাকলে মায়ের শক্তি তোমার মধ্যে কাজ করতে পারবে এবং ভালো রকমের সূচনার দ্বারা তোমার মধ্যে একটা প্রাথমিক অনুভূতির ধারা আসবে। এবং তাই আসতে শুরুও করেছিল; কিন্তু তোমার মন আবার সক্রিয় হয়ে উঠে যদি নিজের

সাধনার ব্যবস্থা নিজেই করতে যায় তাহলে ঐ সব বিপত্তি আবার এসে পড়তেই পারে। দৈবী নির্দেশ সব চেয়ে ভালো কাজ করে চৈত্য সত্তা সামনে প্রকট থাকলে (তোমার তাও হচ্ছিল), কিন্তু সাধক নিজে ও বিষয়ে চেতন না থাকলেও তা হয় এবং তখন সে ফল দেখেই তবে জানতে পারে।

বিপদের অস্তিত্ব ও মায়ের কৃপা

প্র ঃ বিপদ গেল না তবুও মায়ের কৃপা রয়েছে, একথা কি বিশ্বাস করব?

উঃ তাহলে সবাই তো এমন কথা বলতে পারে, "আমার সকল বিপদ এখনই ঘুচে যাওয়া চাই, আর বিনা বিপদে আমার পূর্ণতালাভ করা চাই, নতুবা বুঝবো যে মায়ের কৃপা আমার প্রতি নেই"।

২০-৭-১৯৩৩

×

ঐসব জিনিসকে ঝেড়ে ফেল। অমন বিক্ষুব্ধ হয়ে থাকলে মা যা তোমাকে দিচ্ছেন তার দিকে তোমার দরজা বন্ধ করা হয়ে যাবে। এমন মনোভাব আসবার কারণ কিছুই নেই। বিপদ আপদ থাকবে এটা যোগের সম্বন্ধে জানা কথা। কিন্তু তা আছে বলে শেষ বিজয় সম্বন্ধে কিংবা ভগবৎ কৃপা সম্বন্ধে সন্দেহ করার কোনোই হেতু নেই।

৪-২-১৯৩৩

চৈত্যের বিকাশ ও মায়ের কৃপা

প্র ঃ মায়ের কৃপা সক্রিয় হবার সম্পর্কে নিয়ম কি?

উঃ চৈত্য যতই বিকাশ পাবে, মায়ের কৃপা কাজ করার সম্ভাবনা

ততই বেশি হবে।

১৩-৮-১৯৩৩

×

দরকার কেবল তোমার সেই অংশটি নিত্য প্রকট থাকা যেটি মাকে সর্বক্ষণই জানে—অবশ্য তা চৈত্যেরই অংশ—কারণ যদিও তা সাময়িক ভাবে চাপা পড়ে তথাপি ভুল ধারণা এসে তাকে পথভ্রান্ত করে না। একবার জাগ্রত হলে ঐ চৈত্য অংশ পুনরায় অন্ধকারমুক্ত হতে পারে—সুতরাং শেষ পর্যন্ত লক্ষ্যে পৌছনো সুনিশ্চিত থাকে; কিন্তু যদি তাকে সামনে রাখা যায় কিংবা সকল অবস্থাতেই অন্তরালে ঠিক আছে বলে জেনে রাখা যায়, তাহলে যাত্রাপথ অনেকটাই নির্বিঘ্ন হতে পারে এবং অনেক সহজে ও নিরাপদে সে পথ অতিক্রম করা যায়।

৬-২-১৯৩৭

×

বাহ্য কোনো কিছুর জন্য যখন আসক্তি নেই, সবই যখন মায়ের জন্য, আর আভ্যন্তর চৈত্য চেতনাতে জীবন যখন মায়েতেই কেন্দ্রীভূত, তাই হবে অধ্যাত্ম সিদ্ধির পক্ষে সর্বোত্তম অবস্থা।

১১-১১-১৯৩৫

মায়ের নিত্য সাহায্য

মায়ের সাহায্য নিত্যই রয়েছে, কিন্তু সে কথা তুমি জানতে পারো না, কেবল চৈত্যের ক্রিয়া ও চেতনার মেঘমুক্তির সময়টি ছাড়া। বিপরীত প্ররোচনা আসাতে প্রমাণ হয় না যে মায়ের সাহায্য নেই। অমন প্ররোচিত ভাব সকলের মধ্যেই আসে, সব চেয়ে বড়ো সাধক এবং অবতারদের মধ্যেও—বুদ্ধ এবং খ্রীষ্টও বাদ যাননি। বাধাবিঘ্নও আছে—সেগুলি প্রকৃতিরই অন্তর্গত এবং তাকে জয় করতে হবে। কিন্তু দরকার হলো ঐসব প্ররোচনাকে মেনে না নেওয়া, তাকে সত্য বলে বা নিজেরই চিন্তা বলে

স্বীকার না করা, আগন্তুক জিনিস বলে বুঝে নিয়ে তার থেকে পৃথক হয়ে যাওয়া। আর বাধাবিঘ্নকে মনে কববে মানব প্রকৃতির যন্ত্রের দোষ বলে, যাকে বদলাতে হবে---তাকে নিজের পাপ কিংবা দুষ্কৃতি বলে ভাববে না, কারণ তাতে নিজের সম্বন্ধে ও সাধনা সম্বন্ধে হতাশা এসে পড়বে।

×

> প্র : আজ কাজ করতে করতে হঠাৎ একটা শান্তিপূর্ণ স্ফূর্তি এসে গেল আর যেন বরফের মতো ঠাণ্ডা কিছু আমার মাথা স্পর্শ করল। তখনই একটা জোর অনুভূতি এলো যে মা যদিও আমাদের কাছে নেই তথাপি তাঁর উপস্থিতি সর্বত্র ঘিরেই আছে আর নিত্যই তিনি তাঁর স্নেহহস্ত দিয়ে আমাদের সব দুর্গতি দূর করছেন। এটা কি দর্শন বা উপলব্ধি? কোন চেতনার দ্বারা এ অনুভূতি এলো?

উ : ওটি দর্শনের ও অনুভূতির সঙ্গে মিশ্রিত উপলব্ধি। চৈত্য এবং মন একত্রে ঐ জিনিস ঘটিয়েছে।

১১-৬-১৯৩৩

মায়ের সাহায্যে প্রাণসত্তার পরিবর্তন

যারা চাইবে তাদের জন্য মায়ের সাহায্য সর্বদাই আছে। কিন্তু তোমার আপন প্রাণ প্রকৃতির সম্বন্ধে সচেতন হওয়া এবং তার পরিবর্তন নিতে রাজী হওয়া দরকার। কেবল ঐটুকু লক্ষ্য করাই যথেষ্ট নয় যে প্রাণ প্রকৃতি অনিচ্ছুক এবং তাকে শাসন করলে সে তোমাকে বিরস ক'রে তোলে। প্রাণ প্রকৃতি প্রথমে অনিচ্ছুকই হয় আর শাসন ক'রে তাকে বদলাতে চাইলে সে বিরসতা বা বিদ্রোহ বা অসম্মতি প্রকাশ করে। তবু তোমাকে চেষ্টা ক'রে যেতে হবে যতক্ষণ পর্যন্ত সে সত্যকে বুঝে বদলাতে রাজী না হয় এবং মায়ের সাহায্য ও কৃপা লাভ করতে না চায়। মন যদি ঐকান্তিক থাকে আর চৈত্য

আস্পৃহা অটুট থাকে, তাহলে প্রাণসত্তাও নিশ্চয়ই বদলাবে।

১৫-৭-১৯৩২

×

তোমার এই যে ধারণা যে তোমার প্রাণসত্তা নিত্যই ভুল পথে যেতে চাইছে বলে তুমি অসহায় হয়ে পড়েছ, এটাই তোমার বাধাস্বরূপ দাঁড়াচ্ছে। ঐ প্রাণসত্তাকে যেমন খুশি তাই করতে না দিয়ে ওর উপরে তোমার আভ্যন্তরীণ ইচ্ছাশক্তিকে ও মায়ের আলোকে প্রয়োগ করতে হবে, যাতে সে বদলায়। যদি অমন "অসহায়" বোধ ক'রে যন্ত্রাংশের দ্বারাই চালিত হও তাহলে পরিবর্তন কেমন ক'রে সম্ভব হবে? মায়ের শক্তি কিংবা চৈত্য শক্তি সেখানে কাজ করতে পারে, যদি তোমার সত্তার তাতে সম্মতিও যোগ দেয়। নতুবা প্রাণসত্তাকে ঐভাবে ছেড়ে দিলে সে তার আগেকার রীতিতে চলবেই; তাকে বোঝাতে হবে যে অবশ্যই তার বদল হওয়া চাই।

×

প্রাণসত্তার মধ্যে এখনও যা অস্থির আছে তাকে স্থির হয়ে মনের শান্তিকে অবিচ্ছেদে বজায় রাখতে হবে। তাকে সংযত করতে হবে, কিন্তু তাই যথেষ্ট নয়, মায়ের শক্তিকে সর্বদা আহ্বান করতে হবে।

১০-৪-১৯৩৪

×

তোমার প্রাণসত্তার দ্বারে মায়ের এই নোটিস টাঙিয়ে দাও, "এখানে মিথ্যা মাত্রেরই প্রবেশ নিষেধ", আর সেখানে পাহারা রাখো যেন ঐ নোটিসের কাজ বহাল থাকে।

১৮-৫-১৯৩৩

অকপটতা ও মায়ের সাহায্য

যারা অকপট নয় তাদের মায়ের সাহায্যে কোনো লাভ হয় না, কারণ

নিজেরাই তারা তাকে ফিরিয়ে দেয়। যদি তারা না বদলায় তাহলে তাদের নিম্ন ও স্থূল প্রকৃতিতে অতিমানসের আলো এবং সত্য অবতরণের প্রত্যাশা করতেই পারে না, নিজেদের তৈরি পঙ্কের মধ্যেই আবদ্ধ থেকে যায়।

নভেম্বর ১৯২৮

বিপদে মাকে ডাকো

বিপদ এলে নিজের মধ্যে শান্ত থেকে মায়ের শক্তিকে ডাকবে, বিপদ দূর ক'রে দেবার জন্য।

২৬-৮-১৯৩৩

×

আসল জিনিস হলো সর্বদার জন্য মাকে ডাকা, সেই সঙ্গে আস্পৃহা কবা ও আলো এলে তাকে গ্রহণ করা, আর কামনা প্রভৃতি অন্ধ ক্রিয়া থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাকে প্রত্যাখ্যান করা। কিন্তু এগুলি যদি সার্থকভাবে নাও করতে পারো, তাহলে শুধু মাকে ডাকো আর ডাকো, আব তবুও ডাকো। মায়ের শক্তি তোমাব সাথেই আছে, যদিও তুমি তা জানো না; অধ্যবসায় নিয়ে শান্ত হয়ে থাকো।

১৫-৯-১৯৩৪

×

একটি উপায় আছে যদি নিজের ইচ্ছার জোর না থাকে——মাতৃশক্তিকে ডাকা। চুপচাপ সহ্য না ক'রে যদি কেবল মনের ভাষাতে ডাকো তাতেও কাজ হবে——কারণ যদিও তখনই কিছু ফল পাবে না, কিন্তু মনের ডাকে শেষে শক্তি এসে চেতনা উন্মুক্ত হবে, আর সব কিছু তারই উপর নির্ভর করে। বাহ্য চেতনাতে অন্ধকার এবং কষ্টভোগ থাকবেই; অভ্যন্তরমুখী চেতনা যতই খুলবে ততই সেগুলি হটে যেতে থাকবে, আর পুরো চেতনাতে

তা থাকবেই না, বা থাকলেও তা বাহ্য স্পর্শ, ভিতরে ঢুকবে না।

২১-৮-১৯৩৩

×

মায়ের শক্তিকে যদি তেমন সক্রিয়ভাবে নাও ডাকতে পারো, তথাপি বিশ্বাস রাখো যে তা আসবেই।

২৬-৮-১৯৩৬

×

তোমার দৈহিক মনটাই অমন জড়বৎ বোধ কবে––কিন্তু তোমার সত্তাব কোনো অংশ যদি মায়েব দিকে ফিরে থাকে তবে তাতেই মায়ের সাহায্য পাবার পক্ষে যথেষ্ট হবে।

২৫-১-১৯৩৪

×

তোমার দৈহিক অবচেতন থেকেই ঐ চিরাভ্যস্ত চিন্তাব আবেশ আসছে, "আমি ঠিক ভাবে ডাকতে পারি না", "প্রকৃত আস্পৃহা বলতে কিছু আমার নেই, ইত্যাদি"। হতাশ ভাব ও পূর্বস্মৃতি প্রভৃতি সবই আসে ওখান থেকে। ওসব ভেবে কিছু লাভ হয় না। মাকে ঠিকভাবে যদি না ডাকতে পারো তবে যেমন ভাবে পারো তেমনি ভাবেই ডাকো––ডাকতে পারাও যদি না আসে তবে কেবল মাকে চিন্তাই করো এই ইচ্ছা নিয়ে যে ঐসব দোষ যেন ঘুচে যায়। আর প্রকৃত আস্পৃহা আছে কিংবা নেই তাই নিয়ে মাথা ঘামিও না––তোমাব চৈত্য চাইছে, আর তাতেই যথেষ্ট। বাকী যা করবার তা ভগবৎ কৃপাই করবে, একনিষ্ঠ ভাবে তারই উপর একান্ত নির্ভর ক'রে থাকবে সিদ্ধির জন্য––কারোই নিজের গুণ বা কৃতিত্ব বা সামর্থ্য আপন চেষ্টাতে কোনো সিদ্ধি এনে দিতে পারে না।

আমি অবশ্য শক্তি পাঠাবো তোমার ঐ আবেশ দূর করার জন্য, কিন্তু যদি তুমি ঐ অভ্যস্ত মনোভাবকে ত্যাগ করতে পারো তাহলে তোমাকে

মুক্ত করতে পারা সহজ হবে।

৪-১-১৯৩৭

×

এই সকল বিপদের সময় সব চেয়ে ভালো হয় মাকে সমস্ত জানিয়ে তাঁর কাছে সাহায্য চাইলে। হয়তো তার প্রাণসত্তার পক্ষে দরকার হচ্ছে কারো যত্ন এবং আশ্রয়—কিন্তু তোমার পক্ষে তার প্রয়োজন বোধ না ক'রে সব চেয়ে ভালো কাজ হবে যদি তাকে মায়ের হাতে ফেলে দাও—তোমার স্নেহের পাত্রকে মায়ের কাছেই নিবেদন ক'রে দাও।

১৫-১১-১৯৩৭

পৌনঃপুনিক বিপদ নিবারণ

প্র ঃ বার বার একটা বিপদ এলে তাকে সামলাবার উপায় কি?

উ ঃ সমতা, প্রত্যাখ্যান, মায়ের শক্তিকে আহ্বান।

১-৮-১৯৩৩

×

আগেকার মিশ্রিত ভাব পুনঃপুনঃ ঘুরে ঘুরে আসাই তোমার প্রতিবন্ধক হচ্ছে। এখানে দরকার ওর থেকে বেরিয়ে এমন আভ্যন্তরিক যৌগিক শান্তির অবস্থাতে যাওয়া যা ওর দ্বারা বিচলিত হবে না। তেমন অবস্থা এলে তখন অনুভব করবে মায়ের নিত্য উপস্থিতি, ও তাঁর নির্দেশ, কেবল মাঝে মাঝে ক্ষণিকের জন্য নয় কিন্তু সর্বদার জন্য একটা উন্মীলন ও প্রস্ফুটন, চৈত্য অনুভূতি এবং আধ্যাত্মিক আলো এবং আনন্দের অবতরণ। এর জন্য তুমি যথোচিত সাহায্য পাবে।

৭-৩-১৯৩৭

×

বহু লোকের এমন অবস্থা হয় (এমনিই মানব প্রকৃতি) আর এর থেকে বেরিয়ে আসার উপায়ও আছে :—মায়ের উপর পূর্ণ আস্থা নিয়ে আভ্যন্তরীণ মনকে শান্ত করা (বাহ্য মন উত্যক্ত করতে থাকলেও), আর মায়ের শান্তি ও শক্তিকে নিজের আধারের মধ্যে আহ্বান করা, যা তোমার উপরদিকেই অবস্থান করছে। যেমনি তাকে তুমি চেতনভাবে অনুভব করবে অমনি তার দিকে নিজেকে খুলে রেখে তাতেই লেগে থেকে পুরোপুরি তাকে কাজ করতে দেবে,—তোমার নিজের তরফ থেকে তাকে নিত্য সমর্থন দিয়ে আর সচেতনভাবে অন্য সব কিছুকে প্রত্যাখ্যান ক'রে—তাতে শেষ পর্যন্ত সমস্ত আভ্যন্তরীণ সত্তা প্রশান্তি লাভ ক'রে মায়ের শক্তি ও শান্তি, আনন্দ ও উপস্থিতিতে পূর্ণ হবে—আর তখন বাহ্য সত্তাও তার অনুগামী হতে বাধ্য হবে।

৮-৫-১৯৩৩

খারাপ অবস্থা থেকে উদ্ধার

এই সব খারাপ অবস্থা আসে সামান্য কোনো কারণে, আভ্যন্তর অবস্থিতি থেকে বাহ্য চেতনাতে নেমে এলে। যখন এমন হবে তখন বিচলিত না হয়ে শান্ত ভাবে থেকে মাকে ডাকবে আর ভিতরে ফিরে যাবে।

২৪-১-১৯৩৬

×

মাঝে মাঝে চেতনার অবনতি সকলেরই হয়। তার কারণ থাকে নানারকম, হয়তো কোনো বাহ্য স্পর্শ, প্রাণসত্তার ভিতরকার এমন কোনো অংশ যা তেমন বদলায়নি, বিশেষত নিম্ন প্রাণে, বা দেহ প্রকৃতির তমঃ বা জড়তা থেকে। ওরূপ হলে তখন নীরব থাকবে, নিজেকে খুলে ধরে মাকে ডাকবে, প্রকৃত অবস্থা ফিরে পেতে আস্পৃহা করবে আর স্বচ্ছ বিচারণা শক্তি চাইবে যাতে নিজের মধ্যে কোথায় গলদ আছে তা বুঝে তার সংশোধন করা যায়।

৪-৩-১৯৩২

বিরুদ্ধ আক্রমণে মায়ের সাহায্য

অজ্ঞানময় শক্তিরা ওৎ পেতে থাকে আর একত্রে আক্রমণ করে। সে আক্রমণকে যতবার প্রতিহত করো ততবার আধারের মধ্যে কিছুটা পরিষ্কার হয়ে যায়, মনে প্রাণে দেহে বা সত্তার অন্যান্য অংশে মায়ের জন্য কিছু ক্ষেত্রজয় ঘটে। প্রাণসত্তার মধ্যে মায়ের অবিকৃত স্থান যে বাড়ছে, তার প্রমাণ এই যে ঐসব আক্রমণকে তুমি বাধা দিতে পারছ, যা আগেকার দিনে তোমাকে পেড়ে ফেলে দিতো।

ঐরূপ বিপদের সময় মায়ের উপস্থিতি বা শক্তিকে আহ্বান করাই সবচেয়ে প্রকৃষ্ট উপায়।

তুমি যে ভিতরে কথা বলো তা মায়েরই সঙ্গে, তিনি সর্বদাই তোমার কাছে আছেন। দরকার কেবল তাঁর কথা ঠিকভাবে শুনতে পারা, অন্য কোনো কণ্ঠস্বর যেন না শোনো।

৭-১২-১৯৩৩

×

আক্রমণ যতই জোরালো হোক, আর তা যদি তোমাকে অভিভূতও করতে পারে, তথাপি যদি তোমার মায়ের দিকে নিজেকে খুলে ধরা অভ্যস্ত থাকে তাহলে তা শীঘ্রই সরে যাবে। চুপচাপ যদি মায়ের শক্তির দিকেই নিজেকে খুলে ধরো তাহলে শান্তি আবার ফিরে আসবে। সত্য একবার যখন তোমার মধ্যে কিছুটাও বিকাশ পেয়েছে, তখন বিপরীত ক্রিয়াতে সাময়িকভাবে ঘন মেঘ হাজার জমে উঠলেও আকাশের সূর্যের মতো আবার তার দীপ্তি-চ্ছটা বেরিয়ে পড়বে। সাহসিকতা না হারিয়ে আস্থার সঙ্গে অধ্যবসায় ক'রে যাও।

১৪-৩-১৯৩২

×

প্র ঃ বিরোধী শক্তিদের ক্রিয়াতে সাধকদের যে দুর্ভোগ আসে তাকে এড়াবার সদুপায় কি ?

উঃ মায়ের উপর অবিচল শ্রদ্ধা ও সম্পূর্ণ সমর্পণ।

১৭-৬-১৯৩৩

×

প্রঃ যখন সাধকদের রূপান্তর ক্রিয়ার সময় কোনো দুর্বলতা বাদ পড়ে যায়, তাহলে সেখানে বিরোধী শক্তি-দের আঘাত খেয়ে তা জানবার বদলে মায়ের শক্তি'র পক্ষে তা দেখিয়ে দেওয়া কি সম্ভব নয়?

উঃ সাধক মায়ের দিকে যথেষ্ট উন্মীলিত থাকলে তা হতে পারে—কিন্তু অধিকাংশ সাধকের বেলাতেই থাকে পুরো অহমিকা, অনাস্থা, তামসিকতা, নিজের ইচ্ছা ও প্রাণের কামনা—ওতেই তারা মায়ের দিকের দরজা বন্ধ রেখে বিরোধী শক্তিদের ক্রিয়াকে সুযোগ দেয়।

১৭-৬-১৯৩৩

×

মানবপ্রকৃতির ভিতরকার অজ্ঞানতা জনিত যে সব মানসিক ও প্রাণিক দোষত্রুটি—এবং সেই সঙ্গে আসুরিক শক্তিদের আক্রমণ ও প্ররোচনা—এগুলিকে ঘটতে দেওয়া হয় যতকাল প্রকৃতি তাতে সাড়া দিতে থাকে। মায়ের উপস্থিতিতেও যদি তা আসে, তাহলে বুঝতে হবে যে তার উপর খুব চাপ দেওয়া হচ্ছে যাতে তার বিলোপ হয় কিংবা টিকে থাকার জন্য তাকে লড়তে হয়। এর নিবারণের উপায় হলো কেবল মায়ের দিকে নিজেকে খুলে রেখে অন্য সব শক্তিকে সর্বদার জন্য পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করতে থাকা, আর যখন ওগুলি জোর করবে তখন তার উপর আরো জোরে প্রত্যাখ্যান করা। শ্রদ্ধা, ঐকান্তিকতা ও অধ্যবসায় থাকলে বাকী সব কিছু হয়ে যাবে।

১৬-১১-১৯৩২

মায়ের দ্বারা পরীক্ষা

মা পরীক্ষা করছেন এ ধারণা খুব সুস্থ জিনিস নয়, একে বেশি বাড়তে দেওয়া ঠিক নয়। পরীক্ষা ভগবানের দিক থেকে আসে না, আসে নিম্ন স্তরের শক্তিদের থেকে--মন প্রাণ দেহগত--তবে ভগবানের দিক থেকে তাতে সম্মতি থাকে কারণ তা হলো আত্মার শিক্ষার অন্তর্গত, যাতে সে নিজেকে ও নিজের শক্তিকে জানতে পারে, যাতে সে তাব সংকীর্ণতা কাটিয়ে উঠতে পারে। মা তোমাকে প্রতি মুহূর্তে পরীক্ষা করছেন না, বরং প্রতি মুহূর্তে তোমাকে সাহায্য করছেন যাতে নিম্নতর চেতনার ঐসব পরীক্ষা ও বাধাবিঘ্ন আসার প্রয়োজনকে তুমি ছাড়িয়ে উঠে যেতে পারো। যদি তুমি সর্বক্ষণ মায়ের ঐ সাহায্যদান সম্বন্ধে সচেতন থাকো, তাহলে যত কিছু বিরোধী শক্তির থেকে বা নিজেরই নিম্ন প্রকৃতির আক্রমণ থেকে তাই হবে তোমার রক্ষাকবচ।

সাহায্যদানের পন্থা

যেমন ভাবে দরকার বা সম্ভব তেমনি ভাবেই সাহায্য দেওয়া হয়। কেবল শক্তি, আলো, বা জ্ঞানের দ্বারাই নয়। অবশ্য শক্তি প্রভৃতি বলতে যদি সব রকমই বোঝায় তাহলে তা ঠিক কথা।

২২-১২-১৯৩৬

সাহায্য ও শক্তির স্বয়ংক্রিয়তা

সাহায্য প্রার্থনার প্রয়োজন ক্রমশ কমে আসবে, যখন তুমি উচ্চ থেকে উচ্চে উঠে যেতে বা পূর্ণ থেকে পূর্ণতর হতে থাকবে, তখন ওর বদলে মাতৃশক্তি স্বয়ংক্রিয় হয়ে কাজ করতে থাকবে।

২২-১২-১৯৩৬

আভ্যন্তর সমর্পণের দ্বারা বিঘ্ন নিবারণ

• কোনো কষ্ট দূর করবার জন্য মায়ের কাছে সশরীরে যাওয়া অনাবশ্যক ও নিষ্ফল; নিজের ভিতর থেকে মায়ের শরণ নিতে হবে এবং কষ্টকে তাড়াতে হবে, যেমন এবার দেখলে। নতুবা কেবলই দৈহিকভাবে মায়ের কাছে যেতে থাকলে বারে বারে বিগ্‌ড়ে যাওয়া ও মায়ের কাছে যাওয়া অভ্যাসে দাঁড়িয়ে যাবে, আর আভ্যন্তরীণ সমর্পণের পরিবর্তে সেটা মায়ের ঘাড়ে ফেলে দেওয়া হবে। কিন্তু এখানে দরকার সামগ্রিক সমর্পণ, যাতে সব কিছু তুচ্ছ জিনিস নিয়ে অনর্থক দুর্গতির সৃষ্টি না হতে পারে, যেমন—অহংকার, আত্মমত প্রাধান্য, তোমার কথা কেউ মানছে না বা তাকে গুরুত্ব দিচ্ছে না বলে ক্রোধের উদ্রেক।

সাহায্যের জন্য মাকে লেখা

তুমি ক-কে বলে এবং মাকে লিখে জানিয়ে ভালোই করেছ। অবশ্য মাও লক্ষ্য করেছেন ক-এর কোথায় মুশকিল হচ্ছে; কতকটা মুক্ত উন্মীলনের অভাবেই তা হচ্ছে সেটা ঠিক কথা —নতুবা ও সব দোষ শীঘ্রই ঘুচে যেতো এবং প্রকৃতির প্রয়োজনীয় পরিবর্তন (মন, অহং, ইত্যাদি) ধাপে ধাপে সহজে ঘটে যেতো। তুমি যেমন ভাবে লিখে জানাও ওতে উন্মীলনের পক্ষে ও সঠিক স্পর্শলাভের পক্ষে যথেষ্ট সাহায্য নয়। ক-এর ঐরূপ যুক্তি যে মা তো সবই জানছেন সুতরাং তাঁকে লিখে জানাবার কিছু দরকার নেই, এটা তখনই খাটে যখন সাধক ও মায়ের মধ্যে একটা মুক্ত ধরনের লেনদেনের ধারা চলে, কিন্তু তবুও গুরুতর কোনো বিপত্তি ঘটলে এ যুক্তিও তখন খাটে না। অবশ্য আমরা তার এই সংগ্রামে যথাসাধ্য সাহায্য দেবো।

১৪-৫-১৯৩৬

×

তোমার জন্য একটা নিয়ম বলে দিই, "এমন কিছুই করবে না বা বলবে না বা ভাববে না যেটা মায়ের কাছে গোপন করবার মতো হবে"।

এই হবে তোমার সকল আপত্তির জবাব---তোমার প্রাণেরই নয় কি?---যে "এই সব তুচ্ছ কথা" মাকে না জানানোই ভালো। কেনই বা তুমি এমন কথা ভাবছো যে এই সব জিনিসকে মা তুচ্ছ মনে করবেন বা এই নিয়ে তিনি বিরক্ত হতে পারেন? যদি সমগ্র জীবনটাই যোগ হয় তাহলে তার ভিতরকার কোনো কিছুই তুচ্ছ অথবা মূল্যহীন হয় কেমন ক'রে? মা যদি কোনো জবাবও না দেন তথাপি তোমাব সব কিছু ক্রিয়া ও আত্মোন্নতির কথা তাঁকে জানিয়ে দেওয়া মানেই তাঁর আশ্রয়ে তাঁর সত্য আলোকের নিচে ও তাঁর শক্তির শিখার মধ্যে ফেলে দেওয়া, যা রূপান্তর আনার জন্য কাজ করছে--তাহলে যখনই জানাবে তখনই মায়ের শক্তিশিখা তার উপর কাজ কবতে শুরু করবে। তোমার আত্মা যখন জানাতে চাইছে আর অন্য কিছু তা নিষেধ করছে, তখন জানবে যে ওটা প্রাণসত্তার ফন্দী, সে চায় না ঐরূপ আলো ও শক্তির ক্রিয়া।

১৮-৫-১৯৩২

সাহায্যের ডাকে মায়ের গুহ্য ক্রিয়া

ঐ অনুভূতি যে মা ক মেয়েটির ডাক ও সাহায্য প্রাথনা নিশ্চয় শুনেছেন, তা ঠিকই মায়ের কাছে পৌঁছেচে, যদিও যে সকল কথা সে চিঠিতে লিখেছে তা মায়ের স্থূল মনে হুবহু না আসতে পারে। এমন ডাক নিত্যই মায়ের কাছে আসছে, কখনো শত শত আসে একটার পর একটা, আর তার জবাবও তিনি দিচ্ছেন। তার উপলক্ষ নানারকম হতে পারে, কিন্তু যেমন যেমন প্রয়োজন সেই অনুযায়ী মায়েব শক্তি তার জবাব দেয়। গুহ্যশক্তির স্তরে এই ভাবেই কাজ হয়। সে কাজ সাধারণ মানবীয় ব্যাপারের মতো নয়, কাজেই সেখানে লিখিত বা কথিত ভাবে জবাব দেবার দরকার হয় না; চৈত্য আদানপ্রদানের দ্বারাই সে শক্তি কাজ করে। কিন্তু তা কোনো নির্ব্যক্তিক শক্তি নয় আর এমন মনে করাও ঠিক নয় যে কোনো দিব্য তেজ প্রস্তুত রয়েছে যেমনি কেউ ডাকবে অমনি তাতে সাড়া দেবার জন্য। এটি হলো মায়ের ব্যক্তিগত জিনিস, এমন শক্তি ও ক্রিয়াগুণ যদি তাঁর না থাকতো তাহলে তিনি তাঁর উদ্দিষ্ট কর্ম করতেই পারতেন না; কিন্তু এ হলো আলাদা জিনিস আর তাঁর বাহ্য ব্যবহারিক কাজগুলি হলো আলাদা

জিনিস, এবং তার রীতি পদ্ধতিও সেই অনুসারে আলাদা রকম,---যদিও তাঁর এই দুই পদ্ধতি একত্রে যুক্ত হতে পারে, এবং তাতে ঐ গুহ্য শক্তি স্বহ্য কাজগুলিকে তার চরম রকমের সার্থকতা দিতে পারে। আর মায়ের শক্তি'র ক্রিয়া অনুভব করতে পারা না-পারা সম্বন্ধে, যদি তুমি সেটা সচেতন ভাবে জানতে পারো তাহলে তার কাজ বিশেষভাবেই সাফল্য আনতে পারে, কিন্তু না জানলে যে কাজ হয় না এমন কথা নয়; কেমন ক'রে হলো তা তুমি না জানতে পারলেও তার কাজ ঠিকই হয়। যেমন, তোমার কাজে যখন কলকাতায় এবং অন্যত্র গিয়েছিলে তখন বরাবরই আমি তোমাকে সাহায্য দিয়েছি, তার ফল যে হয়নি এমন বলতে পারো না; কিন্তু তা ঐ গুহ্য ধরনেরই ছিল, সুতরাং তুমি যদি কোনোপ্রকারে নাও জানতে যে আমার সাহায্য তুমি পাচ্ছ তথাপি তার কাজ হতো।

২৪-৩-১৯৪৯

সাধকদের সম্পর্কে মায়ের রক্ষাকারিতা

মা যাবতীয় গুহ্য শক্তিদের দ্বারা সাধকদের রোগ ও মৃত্যু প্রভৃতির ক্রিয়া থেকে রক্ষা করবার জন্য যথাসাধ্য উৎকৃষ্ট রকমের একটা ব্যবস্থা ক'রে রেখেছেন। কিন্তু তা পুরোপুরি ভাবে সার্থক হতে পারে না কারণ সাধকেরা নিজেরাই খাদ্যাদি ও দেহপ্রাণগত নানা বিষয়ে সমুচিত আচরণ করে না। তথাপিও রক্ষার কাজ চলতে থাকে। কিন্তু তারা যদি মায়ের এই গণ্ডীর বাইরে চলে যায় সেটা তাদেরই দায়িত্ব।...তবে এ ব্যবস্থা কেবল যারা আশ্রমে থাকে তাদের জন্য, যারা বাইরে থাকে তাদের নয়।

১৪-৭-১৯৩৩

×

তা ঠিক নয়---মা তাঁর রক্ষাক্রিয়াকে সংবরণ করেননি। খুব সম্ভব তোমার ঐরূপ বিপত্তি ঘটার কারণ তুমিই তোমার আভ্যন্তরীণ সত্তা থেকে বেরিয়ে নিজেকে খুব বেশি বহির্মুখী করেছিলে। আবার ভিতরে ফিরে গিয়ে তোমার আভ্যন্তরীণ নীরবতা ও প্রশান্তি ফিরিয়ে আনতে হবে।

দুর্ঘটনা ও মায়ের রক্ষণা

প্রঃ আজ সকালে ক-এর মোটর দুর্ঘটনা ঘটে গেছে। মা কি তা আগের থেকে জানতে পেরে তাকে বাঁচাতে পারতেন না? কিংবা সে হয়তো কোনো ভাবে মায়ের রক্ষাগণ্ডীর বাইরে ছিল?

উঃ ও দুর্ঘটনা বাঁচানো সম্ভব হতো না। বিপদ এসে পড়লে তৎ-ক্ষণাৎ প্রথমেই মাকে ডাকা চাই, তাতে মায়ের সাধারণ রক্ষাশক্তি তখনই সেখানে কার্যকরী হয়। ক ঐ সময়ে নিতান্তই বাহ্য ভাবাপন্ন অবস্থায় ছিল, যা করা উচিত তার ঠিক উল্টোটাই সে করেছে—গাড়িটার পিছনে না গিয়ে সুমুখ দিয়ে পার হতে গিয়েছিল। কিন্তু ওর প্রকৃত কারণ আরো ভিতরের জিনিস—চেতন মনের অগোচরে আভ্যন্তর সত্তা ঐরকম কিছু চাইছিল সাড়া জাগাতে।

২৭-১-১৯৩৬

প্রাণের স্তরে মায়ের রক্ষাক্রিয়া

ওটি হলো প্রাণময় স্তরের স্বপ্ন, যে স্থান খুবই বিপদসঙ্কুল, যতক্ষণ না তুমি নির্ভয়ে তার সম্মুখীন হতে পারো। তোমার যদি ভয় না থাকে কিংবা যদি মায়ের রক্ষার আশ্রয়ে থাকো (মাকে স্মরণ করলে বা ডাকতে পারলেই তা হয়) তাহলে এ সব বিপদে কোনোই ক্ষতি হয় না। পাগলকে ভয় করা থেকেই ওটা তোমার প্রাণের মধ্যে এসেছিল; এই সকল ভয়কে প্রকৃতির ভিতর থেকে তাড়াতে হবে।

৮-৯-১৯৩৩

×

তোমার অনুভূতির মধ্যে এই ব্যাপার হয়েছে যে তোমার প্রাণসত্তা মায়ের সঙ্গে মিলিত হবার জন্য দেহমুক্ত হয়েছিল (তুমি সাক্ষাৎ পেয়েছ

দেহ ও প্রাণের মধ্যস্থ কিনারাতে) আর তাই প্রাণসত্তা দেহের বাইরেই থেকে প্রাণময় জগতে প্রবেশ করলে, আর দেহের আশ্রয়ের মধ্যে না থাকাতে অসহায় বোধ করতে থাকল, তার পরে মাকে ডাকতে থাকল। সেখানে ক-এর সাক্ষাৎ পাওয়া হয়তো তারই প্রাণসত্তাকে দেখেছ কিংবা অন্য কোনো তারই আকারের সত্তা যে তাকে দুঃখ দিচ্ছে। ও জগতে এমন অনেক কিছুই দেখা যায়——মাকে ডাকাই তাতে রক্ষা পাবার উপায়।

৭-৯-১৯৩৩

দৈহিক আরোগ্যে মায়ের শক্তিক্রিয়া

দেহেব নিজস্ব অন্তর্নিহিত শক্তিতে অমন কাজ হতে পারে না। মাকে ডেকে তাঁর দিকে নিজেকে খুলে রাখলে তাঁরই শক্তিতে ঐরূপ হয়। এমন কি যারা কখনো যোগ করেনি এবং কিছুই জানে না, তারাও ঐভাবে আরোগ্য হয়, কেমন ক'রে হলো তা না জেনে। ঐ শক্তি উপর থেকে ভিতরে ঢোকে, কিংবা বাহিরকে আচ্ছাদন ক'রে ভিতরে প্রবেশ করে, কিংবা ভিতরে নেমে বাইরে বেরিয়ে আসে। শক্তির ক্রিয়া সম্বন্ধে চেতন হলে তখন বুঝতে পারো তা কেমন ভাবে কাজ করছে।

জাগরণ মানে পিছনের চৈত্যের দ্বারা সচেতন ক্রিয়া। সামনে এসে তা মন প্রাণ ও দেহকে অধিকার ক'রে তাদের ক্রিয়াকে চৈত্যগত করে। এমন হতে পারে আস্পৃহার দ্বারা আর মায়ের কাছে অকুণ্ঠ উন্মীলন ও সমর্পণের দ্বারা। আর আধার প্রস্তুত থাকলেও তা আপনি হয়।

৫-৫-১৯৩৩

×

অভিজ্ঞতা হতে বলছি যে দেহ যখন নিতান্ত কড়া রকমের প্রতিরোধ-যুক্ত অবস্থায় থাকে, তখন মায়ের শক্তি আরো সরাসরি ভাবে সেখানে কাজ করবার জন্য তার সঙ্গে অন্য বাহ্যিক উপায় কিছু যুক্ত হলে তাতে ভালো রকমের সাহায্য পায়; কারণ দেহ তখন বোধ করতে থাকে যে সে রোগের বিরুদ্ধে দুদিক থেকে সাহায্য পাচ্ছে, বাস্তব ও অতিবাস্তব।

দুই দিক থেকেই মায়ের শক্তি কাজ করবে।

১-৯-১৯৩৬

×

প্র ঃ দুই সপ্তাহ যাবৎ প্রত্যেক প্রণামেই যখন মায়ের স্পর্শ পাই তখনই দেহ যেন পুষ্টি পায় এবং সেই সঙ্গে আনন্দ ও বল পাওয়া অনুভব করে, যেন দেহেতে নতুন কিছু এসে ঢুকলো।

উ ঃ তুমি অসুস্থতাতে ভুগছো বলে মা দিব্য ধরনের পুষ্টি এবং স্বাস্থ্য ও শক্তি তোমার মধ্যে ঐভাবে প্রবেশ করিয়ে দেন, দেহকে একটা নূতনত্ব দান করেন।

৪-১১-১৯৩৪

×

তুমি যে পথ নিয়েছ---সকল অবস্থাতেই মাকে ধরে থাকা যাতে কোনো কিছুতেই তোমাকে তার থেকে টলাতে না পারে, তাই হলো তোমার পক্ষে সকল বিপত্তির সমাধান। কারণ বোঝা যাচ্ছে যে চৈত্যসত্তা তোমার মধ্যে কাজ শুরু করেছে।

২৪-১২-১৯৩৫

×

একই দিকে---অর্থাৎ মায়ের দিকে দৃঢ়চিত্তে অটল হয়ে থাকো।

×

অতিমানসের অবতরণে কষ্টভোগ

প্র ঃ এ কি ঠিক কথা যে অতিমানসের অবতরণ যতই নিকট হয়ে আসবে ততই যাদের মধ্যে প্রথমে তা ঘটবে তাদের পক্ষে কষ্টভোগের মাত্রা বেড়ে যাবে ?

উ ঃ ঠিক কথা বটে, কিন্তু যারা মায়ের কাছে নিতান্ত সমর্পিত হয়ে চৈত্য ভাবাপন্ন হয়ে নমনীয় হয়ে অহংবর্জিত হয়ে থাকবে তাদের কোনো কষ্ট হবে না।

×

অনুতাপ করলে সকল ভ্রান্তি ও সকল দোষ কেটে যায়। মায়ের উপর অটুট আস্থা, মায়ের কাছে আত্মসমর্পণ যদি বাড়িয়ে যাও তাতেই তোমার প্রকৃতি বদ্‌লে যাবে।

×

নিজের বিপত্তির কথা ভেবো না, মায়ের হাতে ছেড়ে দাও, তাঁর শক্তি সব দূর করবে।

২২-৩-১৯৩৫

×

নালিশ বা প্রশ্নাদি ক'রে কোনো লাভ নেই। নীরবে থাকো, হতাশা বা ক্ষোভকে বাদ দিয়ে, মায়ের শক্তিকে গ্রহণ ক'রে তাকে কাজ করতে দিয়ে, বাধাবিঘ্নকে প্রত্যাখ্যান ক'রে, নিজের দোষত্রুটির দিকে না চেয়ে, বিলম্বে অস্থির না হয়ে।

২৫-১০-১৯৩৩

×

হতাশা বা অসহিষ্ণুতাকে ঢুকতে দিও না। মায়ের শক্তিকে কাজ করতে সময় দাও।

১২-৬-১৯৩৭

×

দেহের শুদ্ধতা নিয়ে চিন্তা কোরো না। মায়ের প্রতি ভালোবাসাতে দেহকে ও হৃদয়কে শুদ্ধ ক'রে দেয়––অন্তরাত্মায় আস্পৃহা থাকলে দেহও শুদ্ধ। অতীতে যা হয়ে গেছে তাতে কিছু যায় আসে না।

×

তুমি ভালো হয়েছ আর ক তোমাকে সাহায্য করেছে জেনে আমরা খুব খুশি। ঈর্ষা ভাব নিশ্চয় চলে যাওয়া চাই, একটুও যেন না থাকে। মায়ের প্রেম যে সর্বদাই তোমার প্রতি আছে এতে সন্দেহ কোরো না। তাঁর কৃপার উপর আস্থা রাখলে এই সব দোষ খণ্ডে গিয়ে মায়ের প্রকৃত সন্তান হয়ে থাকবে, যা আছো তোমার মনে ও হৃদয়ে।

১৮-৭-১৯৩৫

×

মা তোমাকে ত্যাগ করতে চান না, আর তুমি যে তাঁকে ছেড়ে যাবে তাও তিনি চান না। তাঁর ইচ্ছার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চলো তাহলেই সব ঠিক হবে। তাঁর ভালোবাসা তোমাকে ঠিক পথে নিয়ে যাবে, তাঁর আশ্রয় বরাবর বজায় থাকবে।

সুস্থ না হওয়া পর্যন্ত বিশ্রাম নাও। কাজের তাড়া নেই, আগে শক্তি আসুক।

১৯-৭-১৯৩৫

×

এই সব তুচ্ছ জিনিস নিয়ে উতলা হয়ে উঠো না। যে ক্রিয়ার আশংকা করছ তা যখন আসবে, তখন ধীর স্থির হয়ে নিজেকে খুলে রেখে মাকে ডাকতে থাকবে, কিছু পরে দেখতে পাবে যে একটা পরিবর্তন তোমার মধ্যে আসছে। ধ্যান করাই যথেষ্ট নয়। সর্বদা মাকে চিন্তা করো, সব কিছু কাজ তাঁকে নিবেদন করো, আরো ভালো সাহায্য পাবে।

৭-৪-১৯৩২

বাহ্য ও আভ্যন্তর জিনিসের জন্য মাকে প্রার্থনা

প্র ঃ আপনি বলেন, "সাধক হলে সাধনার অন্তর্গত আভ্যন্তর জিনিসের জন্য এবং যেসব বাহ্য জিনিস ভগবৎ কার্যের পক্ষে দরকার তার জন্য প্রার্থনা করবে"। এই বাহ্য জিনিসের সম্বন্ধে কথাটা ঠিক বুঝিনি। দয়া ক'রে বুঝিয়ে বলুন।

উ ঃ সবই নির্ভর করছে যে সব বাহ্য জিনিসগুলি তুমি নিজের সুবি-ধার জন্য, নিজের সুখ ও লাভের জন্য চাও, কিংবা যেসব জিনিস তোমার আধ্যাত্মিক জীবনের পক্ষে তোমার কাজের সার্থকতার পক্ষে ও কাজের যন্ত্রগুলির সফলতার পক্ষে দরকার সেইগুলি চাও। এ হলো একটা মনো-ভাব গ্রহণের প্রশ্ন। যেমন মনে করো তুমি অর্থাদি প্রার্থনা করো সুস্বাদু খাদ্যবস্তু কেনবার জন্য, সেটা সাধকের পক্ষে সমুচিত নয়। যদি অর্থাদি প্রার্থনা করো মাকে ও মায়ের কাজে দেবার জন্য এবং তাঁর কাজের সাহা-য্যের জন্য, তাহলে সেটা ন্যায়সঙ্গত হবে তোমার পক্ষে।

প্র ঃ নিচে অনেকগুলো প্রার্থনা লিখে জানাচ্ছি, সেগুলো বাহ্য বা আভ্যন্তর, সঠিক অথবা বেঠিক, অনুকূল অথবা প্রতিকূল, সেগুলির সংশোধনের দরকার কিনা দয়া ক'রে যদি জানিয়ে দেন তাহলে কৃতজ্ঞ থাকবো—

১। রাত্রে পড়তে বসে যখন ঘুম আসে, মাকে প্রার্থনা করি যে ঘুম ছাড়িয়ে দিন।

উঃ যদি তোমার সেই পড়া সাধনার অন্তর্গত হয় তাহলে ঠিকই করো।

২। ঘুমোতে যাবার সময় মাকে প্রার্থনা করি যেন তিনি ঘুমের মধ্যে আমার সাধনার ভার নেন, আমার ঘুম যেন চেতনাময় ও জ্যোতিপূর্ণ হয়, ঘুমের সময় যেন তিনি আমাকে রক্ষা ক'রে তাঁর সম্বন্ধে চেতন রাখেন।
৩। ঘুমের মধ্যে যখনই জেগে উঠি তখনই বলি মা কাছে থেকে আমাকে রক্ষা করুন।

উঃ এ দুটি সাধনারই অঙ্গ।

৪। বাইরে বেরোতে এবং বেড়াতে যাবার সময় প্রার্থনা করি মা আমাকে আরো তেজ এবং সামর্থ্য দিন, আরো শক্তি এবং স্বাস্থ্য দিন, তার জন্য আমি কৃতজ্ঞ থাকবো।

উঃ শক্তি ও সামর্থ্য যদি চাও সাধনার জন্য ও সাধনার যন্ত্রগুলির জন্য তাহলে তা ঠিক।

৫। রাস্তায় চলতে কুকুর তেড়ে আসছে দেখলে আমি তখন মাকে প্রার্থনা করি যেন তিনি আমাকে রক্ষা করেন, আমার ভয় ভেঙে দেন।

উঃ রক্ষার জন্য প্রার্থনা সব সময়েই ন্যায্য। ভয় ভাঙার কথা সাধনারই অন্তর্গত।

৬। খেতে যখন বসি তখন প্রার্থনা করি যেন প্রতি খাদ্যকণা

মাকে নিবেদন করি, সব কিছু যেন সহজে হজম হয়, খাদ্য সম্বন্ধে যেন আমার মধ্যে সমতাবোধ এবং অপক্ষপাত আসে, যেন লোভ না ক'রে সকল রকম খাদ্যেই সমান রস ও আনন্দ পাই।

উঃ এ প্রার্থনাও সাধনারই অন্তর্গত।

৭। কাজে যখন যাই তখন প্রার্থনা করি মায়ের শক্তি আমার কাজের ভার নিন, সুচারু ভাবে ও যত্নের সঙ্গে এবং আনন্দের সঙ্গে কাজটি করে যেতে আমাকে সাহায্য করুন, নিজের অহং এবং কামনাকে বাদ দিয়ে মায়ের স্মৃতি বজায় রেখে এই বোধ নিয়ে যেন কাজ করি যে তিনিই আমার কাজে সমর্থন করছেন।

উঃ এও সাধনারই অন্তর্গত।

৮। কাজের বিরতির সময় প্রার্থনা করি শক্তি সাহায্য ও স্মৃতিরক্ষার জন্য।

উঃ এও সাধনারই অন্তর্গত।

৯। মন্দ বা নোংরা চিন্তা ও তদনুরূপ অনুভব যখন আসে তখন প্রার্থনা করি তার থেকে মুক্তি ও শুদ্ধির জন্য।

উঃ এও সাধনারই অন্তর্গত।

১০। যখন পড়তে বসি তখন প্রার্থনা করি যেন শীঘ্র

বুঝতে ও আয়ত্ত করতে পারি।

উঃ সাধনার বা সাধনার যন্ত্রগুলির উন্নতির পক্ষে যদি করা হয় তাহলে তা ঠিকই।

১১। কাজে কোনো ভুল করলে প্রার্থনা করি যেন আরো সচেতন ও নির্ভুল হই।

উঃ এও সাধনার অঙ্গ।

১২। বন্ধুকে পার্সেলে প্রসাদ পাঠাবার জন্য যখন পোস্ট-অফিসে যাই রেজিষ্ট্রি করতে তখন প্রার্থনা করি যেন সেটা পৌঁছতে বিলম্ব না হয়।

উঃ সাধনার জীবনে সময়ের ক্ষতি নিবারণ করার জন্য হলে তা ঠিকই।

১৩। ধ্যানে বসে প্রার্থনা করি মায়ের শক্তি যেন ধ্যানের ভার নিয়ে তা গভীর, অটুট, একাগ্র এবং অবান্তর চিন্তা বর্জিত ক'রে দেন, অস্থিরতা প্রভৃতি নিবারণ করেন।

উঃ এও সাধনারই অংশ।

১৪। হতাশা, নিরুদ্যম, বিঘ্নবিপদ, ভুল চিন্তা, সন্দেহ, জড়তা বা ঐ ধরনের কিছু এলে প্রার্থনা করি যেন মা সৎসাহস ও বিশ্বাসকে বজায় রেখে ওগুলো সব কাটিয়ে দেন।

উঃ এও সাধনার অন্তর্গত।

১৫। অন্যান্য সময় প্রার্থনা করি যেন আমার মধ্যে শান্তি, শক্তি, আলো প্রভৃতি দিয়ে ভরিয়ে দেন, আমাকে শক্তিসামর্থ্য দিয়ে বাঁচিয়ে রেখেছেন বলে তাঁকে কৃতজ্ঞতা জানাই।

উঃ এও সাধনার অংশ।

×

প্রঃ রাত্রি ১টার সময় হঠাৎ আমার ভাই দারুণ যন্ত্রণাতে ছট্‌ফট্‌ করতে করতে বললে শ্রীঅরবিন্দ আমার এ কষ্ট সারাতে পারেন কিনা। আমি আপনার প্রসাদী ফুল নিয়ে তার ব্যথার জায়গাতে ঠেকালাম। তখনই দেখি ব্যথাটা কমে গিয়ে সে সেরে উঠল। জানতে চাই যে আপনি কি এ কথা জানেন, আমার প্রার্থনা কি শুনেছিলেন?

উঃ এসব ক্ষেত্রে এই ব্যাপার হয় যে কাউকে যখন মা ভক্ত হিসাবে গ্রহণ করেন তখন তিনি নিজের থেকে কিছু বিভূতি তার কাছে পাঠান, সেই বিভূতি বরাবর তার সঙ্গে থাকে এবং এখানে তাঁর সত্তার সঙ্গে বরাবর তার যোগ থাকে। সেই ব্যক্তি যখন বিশ্বাস ও ভক্তির সঙ্গে কিছু করে, যেমন তুমি করেছিলে, তখন সেই বিভূতির মাধ্যমে তা মায়ের চেতনাতে পৌঁছয় এবং তাঁর শক্তিই তখন ঐভাবে কাজ করে।

×

অকাট্য সাহায্য ও রক্ষা

নামের রক্ষাকারী শক্তি সম্বন্ধে তুমি যা দেখেছ তা প্রত্যেকের বেলাতেই

হতে পারে যদি আন্তরিক আস্থা ও নির্ভরতার সঙ্গে রক্ষা পাবার জন্য নাম করতে থাকে। হৃদয়ের ভিতর থেকে ডাকলে তা কখনো বৃথা হয় না। কোনো বাহ্য ঘটনা তোমার এ বিশ্বাস যেন নষ্ট না করে; কারণ সর্ব কিছুকে কাটিয়ে লক্ষ্যে পৌঁছবার পক্ষে বিশ্বাস ও আস্থার চেয়ে বড়ো শক্তি আর কিছুই নেই। জ্ঞান ও তপস্যার যতই শক্তি থাক তবু এই বিশ্বাসের চেয়ে তা কম--এই যাত্রাপথে বিশ্বাসই সব চেয়ে জোরালো জিনিস।

মায়ের শরণ তুমি পেয়েছ আর মায়ের জাগ্রত ভালোবাসা। তারই উপর নির্ভর ক'রে থাকো, তোমার সত্তাকে উত্তরোত্তর খুলে দাও--সব আক্রমণ ব্যর্থ ক'রে তুমি রক্ষা পাবে।

৮-১০-১৯৩৬

×

প্র : সাধকেরা যে মায়ের নিয়মগুলি অবাধে মেনে চলে তার কারণ কি এই নয় যে অন্যথা করলে তারা মায়ের শরণলাভ থেকে বিচ্যুত হবে?

উ : ঠিক তাই--অন্যথা করলে তখনই তারা মায়ের শরণ হারাবে।

৮-৬-১৯৩৩

×

প্র : সকলেই চাইবে মায়ের শরণ; কিন্তু হয়তো তার জন্য কতকগুলি শর্ত আছে।

উ : খুব কম লোকেই তা চায়। সাধারণভাবে মায়ের শরণদান সকলেরই জন্য, কিন্তু অধিকাংশ লোকই তাদের আচরণে চিন্তায় ও কাজে অন্যান্য শক্তিকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে।

২৬-৮-১৯৩৩

×

প্রঃ যারা নিত্য মায়ের আশ্রয়ের মধ্যে থাকে, তাদের হয়তো হতাশা সন্দেহ প্রভৃতি আসে না।

উঃ ওগুলি আসবার চেষ্টা করে কিন্তু স্থায়ীভাবে প্রবেশ করতে পারে না।

×

প্রঃ কোনো ছেলে যদি অল্পবয়সে এখানে আসে, সে কি যৌন বিড়ম্বনা হতে মুক্ত হয় না?

উঃ আপনা হতেই হয় না, তা সম্ভব নয়---তবে যদি মায়ের প্রভাবে পুরোপুরি থাকে আর অন্য সাধকদের ঐরূপ আবহাওয়ার মধ্যে না যায়, উত্তেজক লেখা প্রভৃতি পড়ে বিগড়ে না যায় তাহলে হতে পারে। আজ পর্যন্ত তেমন কেউ তো হয়নি।

৮-১১-১৯৩৩

×

প্রঃ আজ আমার এই চিন্তা এলো, "প্রাণসত্তাকে সংযত করা নিয়ে তুমি এত কষ্ট করছ কেন? ওসব চিন্তা ও কামনা মায়ের হাতে ছেড়ে দাও, মাকে কাজ করতে দাও।"

উঃ মাকে কাজ করতে হলে সব চিন্তা কামনা তাঁর কাছে খুলে প্রত্যাখ্যান করা চাই।

৩-৯-১৯৩৩

×

প্রঃ কাল মাকে যে চিঠি দিয়েছি সেটা এখন পড়ে ভাবলাম, তাঁকে অন্যেদের সম্বন্ধে মন্দ চিন্তাগুলো লিখে ভালো

করিনি, মা অসন্তুষ্ট হয়েছেন।

উঃ ওতে মা অসন্তুষ্ট হন না। চুপ ক'রে থাকার চেয়ে সব খুলে জানানোই ভালো।

৯-৬-১৯৩৩

×

প্রঃ ঘুম থেকে উঠে দেখি আমার ঠাণ্ডা লেগেছে। চেতনা মায়ের শক্তিকে আহ্বান করলে, তাতে ঠাণ্ডা লাগা সেরে গেল। অন্যান্য কষ্টের বেলাতেও তাই করি। জানতে চাই যে মায়ের শক্তিকে এই ভাবে ডাকার পদ্ধতি সমুচিত হয় কিনা।

উঃ ঠিকই উপায়। খুব ভালো যে তুমি মাতৃশক্তিকে কাজে লাগাতে শিখছ।

২৭-৮-১৯৩৪

×

প্রঃ ক'এর জঙ্ঘাপীড়া সম্বন্ধে চিঠি পেয়ে সে চিঠি পরের দিন মাকে পাঠাই। কিন্তু পরে জানলাম আমি চিঠি পেতেই ব্যথা সেরে গেছে। মাকে জানাবার আগেই কি সে ব্যথা তাঁর শক্তিতে আপনা হতে সেরে গেল?

উঃ ঐ দিনই খ মাকে জানিয়েছিল ক'এর ব্যথার কথা, সুতরাং তোমার চিঠির থেকেই মায়ের কাজ হয়নি। কিন্তু এমনভাবে আপনা হতে কাজও হয়ে থাকে, কখনো বা চিঠি লেখা মাত্র, কিংবা সে চিঠি মায়ের আবহাওয়াতে আসা মাত্র।

×

তোমার চলে যাবার কোনও কারণ নেই, এবং তুমি চলে গেলে সেটা তোমার পক্ষে কাজের এবং সব জিনিসের পক্ষেই খারাপ হবে—তাই মা তোমার চলে যাওয়া অনুমোদন করতে পারেন না। তোমার কাজ ছেড়ে দেওয়ার বিপক্ষে যুক্তিসমূহ আগেও যেমন ছিল, এখনও আছে; এমন কিছু ঘটেনি যার জন্য সেগুলি বদলাতে হবে। ঈর্ষা প্রকৃতির একটি ত্রুটি, কিন্তু এ এখানকার অনেকেরই আছে। প্রায় প্রত্যেকেরই প্রকৃতিতে কিছু না কিছু ত্রুটি আছে, যা তাকে বাধা দেয় আর গোলমাল সৃষ্টি করে। কিন্তু কাজ ও সাধনা ছেড়ে দিলেই বা মাকে ত্যাগ করলেই এর সমাধান হয় না। মায়ের সাহায্যে তোমাকে কাজ ও সাধনা চালিয়ে যেতেই হবে, যতদিন পর্যন্ত ঈর্ষা ও অন্যান্য বাধা অপসারিত না হয়। আমরা তোমাকে আগেই বলেছি যে এসব দোষত্রুটি একদিনে যায় না, কিন্তু তুমি যদি চেষ্টা করো আর মায়ের উপর নির্ভর করো, এরা দূর হবেই। বিরুদ্ধ শক্তিকে তোমরা ভুল পথে নিয়ে যেতে দিয়ো না। সব অবসাদ প্রত্যাহার করো, সোজা এগিয়ে চলো, যতদিন না লক্ষ্যে পৌছও।

১৭-৭-১৯৩৫

×

প্রঃ 'ক' যখন তার অসুবিধার কথা আমায় বলেছিল, আমি তাকে বলেছিলাম যে তা দূর হতে পারে, মায়ের করুণা আহ্বান করে। তার মত একজন নতুন সাধিকার ডাক মা শুনবেন কিনা, এই নিয়ে সে তর্ক করেছিল। পুরানো এবং সাধনায় অগ্রসর সাধকরাই এতো ডাক দেন মাকে, যে তার মত একজন নতুন সাধিকার ডাক হাওয়ায় মিলিয়ে যাবে, সেই গোলমালে আর কানে যাবে না। আমি বলেছিলাম যে মা যদি আমাদের ডাকে সাড়া না দেন, তার নিশ্চয়ই কারণ আছে; কিন্তু যখন তিনি আসেন, থাকবার জন্যই আসেন। ততক্ষণ পর্যন্ত আমরা বিশ্বাস ও সমতা বজায় রেখে তাঁর আসবার পথ পরিষ্কার করতে থাকব। আমাদের ডাকে সাড়া দেওয়ার চেয়ে, খুব সম্ভব তাঁর আরও দরকারী কাজ আছে এবং

কেন আমরা এই দাবী করব যে তিনি সে কাজ ছেড়ে আমাদের কাছে আসবেন? এ পর্যন্ত এমন ঘটনা ঘটেনি যে মাকে অন্তর থেকে ডাকা অথচ তিনি সাড়া দেননি। অন্তর থেকে ডাকার মানেই যে তিনি সেখানে আছেন। যখন 'ক'-কে এসব বললাম একটি শক্তি আমার কপালের মাঝখান থেকে দুই ভ্রূর মাঝখানে নামছে টের পেলাম। কি কারণে এটা হ'ল?

উঃ 'ক'-র যুক্তিগুলির বিশেষ সার্থকতা নেই। তোমার যুক্তিগুলি তার চেয়েও ভাল বটে, কিন্তু একদম ত্রুটিহীন নয়। বাহ্য মন দিয়েই মার শক্তি সীমাবদ্ধ নয়। কাজেই অনেক জরুরী কাজ করতে হলেও, বনজঙ্গল থেকেই আসুক বা অন্য কোথা থেকেই, ডাক তাঁর কাছে পৌঁছুবেই। তা-ছাড়া আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে বয়সের কোনও দাম নেই। সুতরাং পুরানো সাধকদের জন্য, 'ক' ডাকবে না কেন? যাদেরই মাকে প্রয়োজন, তাদের সকলেরই কাছে তিনি মনে বা আছেন। কাজেই তোমার "মা আসেন না? আসবেন না?" প্রভৃতি প্রশ্ন অবান্তর, কিন্তু তোমার অন্য সব উত্তর নির্ভুল। মা এখনও তোমার মধ্যে কাজ করছেন, কিন্তু তোমার অন্তঃদৃষ্টি বা অনুভব-শক্তি উন্মীলিত হয়নি বলেই তুমি তা দেখতে বা বুঝতে পারছ না।

তোমার কপালের মাঝখানে যা নেমেছিল তা হচ্ছে মায়ের উত্তর, বা মায়ের উপস্থিতির পরশ, তাঁর চেতনা, তাঁর শক্তি যা কাজ করছিল তোমার অন্তরের মন, ইচ্ছাশক্তি, বা দৃষ্টির কেন্দ্রটিকে উন্মীলিত করতে। যখন তা খুলে যায়, তখন লোকে দেখতে পায় বা বুঝতে পারে, এমন জিনিস যা বাহ্য চোখে দেখা যায় না, বাহ্য মন দিয়ে যা বোঝা যায় না।

১১-১০-১৯৩৫

×

অন্তরের মিলনই রক্ষা করতে পারে, বাইরের সান্নিধ্য নয়।

১৭-১১-১৯৩৩

রোগ সারাবার ক্ষেত্রে মায়ের কাজ

প্রঃ যে ব্যাপারটি কিছুদিন আগে মায়ের গোচরে আনা হয়েছিল, কিসের উপর ভিত্তি করে মা সেখানে কাজ করলেন?

উঃ সমস্ত ব্যাপারটায় মা তাঁর অন্তঃদৃষ্টির উপর ভিত্তি করে কাজ করলেন। শুধু বাইরের ঘটনাবলীর উপর ভিত্তি করে তিনি কাজ করেন না, কিন্তু তাদের পশ্চাতে যে সব জিনিস রয়েছে, তাদের দেখে বা অনুভব করে।

২৯-৮-১৯৩৫

১১

মায়ের মতামত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা

মায়ের মতামত সম্বন্ধে ব্যাখ্যা

মায়ের প্রার্থনা

প্রঃ মায়ের বইখানিতে (Prayers and Meditations) কোথাও কোথাও দেখলাম যে মা "ভগবতী মায়ের" কাছে তাঁর প্রার্থনা জানাচ্ছেন। তা কেমন ক'রে হয়? মা কি নিজেই "ভগবতী মা" নন, অথবা অন্য কোনো মা আছেন যাঁকে ঐ নামে সম্বোধন করছেন? অথবা এই সব প্রার্থনা কোনো নির্ব্যক্তিকের উদ্দেশে?

উঃ এই সকল প্রার্থনা অধিকাংশই মায়ের পৃথিবী চেতনাতে একাত্ম হয়ে লেখা। মা নিম্ন প্রকৃতিতে থেকে উচ্চ প্রকৃতির মাকে বলছেন, অর্থাৎ মা পার্থিব চেতনার হয়ে সাধনা করছেন এবং উপরিস্থ নিজেরই কাছে প্রার্থনা করছেন সেখানকার শক্তিতে এখানকার চেতনার রূপান্তরের জন্য। এমনি সাধনা করতে করতে তবে উচ্চ চেতনা পার্থিব চেতনার সঙ্গে একাত্ম হতে পারবে। শব্দটি সাধারণ অর্থে ব্যবহৃত। ভগবানকেই তিনি মা-ও বলেছেন প্রভুও বলেছেন। এই মা যিনি সাধনা করছেন, ইনিই সেই ভগবতী মা ভিন্ন মূর্তিতে, দুই ভাবেই ভগবানকে প্রভু বলা যায়। এমনি ভগবান হয়ে ভগবানের কাছে প্রার্থনা তুমি রামায়ণ এবং মহাভারতেও পাবে।

২১-৮-১৯৩৬

প্রফুল্লতা সম্বন্ধে মায়ের ব্যাখ্যা

হাল্কা রকমের হাসিখুশি বা ডোন্ট-কেয়ার ভাব আমরা কাউকেই নিতে বলতে পারি না। মা বলেছেন প্রফুল্ল থাকার কথা, তার মানে

হাল্কা মনে বেপরোয়া আমোদে মত্ত থাকা নয়——যদিও যোগের মধ্যে একটা গভীরতর উৎফুল্ল ভাবের স্থান আছে। মা বলেছেন যে দুঃখের মধ্যেও সমানভাবে প্রফুল্ল থাকার কথা, যা নিশ্চয়ই যোগের শিক্ষার বিরোধী নয়। বাহ্য প্রাণ প্রকৃতি (গভীরতর প্রকৃত প্রাণসত্তা নয়) একদিকে যেমন বাহ্য হাসিখুশি নিয়ে থাকে, অন্যদিকে তেমনি দুঃখ পেলে বিরস এবং হতাশ ও বিক্ষুব্ধ হয়ে যায়——কারণ তাই হলো তার পক্ষে তার জীবনের আলো-ছায়া; কিন্তু মুক্ত শান্তিভাব বা আনন্দময় ভাবের গভীরতা বা দুইই একত্রে হওয়া আত্মাতে এবং মনে——এবং প্রকৃত প্রাণসত্তাতেও, তা হলো যোগের অন্তর্গত। মানুষ সাধকের পক্ষে তা খুবই সম্ভব, তার জন্য দিব্যত্বের দরকার হয় না।

ঈর্ষা সম্বন্ধে মায়ের অভিমত

একটা কথা তোমাকে বলা দরকার যাতে তোমার মনে একটা ভুল ধারণা থেকে না যায়। তোমার চিঠির মধ্যে তুমি লিখেছ যে মা নাকি তোমাকে বলেছেন যে সাধারণ জীবনের প্রকৃত প্রেমে ঈর্ষা থাকা অপরিহার্য, যদি কারো প্রেমাস্পদ অন্য কাউকে ভালোবাসছে দেখেও সে ঈর্ষান্বিত না হয়, তাহলে বুঝতে হবে তাদের মধ্যে ভালোবাসা নেই! নিশ্চয় তুমি মায়ের কথাটা ভুল শুনেছ এবং ভুল বুঝেছ। মা কিন্তু বরাবরই এর ঠিক উল্‌টো কথাই বলেছেন ও ভেবেছেন, এবং ও কথা তাঁর জ্ঞান ও অভিজ্ঞতার সম্পূর্ণ বিপরীত। প্রেম ও ঈর্ষা সম্বন্ধে সাধারণ মনের ধারণা তাই বটে কিন্তু মায়ের তা নয়। মা বলেন তাঁর বিলক্ষণ স্মরণ আছে যে তিনি তোমাকে ওর উল্‌টোটাই বলেছেন যে সাধারণ জীবনেও যেখানে প্রকৃত ভালোবাসা আছে সেখানে ঈর্ষা থাকবে না। ঈর্ষা হলো মানুষের অহংপূর্ণ নিম্ন প্রকৃতির সাধারণ ক্রিয়া যার মধ্যে থাকে নিজের দখল ক'রে আঁকড়ে থাকার প্রবৃত্তি, তা ছাড়া আর কিছু নয়। একথা তোমার মনে পরিষ্কার ক'রে জানিয়ে দিতে চাই যে নিম্ন প্রাণ প্রকৃতির ঐসব জিনিসকে আত্মার ভিতরকার সত্য কোনোই সমর্থন দেবে না; ওগুলি হলো প্রাণগত অজ্ঞানতার অন্তর্গত, প্রাণগত অহংএর সৃষ্টি।

১-২-১৯৩৩

আধ্যাত্মিক অনুভূতি ও উত্তেজনা

> প্রঃ মা তাঁর "কথাবার্তা"তে বলেছেন: "যে চেঁচিয়ে লাফিয়ে নেচেকুঁদে নিজেকে বহিঃপ্রকাশ করে, সে ভাবে যে আমি এটা খুব অসাধারণ উত্তেজনা দেখাচ্ছি, আর তার প্রাণপ্রকৃতি ওতে খুবই খুশি হয়ে ওঠে।" তার মানে কি আধ্যাত্মিক অনুভূতিতে আমরা অসাধারণ না হয়ে সাধারণই থাকবো?

উঃ উত্তেজনাতে সাধারণ থাকতে হবে সে কথা মা আদৌ বলেননি—তিনি বলেছেন যে মানুষ কেবল উত্তেজিতই হয় না, সে তার উত্তেজনাকে অসাধারণ রকমে প্রকাশ করতেও চায়। কিন্তু উত্তেজনা জিনিসটাই খারাপ, আর তাকে অসাধারণ করতে চাওয়া আরো খারাপ।

৭-৬-১৯৩৩

ঠিক ঠিক অনুভব করার ক্ষমতা

মায়ের মন্তব্যটি ক ঠিকই বলেছে কিন্তু সে জিনিসটা ঠিক বোঝেনি। এমন কথা তিনি বলতে চাননি যে কেবল ইচ্ছা করলেই অন্যের ভিতরের কথা জানা যাবে কিংবা তার সম্বন্ধে যে ধারণা আসবে তা আপনা হতেই নির্ভুল হবে। তিনি বলেছেন একরকম ক্ষমতা লাভের কথা (গুহ্য বা যৌগিক ক্ষমতা) যার দ্বারা সঠিক জিনিসটা অনুভব করা যায়, এবং তুমি ইচ্ছা করলে সে ক্ষমতা অর্জন করতে পারো। কিন্তু ইচ্ছা করলেই তখনই তা হবে না, এমন কোনো সহজ রাস্তা নেই যে ট্রা-লা-লা বলে গেয়ে দিলে আর অমনি তা হয়ে গেল: ওতে অনেক বছর লেগে যেতে পারে আর যত্নের সঙ্গে নিখুঁত ভাবে তার জন্য চেষ্টা করতে হয়। কারণ এসব হলো বোধিগত অনুভব, আর বোধি এমন জিনিস যার স্থানে চেতনার অন্যান্য রকমের ভ্রান্ত ক্রিয়াও চলে আসতে পারে। তোমার মধ্যে যে ধারণা আসবে তা মানসিকও হতে পারে প্রাণিকও হতে পারে এবং তা যুক্তিসম্মত হতেও পারে বা নাও হতে পারে—আর যুক্তিসম্মত হলেও তা যে নির্ভুল হবে

এমন কথা নেই : একই জিনিস হলেও তাকে ধরতে ভুল হয়, কিংবা তার সঙ্গে ভুল মিশে যায় কিংবা উল্‌টো ভাবে দেখে তা মিথ্যা হয়ে দাঁড়ায়, ইত্যাদি। তা ছাড়া সে ধারণা প্রায় যুক্তিশূন্য হয়, তোমার নিজেরই মনের বা প্রাণের গড়া জিনিস হয় কিংবা অন্য কারো ভুল ধারণা থেকে তুমি নিজেও তাই নিজের বলে ধারণা ক'রে নাও। অপর ব্যক্তিটির সঙ্গে তোমার নিজের যদি কোনো মিল না থাকে, তাহলে তুমি তার ভিতরকার জিনিসকে দেখতে না পেয়ে তাকে নিষ্প্রাণ উদাসীন বলে ধরে নিলে, কিংবা তোমার বোধির কাছে তার প্রাণগত বোধি খাপ খাচ্ছে না বলে তুমি তার অবস্থাকে খারাপ বলে ভাবলে। এমনি অনেক কিছুই রয়েছে যার ভিতর থেকে ঠিক জিনিসটিকে সযত্নে বেছে নেবার ক্ষমতা থাকা চাই। বস্তুত আপন চেতনা ও তার ক্রিয়াকে যতক্ষণ না জানো ততক্ষণ অন্যের চেতনা ও তার ক্রিয়াকে জানতে পারো না। তবে সরাসরি রকমের একটা দৃষ্টিশক্তি বা বোধশক্তি বা স্পর্শশক্তি অর্জন করা সম্ভব যাতে সব জানা যায়, কিন্তু তার জন্য যথেষ্ট সময় সুযোগ, তীক্ষ্ণ ও নিখুঁত পর্যবেক্ষণ ও আত্মশিক্ষা গ্রহণের প্রয়োজন হয়। তেমন ক্ষমতা না আসা পর্যন্ত তুমি এমন কথা বলে বেড়াতে পারো না যে অমুক একজন উন্নত সাধক, বা অমুকের বিশেষ উন্নতি হয়নি, বা অমুক ব্যক্তি কোনো কাজেরই নয়। আর যদি তুমি তা জানতেও পারো, তবু তা প্রকাশ করার প্রয়োজন কিছু নেই।

৯-২-১৯৩৫

চেতনাকে ঘুরিয়ে দেবার কৌশল

মা যে বলেছেন চেতনাকে ঘুরিয়ে দেবার কৌশলের কথা, তার অর্থ হলো এই : তোমার বাহ্য মনকে সব সময় আপন সাধারণ অভ্যস্ত রীতিতে নিজের মনোভাব অনুযায়ী কাজ করতে না দিয়ে তাকে ভিতরে ঘুরিয়ে নাও, তাকে যথেষ্ট স্তব্ধ রেখে অপেক্ষা করতে থাকো, দেখ যে ভিতর থেকে বাইরের দিকে কিছু বেরিয়ে আসে কিনা। কারণ এই ভাব নিয়ে থাকলে তখন একটা আভ্যন্তরীণ মন বেরিয়ে আসতে পারে, এবং তা অদৃশ্য শক্তিদের যন্ত্ররূপে ভালো কাজ করতে পারে।

২-৮-১৯৩২

মায়ের গুহ্যশক্তি নিয়ে পরীক্ষা

ক বোধ হয় তাবই কথা বলেছে, মা আলজিরিয়াতে থাকা কালে অদৃশ্যভাবে উপস্থিত হয়েছিলেন প্যারিসে বন্ধুদের বৈঠকে, সেখানে একটা পেন্‌সিল উঠিয়ে নিয়ে কাগজে লিখে জানিয়েছিলেন। এ পরীক্ষাতে কৃতকার্য হবার পরে ঐ নিয়ে তিনি আর অগ্রসর হননি। সেই সময়টিতে তিনি ওখানে থিওঁব কাছে গুহ্যবিদ্যা অভ্যাস করছিলেন। বাস্তব দৃশ্য ভাবে রূপায়ণও সম্ভব, কিন্তু তা সহজে হয় না—তার জন্য নানা বিরল শক্তিকে কেন্দ্রীভূত করতে হয় কিংবা প্রাণময় সত্তাদের সঙ্গে গুহ্য সংযোগ করতে হয় যারা বাস্তবে রূপ দিতে পারে, যেমন একবার গেস্ট হাউসে প্রত্যহ ঢিল পড়তো যখন আমবা সেখানে ছিলাম। এসব কোনো মিবেক্‌ল নয়। কিন্তু তুমি যেমন বলেছ ওকে সাধারণ ভাবের দৈনন্দিন জিনিস ক'রে তোলা, তা ঠিক সম্ভব হয় না এবং আধ্যাত্মিক কোনো লাভও তাতে নেই, কারণ ওটা আধ্যাত্মিক শক্তি নয়, ও হলো একরকম গুহ্য প্রাণ-মনগত শক্তি। ও চেষ্টা কবতে গেলে আধ্যাত্মিক সাধনাব বদলে তা গুহ্যক্রিয়া হয়ে দাঁড়াবে।

২০-১০-১৯৩৫

মায়ের অন্যান্য গ্রহে গমন

> প্র ঃ আমি ভাবছিলাম যে মা হয়তো মঙ্গল গ্রহ বা অন্যান্য সুদূরবর্তী গ্রহের সঙ্গে যোগাযোগ রেখেছেন যেখানে হয়তো কিছু প্রাণের অস্তিত্ব আছে।

উ ঃ বহুকাল আগে মা সূক্ষ্মদেহে সর্বত্র যাতায়াত করতেন কিন্তু তিনি দেখলেন ওটা অবান্তর জিনিস। আমাদের সমস্ত মনোযোগ এই পৃথিবীতেই কেন্দ্রীভূত থাকা চাই কারণ আমাদের যা কিছু কাজ তা এইখানে। তা ছাড়া পৃথিবীই হলো সারা বিশ্বের অন্যান্য জগতের কেন্দ্রীকৃত সৃষ্টি। তাই এখানকার আবহাওয়াতে যাই কেন তুমি স্পর্শ করবে,

তার প্রতিফলিত স্পর্শ সে জগতেও গিয়ে পৌছবে।

১৩-১-১৯৩৪

নারদের সঙ্গে সাক্ষাৎ

দুঃখের বিষয় নারদের কথা আমি বিশেষ কিছু জানি না। মা একবার তাঁকে দেখেছিলেন অধিমানস ও অতিমানসের সংযোগস্থলে দাঁড়িয়ে আছেন, যেন সেটাই সর্বোচ্চ ভূমি। কিন্তু নিম্নস্তরেও তাঁর ক্রিয়া আছে—–কিন্তু আমি সে কথা ঠিক বলতে পারব না। পুরাণের গল্পে বলে তাঁর বিশেষত্ব এই যে তিনি একদিকে প্রেম ও ভক্তির পরাকাষ্ঠা, আর অন্য দিকে মানুষের মধ্যে ঝগড়া বাধাতে তৎপর।

৫-৫-১৯৩৫

চেতনার বহিশ্চারণে শক্ পাওয়া

এক সেকেণ্ডের মতো শক্ পাওয়া ও শ্বাসরোধ হওয়া আর পড়ে গেলাম বোধ করা হতে পারে যখন চেতনা দেহ থেকে বাইরে বেরোয় অল্পবিস্তর কালের জন্য; চেতনা উপরে ওঠবার বা দেহে ফিরবার সময় ওটা হয়। মায়ের এমন শত শত বার হয়েছে। এটা দৈহিক কিছু নয় (ডাক্তার পরীক্ষা ক'রে পায়নি কিছু)। এই যাতায়াত যখন চেতনার পক্ষে স্বাভাবিক হবে তখন ওটি থাকবে না।

১-১০-১৯৩৫

মৃতের সঙ্গে সাক্ষাৎ

যখন মা বলেছেন যে মৃত জনের সঙ্গে সাক্ষাতের চেষ্টা করা ভালো নয়, তখন তিনি সে কথা বলেছেন আধ্যাত্মিক দিক থেকে, ভূতজ্ঞরা তা

জানে না কিংবা মানে না।

২৫-৮-১৯৩৬

গত জন্ম সম্বন্ধে মায়ের কথা

মা কেবল তাদেরই কাছে তাদের গতজন্ম সম্বন্ধে বলেন যাদের বেলাতে একাগ্র হয়ে তিনি কোনো দৃশ্য বা গতজন্মের ঘটনা স্পষ্ট দেখেন, কিন্তু আজকাল ওটা খুব কমই হয়।

৩০-৬-১৯৩৩

ভগবানকে খাদ্য নিবেদন

> প্রঃ মা তাঁর বইটিতে (Words of the Mother) বলেছেন: "যখন তুমি খাবে তখন মনে করবে যে তোমার ভিতর দিয়ে ভগবানই খাচ্ছেন"। এর অর্থ কি?

উঃ ওর মানে খাদ্যটা তুমি নিজের অহংকে বা কামনা সত্তাকে না দিয়ে ভগবানকে দিচ্ছ, তিনিই আছেন সকল ক্রিয়ার পিছনে।

১১-১-১৯৩৫

অখাদ্য খাওয়া অনিষ্টকর

মা এই বলতে চেয়েছেন যে অখাদ্য খেলে বা খেয়ে হজমের দোষে বিষ জন্মালে তাতে দীর্ঘায়ু লাভের পক্ষে বাধা ঘটে।

১৪-১-১৯৩৫

ফটো দেখে জানা

তুমি জানতে চাইছিলে যে ক এখানে এসেছিল কিনা বা মায়েব সঙে তার সংস্পর্শ ঘটেছিল কিনা, সেই কারণে ফটোর প্রয়োজন হয়েছিল। কারণ নাম থেকে মা জানতে পারেন না, কিন্তু চেহারা দেখে জানেন সে তাঁর কাছে এসেছে কিনা––যেমন হলো ক-এর ফটো দেখে।

২৬-১-১৯৩৪

মায়ের বই পড়ে তাঁর চেতনার সঙ্গে একাত্মবোধ

প্র ঃ মায়ের "প্রার্থনা" ও "কথাবার্তা"র বইগুলি পড়লেই আমি তাঁর চেতনার সঙ্গে সংস্পর্শ বোধ করি। তাই ভাবি যে ঐরূপ বইগুলি পড়ে পড়ে চেতনাকে তাঁর চেতনার সঙ্গে একাত্ম ক'রে তুলতে পারা যায় কিনা এবং তার দ্বারা প্রাণ মন প্রভৃতি অংশকেও উন্নীত করা যায় কিনা।

উ ঃ বই পড়ে চেতনা তীব্রতর হলে তখন মায়ের চেতনার সঙ্গে তার একাত্ম হওয়া সম্ভব––এবং তোমার কথামত প্রাণ প্রভৃতিরও কতকদূর পর্যন্ত উন্নতি হওয়া সম্ভব।

২১-৮-১৯৩৫

ফরাসী জানা ও মায়ের সান্নিধ্য

প্র ঃ একথা কি বলা চলে যে ফরাসী জানলে ভবিষ্যতে মায়ের সেবা করা খুব ভালো হবে?

উ ঃ ওতে একটা দিক দিয়ে মায়ের কাছাকাছি হওয়া যাবে।

৩-৫-১৯৪৫

মায়ের বাদ্যসঙ্গীত

মা যে সঙ্গীত বাজান তা ক-এর মতে প্রায়ই হয় ভারতীয় কোনো রাগের মতো। নিজের ভিতর থেকে যা আসে তাই তিনি বাজান, কোনো ইউ-রোপীয় বা ভারতীয় রচিত কোনো সুর ধরে তিনি বাজান না—আর ভার-তীয় সুর কখনই তিনি শেখেননি।

১১-৯-১৯৩৪

×

মা তাব ছেলেবেলা থেকেই বরাবর বাজিয়েছেন—সুতরাং অনেকবার বাজানো বা গান করা তার পক্ষে সহজ।

১৫-৯-১৯৩৩

×

মায়ের সঙ্গীতের মধ্যে কি আছে তা জানবার জন্য কোনো সঙ্গীত-বিদ্যার দরকার হয় না। আর সঙ্গীতশাস্ত্র সঙ্গত কোনো ভাব প্রকাশেব জন্য তিনি বাজান না, তার সঙ্গীতের দ্বারা তিনি উচ্চস্তরের কিছুকে নামিয়ে আনতে চান এবং নিজেকে খোলা রেখে প্রত্যেকেই তা গ্রহণ করতে পারে।

১৫-৯-১৯৩৩

×

প্র ঃ একথা কি ঠিক যে মা যখন অর্গ্যান বাজান তখন তিনি আমাদের সাহায্যের জন্য উচ্চস্তরের দেবতাদের এখানে নামিয়ে আনেন?

উ ঃ চেতন ভাবে নয়।

৯-২-১৯৩৪

×

প্রঃ তবে কি মায়ের সঙ্গীতে আকৃষ্ট হয়ে দেবতারা এখানে নেমে আসেন?

উঃ তা হতে পারে।

১০-২-১৯৩৪

×

প্রঃ মা কি সঙ্গীত বাজাবার সময় কোনো কিছুকে অভিব্যক্ত করেন?

উঃ তা না করলে তিনি বাজাতে যাবেন কেন?

১৯-৪-১৯৩৪

মায়ের পতাকার মর্ম

নীল পতাকা সম্বন্ধে—যাতে শ্বেত পদ্ম অংকিত আছে। ওটি মায়ের পতাকা। শ্বেত পদ্ম হলো মায়ের প্রতীক, লাল পদ্ম আমার প্রতীক। আর নীল হলো কৃষ্ণের বর্ণ, অর্থাৎ দিব্য চেতনার প্রতীক, যে চেতনাকে পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করাই হলো মায়ের কাজ। এই হলো মায়ের পতাকার মর্ম, ওটি এই আশ্রমের পতাকা রূপে ব্যবহৃত। তার মানে সেই দিব্যচেতনা এখান থেকে জগতের জীবনের উপর নেতৃত্ব করবে।

১৪-৩-১৯৪৯

যোগ শক্তিকে বাহ্য উপায়ের সহায়তা

অবশ্য বাহ্য উপায়ও নেওয়া চাই, যাতে সব দিক থেকেই এমন সুরাহা হয় যে বিরোধী শক্তির জয় হতে না পারে। কিন্তু যোগশক্তি ভিন্ন বাহ্য উপায় সফল হয় না।

আমাদের নিজেদেরই বাইরের দিক থেকে আক্রমণ এসেছিল। প্যারিসের মন্ত্রীর কাছে আমাদের বিরুদ্ধে নালিশ গিয়েছিল, সেখান থেকে এখানকার গভর্নরের কাছে রিপোর্ট চাওয়া হয়েছিল, আমাদের আশ্রমের পক্ষে মহা বিপত্তির সম্ভাবনা ঘটেছিল।

আমরা একটা সহজ বাহ্য উপায় নিলাম, মায়ের ভাইকে (আফ্রিকাতে ফরাসী গভর্নর) এবং এক খ্যাতনামা ফরাসী লেখককে লিখে পাঠালাম মন্ত্রীকে প্রভাবিত করতে। কিন্তু এদিকে আমি তীব্র আভ্যন্তরীণ শক্তি প্রয়োগ করতে থাকলাম সেখানকার মন্ত্রীর দপ্তরে, এখানকার গভর্নরের উপর, যাতে তাদের মনের পরিবতন এসে বিরোধিতার ভাব ঘুচে যায়। তার ফল হয়েছে, আমাদের আশ্রম আরো সুপ্রতিষ্ঠ হয়েছে, আর অনুকূল ভাবাপন্ন নতুন গভর্নর এসেছে। তবু আমাদের সতক থাকতে হয় যাতে ওরূপ ভয়াবহ অবস্থা আর না ঘটে। একটা অসুবিধা এই হয়েছে যে আমরা এখানে আর কোনো বাড়ি কিনতে পাবো না, দরকার হলে জমি কিনে নতুন বাড়ি ক'রে নিতে হবে। তার জন্য অনেক অথ চাই।

তবে একদিক থেকে দেখলে এটা তেমন অসুবিধা নয়, কারণ আমি অনেক কাল থেকে ভাবছিলাম যে আশ্রমের আর বেশি বিস্তার হওয়া ঠিক নয়, এখন আধ্যাত্মিক দিক থেকে আশ্রমের আভ্যন্তরীণ জীবনকে আরো সংহত করতে হবে।

এই খবরটি বললাম দৃষ্টান্ত স্বরূপ, যোগশক্তিকে বাহ্য উপায়ের সহায়তা দেবার পক্ষে।

২০-৩-১৯৩৫

×

প্র ঃ মায়ের কাজের পক্ষে আরো বাড়ির দরকার হওয়া কি অগ্রগতির লক্ষণ?

উঃ বাস্তবভাবে বিস্তারের লক্ষণ। অগ্রগতি নির্ভর করে ভিতরের কাজের উপর। যদি আভ্যন্তরীণ অগ্রগতি না হয়, তাহলে কেবল বাহ্য

বিস্তারে কোনো ফল নেই।

৭-৭-১৯৩৩

×

প্র ঃ মা কিংবা যে কেউ অধিমানসের উপরে বা অতি-মানসের নীরবতায় অবস্থান করেন তাঁর পক্ষে কি এই কণাবৎ তুচ্ছ জগতের দিকে নজর দেওয়া সম্ভব হয়?

উ ঃ সেটা নিভর করে তাঁর কাজের ভিত্তির উপর। ভগবৎ চেতনার কাছে অসীমেরও যা মূল্য ক্ষুদ্র কণারও তাই মূল্য।

৮-৮-১৯৩৪

×

মানুষের প্রাণধর্মী প্রেমের যতই চমৎকারিত্ব থাক, সে ভাব কেটে গিয়ে যখন তুমি উচ্চ স্তরে ওঠো তখন দেখতে পাও যে সেই প্রেমকে যতটা বড়ো মনে করেছিলে ততটা কিছু নয়। এখনও যদি সেই প্রেমকে বড়ো জিনিস বলে মনে স্থান দেওয়া হয় তাহলে আরো উচ্চতর দিকে যে টান, যার সঙ্গে ওর কোনো তুলনাই হয় না, তা ব্যাহত হবে। নিম্নতর অতীতের সম্বন্ধে এই আবেগ বজায় রাখলে বৃহত্তর ভবিষ্যতের দিকে অগ্রগতি কঠিন হয়ে উঠবে। মা তাই ইচ্ছা করেন না যে কেউ তার অতীত প্রেমের সম্বন্ধে কোনো উৎসাহজনক স্মৃতি রক্ষা করুক। সকল দিক বিবেচনায় তাকে "অতি তুচ্ছ" মনে করাই উচিত। এখন এই ভাবের সঙ্গে সেই ভাবের তুলনার কোনো প্রশ্নই আসে না। অতীতের সে কথা এখন ধুয়ে মুছে যাওয়া উচিত, তার আর কোনো গুরুত্বই থাকবে না।

১৯৩৪

×

মায়ের বাদ্যসঙ্গীত বুঝতে সঙ্গীতবিদ্যা জানবার দরকার হয় না।

মনের কোনো প্রচেষ্টারও দরকার হয় না। ভিতরে ভিতরে নীরব হয়ে থেকে নিজেকে খুলে রাখলে আপনা হতে যে অনুভব আসে তাতেই ওর মর্মবোধ হয়।

১৯৩২

×

হাঁ, ঠিক কথা। মায়ের বাদ্যসঙ্গীত হলো একটা প্রার্থনা, একটা আহ্বান।

১-৬-১৯৩৫

×

প্র ঃ ক ও খ'এর গান শুনে আজ মনে হলো বুঝি মায়ের মহালক্ষ্মী অংশই এখন প্রকট।

উ ঃ গানের দিনে মহালক্ষ্মীর অংশই প্রকট হয়ে ওঠে।

২৫-১২-১৯৩৩

×

প্র ঃ মা যখন তাঁর "প্রার্থনা ও ধ্যান" পড়ছিলেন তখন দেহে শিহরণ হলো কেন?

উ ঃ শক্তির তীব্র ক্রিয়া যখন হয়, তখন যারা তা পেয়ে থাকে তাদের শিহরণ হবেই।

×

গুরু, ভগবান ও অবতার

তোমার তিনটি চিঠির জবাব দেবার সময় পেলাম। ক অবশ্য "কথাবার্তা"

পেতে পারে। তোমার অপর বন্ধুটি যা বলেছে, তার হৃদয়ে যদি মায়ের প্রতি তেমন ভক্তি থাকে আর প্রকৃত ডাক জেগে থাকে তাহলে এখানে না এসেও সে মায়ের কৃপা পেতে পারে।

অবতার সম্বন্ধে বেশি বলে কোনো লাভ নেই। এখন একটা ঢেউ উঠেছে গুরুকে অবতার বলার, বিশেষত বাংলা দেশে। প্রত্যেক শিষ্যের কাছে গুরু হলেন ভগবান, কিন্তু তা বিশেষ অর্থে––কারণ গুরু দিব্যচেতনা পেয়েছেন, ভগবৎ মিলন তাঁর হয়েছে, তিনি শিষ্যকে যে মন্ত্র দেন সেটা ভগবানই দেন তাঁর চেতনার মাধ্যমে। কিন্তু অবতারবাদ ওর থেকে অন্য কথা। বিশেষ ক'রে পূর্ববঙ্গে যাঁরা এসেছেন তাঁদের অবতার বলা হয়েছে; তাঁরা জগতের জন্য কোনো কাজ নিয়ে এসেছেন, ভগবৎ শক্তি তাঁদের মধ্যে কাজ করছে, অর্থাৎ প্রত্যেক ক্ষেত্রেই অভিব্যক্তির জন্য চাপ এসেছে, কারণ ভগবৎ শক্তির ডাক পড়লেই সে আসে, কিন্তু পুরো অবতবণ ঘটেছে বলে মনে হয় না। তার থেকে বোধহয় এই ধারণা এসেছে যে এখন ভগবানের আসার সময় হয়েছে, এখন তাই অনেকেই আসছেন তাঁরই মতো হয়ে, কিন্তু আসল যিনি অবতার তিনি ওঁদের মাধ্যমে কাজ করছেন সময় না আসা পর্যন্ত।

তোমার গুরু যা বলেছেন তা থেকে মনে হয় না যে তিনি অবতারত্ব দাবী করেন। তার মানে বোধহয় এই যে তিনি একটা শক্তি নিয়ে এসেছেন পৃথিবীতে জগন্মাতার কাজের পথ প্রস্তুত করবার জন্য, এবং তিনি ও তাঁর শিষ্যেরা ছাড়াও অন্যান্য গুরুর অন্যান্য সম্প্রদায়ও সেই অভিব্যক্তিতে সাহায্য করবে। তিনি বলেছেন আরো যে তাঁর শিষ্যেরা ছাড়াও তাঁর প্রকাশ হতে পারে, অর্থাৎ মায়ের অভিব্যক্তির জন্য প্রস্তুতির কাজ হতে পারে। এতে যদি তাঁকে অবতার বলো, তাহলে তাঁর অপর কথাটির অর্থ হয় না যে তাঁর দেহত্যাগের পরে তাঁর আশ্রমে প্রকৃত অবতারের আবির্ভাব হবে।

অযোনিসম্ভব কথার কি অর্থ হবে জানি না। প্রত্যেক অবতারই মানবজননীর ভিতর দিয়ে হয়, যদিও দুই এক ক্ষেত্রে দাবী করা হয়েছে যে কুমারী মাতার দ্বারা হয়েছে (খৃষ্ট, বুদ্ধ)। অপূর্ব রকমের অঘটন ছাড়া ওর আর এক অর্থ হতে পারে––কেউ হয়তো বিভূতি রূপে জন্মগ্রহণ করেছিল, তার মধ্যে দেবতা এসে অভিব্যক্ত হলেন। কিন্তু তোমার গুরু কি বলেছেন তা স্পষ্টভাবে না জানলে কিছু বলা যায় না।

তোমার প্রশ্নের জবাবে এই সব কথা লিখলাম, কিন্তু তোমার বন্ধুদের

এত কথা না জানানোই ভালো। তাদের নিজেদের যা মতামত আছে তাকে বিচলিত করা ঠিক নয়।

২৫-৮-১৯৩৫

×

মায়ের সাহায্যের মাধ্যম স্বরূপ

মায়ের সাহায্য দেবার তুমি মাধ্যম হতে পারো, কিন্তু যদি মনে করো যে আমি অপরকে সাহায্য দিচ্ছি তাহলে কাজ হবে না, সেখানে প্রকৃত মাধ্যমের ক্রিয়া হবে না।

১৭-৪-১৯৩৫

×

প্রঃ ক আমাকে তার হিসাবের খাতায় দেখালো মোট অংক হলো ৭ টাকা ৭ আনা ৭ পাই। সেই দিনটা হলো সপ্তম মাসের ৭ই তারিখ। আপনাকে জানাতে গিয়ে দেখি যে বাড়িতে কাজ করছি তারও নম্বর ৭। সংখ্যার এমন আশ্চর্য মিল অন্যত্র দেখা যায় না। এই আশ্রমে এমন হয় ঠিক যেমন ভাবে চড়াই পাখিরা আশ্রম বাড়িতে এসে ভিড় করে। গভর্ণমেন্ট বিভাগগুলো গতানুগতিক, সেখানে এমন সংখ্যালীলা নেই।

উঃ তুমি যা বলেছ তা গুহ্যতত্ত্বের দিক থেকে ঠিকই কথা। মাও নিজে তাঁর খরচের খাতাতে এই ধরনের সংখ্যামিল পেয়ে থাকেন।

৭-৩-১৯৩৬

×

মা যে বিড়ালগুলির নাম রেখেছিলেন তার কারণ তারা ডাক বুঝে

সাড়া দিতে পারত; কোনো পাখির কখনো নাম দেননি, দিতে ইচ্ছাও করেননি। এখন আর তিনি বিড়ালদেরও কোনো নাম দেন না।

২৮-৪-১৯৩২

×

মায়ের দেহে ওষুধের ক্রিয়া হয় সম্পূর্ণ অন্যরকম, তোমাব কিংবা ক'এর কিংবা অন্যের দেহে যেমন ভালো কাজ হয় তেমন নয়, বরং বিপরীত হয়। মায়ের দেহচেতনা সাধারণ মানুষের মতো নয়—অবশ্য সাধারণদের মধ্যেও ওষুধের কাজ সকল ক্ষেত্রে একই রকম হয় না, যেমন তোমাদের "বিজ্ঞানে" বলে থাকে।

১-২-১৯৩৭

×

মা এ বিষয়ে যে কথা বলেন, ডাক্তার ক'ও তা স্বীকার করেছেন, অর্থাৎ রোগের লক্ষণ থেকে রোগনির্ণয় করা (সুস্পষ্ট সহজ রোগ ছাড়া) প্রায়ই আন্দাজের ব্যাপার হয়ে থাকে। সে আন্দাজ যদি ঠিক হলো তো সবই ঠিক হলো, আর ভুল হলো তো সব ব্যথ হলো, যদি না প্রকৃতি সেই ভুলকে ছাপিয়েও কাজ করে। কিন্তু যদি তোমার রোগনিণয়ের বোধিশক্তি জাগে তাহলে সকল সম্ভাবনার মধ্যে কোনটা ঠিক তা বেছে নিয়ে যথাকর্তব্য করতে পারো। সার্থক চিকিৎসকদের এই ক্ষমতা জন্মায়, তারা মুহূর্তে চিনে নিতে পারে। ক স্বীকার করেন যে একই রকমের লক্ষণ নানা রোগের হতে পারে, তার থেকে ঠিক রোগটিকে চিনে নেওয়া খুব সূক্ষ্ম ব্যাপার, বই পড়ে বা যুক্তি দিয়ে তা জানা যায় না। একটা অন্তর্দৃষ্টি থাকা চাই যা লক্ষণের ভিতর থেকে আসল জিনিসকে ধরে ফেলতে পারে। এই শেষ কথাটি আমার নিজের। আর বোধিশক্তি লাভ করা সম্বন্ধে পরে বলব—আজ আর নয়।

৬-৪-১৯৩৭

×

এ বিষয়ে তর্ক করে লাভ নেই। মায়ের মত গতানুগতিক ডাক্তারি মনের থেকে বিভিন্ন, কেবল যারা চলতি রীতি ছাড়িয়ে অভিজ্ঞতা থেকে জেনেছে তারাই মুক্তভাবে স্বীকার করে তাদের নিজেদের "বিজ্ঞানের" সংকীর্ণতা।

মত অবশ্য বিভিন্ন। মা এবং ক শুনে আতংকিত হলেন চার মাসের শিশুকে জোলাপ দেবার কথায়। ফ্রান্সের খ্যাত শিশু চিকিৎসক মাকে বলেছে যে ১২ মাস বয়সের আগে কোনো শিশুকে জোলাপ দিলে তার অনিষ্ট করা হবে, বিপদও হতে পারে। কিন্তু এখানে শুনি সব শিশুদেরই জোলাপ দেওয়া হয়, এমন কি জন্মদিনেরই পর থেকে প্রায়। হয়তো এইরকম ওষুধ খাওয়ানোতেই এদেশে শিশুমৃত্যু এত বেশি।

৪-৪-১৯৩৭

×

সকল "বিজ্ঞানেই" শিশুদের ক্যাস্টর অয়েল দেবার কথা বলে না--ওটা বোধ করি উনবিংশ শতাব্দির ধুয়ো চলে আসছে। মায়ের শিশু চিকিৎসক তা নিষেধ করেন--তাঁর নিজের বাল্যকালে ডাক্তার তা বারণ করেছিল, পেট খারাপ হবে বলে। ভিন্ন রুচিহি ডাক্তার।

৯-৪-১৯৩৭

×

প্র ঃ মা বলেছেন এমন কোনো রোগ নেই যা যোগের দ্বারা সারে না। ক্যানসারও কি সারে?

উ ঃ নিশ্চয় সারে। তবে বিশ্বাস বা উন্মীলন বা দুইই থাকা চাই। ভাগ্যে থাকলে এমন কি মনের জোরেও সারে। যে মেয়েটি সেরেছিল তাকে ক্যানসারের জন্য অপারেশন ক'রে ব্যর্থ হয়ে মিথ্যা ক'রে বললে সেরে গেছে। সেই বিশ্বাস মনে রেখে সে আরোগ্য হয়ে গেল, অনেক বছর

পরে একটা অন্যরূপ রোগে তার মৃত্যু হলো।

১১-১০-১৯৩৫

×

প্রঃ স্বপ্নে দেখলাম মা প্রকাণ্ড হাসপাতাল গড়ছেন। মিলেনিয়ম এলো নাকি?

উঃ মিলেনিয়ম হতো যদি হাসপাতালের আদৌ দরকারই না থাকতো, ডাক্তাররা তাদের ইন্‌জেকশনের যন্ত্র ফাউন্টেন পেনে পবিণত করতো-- অবশ্য যদি তার অপব্যবহার না করতো।

×

প্রঃ ইনজেকশনেব যন্ত্রেব উপব এত রাগ কেন? তাতে যে খুব উপকার হয়।

উঃ তাতে হাসপাতালের সংখ্যাও বাড়ে না, রোগের সংখ্যাও কমে না।

×

প্রঃ কিন্তু ইনজেকশনের যন্ত্র ফাউন্টেন পেন হতে যাবে কেন?

উঃ সাধু ইশাইয়া বলেছিলেন "তরোয়ালগুলো লাঙ্গলে পরিণত হবে"। ইনজেকশনের যন্ত্র তো এত বড়ো নয় যে তাকে লাঙ্গল করা চলবে, তাই বলেছি তাকে ফাউন্টেন পেন করার কথা।

১৯-৭-১৯৩৭

×

উপভোগের দ্বারা যৌন ক্ষুধা নিবৃত্ত করার ভুল ধারণা

এ ধারণা সম্বন্ধে যা সত্য তা মা তোমাকে বলেছেন। পরিপূর্ণ উপভোগের দ্বারা যে যৌনক্ষুধাকে নিবৃত্ত করা যায়, এ ধারণা প্রাণশক্তির একটি প্রবঞ্চনা বা ছল। এই করে সে মনের কাছ থেকে নিজের আকাঙ্ক্ষা পূরণের অনুমতি আদায় করে। এর ভিতরে আর কোনও সত্য বা যুক্তি বা আর কোনও ভিত্তি নেই। সাময়িকভাবে যৌন উপভোগ যদি এর আগুনকে ধিকি ধিকি করে জ্বালিয়ে রাখে, পূর্ণ উপভোগ তো তোমাকে একেবারে পাঁকে ডুবিয়ে দেবে। অন্যান্য ক্ষুধার মত যৌন ক্ষুধাও সাময়িক উপভোগের দ্বারা নিবৃত্ত হয় না। কিছুদিন প্রশমিত থাকার পর এ আবার জেগে উঠে ও উপভোগ করতে চায়। সাময়িক উপভোগ বা পরিপূর্ণ উপভোগের দ্বারা এর চিকিৎসা করা যায় না। এ যেতে পারে একমাত্র যদি চৈত্যসত্তা একে সমূল প্রত্যাহার করে, বা সম্পূর্ণ আধ্যাত্মিক উন্মীলন যদি হয়, আর তার সঙ্গে নামে আরও নিবিড়ভাবে একটি চেতনা যা একে চায় না ও সত্যিকারের আনন্দ যার স্বরূপ।

২৩-৪-১৯৩৭

পরলোকগত আত্মাকে সাহায্য দান

প্র ঃ আমার ভাইয়ের আত্মা যে শেষের দিকে আপনার ও মায়ের আলোর দিকে আসতে চেয়েছিল, এ সম্বন্ধে কি আপনি কোনও চিহ্ন পেয়েছিলেন?

উ ঃ পার্থিব দেহে চেনেননি এ রকম এতো আত্মা মায়ের কাছে রাত্রে আসে পরপারে যাবার পথের জন্য যে মায়ের পক্ষে তোমার ভাইয়ের বিষয়ে সঠিক বলা সম্ভব নয়। তোমার ভাই তাদের মধ্যে থাকতে পারে, তবে 'ক' যা বিবরণী দিয়েছে তা থেকে নিঃসন্দেহে বলা যায় যে সে তাদের মধ্যে ছিল।

১২

মায়ের "প্রার্থনা" ও "কথাবার্তা" সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাখ্যা

মায়ের "প্রার্থনা" ও "কথাবার্তা" সম্বন্ধে কতকগুলি ব্যাখ্যা

> প্রঃ মায়ের "প্রার্থনা" পুস্তকে ১৯১৪ সালে লেখার মধ্যে সুস্পষ্ট রয়েছে রূপান্তরের ও অভিব্যক্তির কথা। তিনি তখনও এখানে আসেননি, তাহলে কি তিনি তা আগের থেকে জানতেন?

উঃ বাল্যকাল থেকে, এমন কি শিশুকাল থেকেই মায়ের আধ্যাত্মিক চেতনা ছিল, ভারতে আসার অনেক আগের থেকেই তিনি এসব জ্ঞান লাভ করেছিলেন।

২৩-১২-১৯৩৩

×

> প্রঃ মা একটি প্রার্থনাতে বলেছেন, "কাজের মধ্যে আনন্দ, তার চেয়ে আরো বেশি আনন্দ কাজের নিবৃত্তিতে"। তাহলে কি কাজের চেয়ে নিবৃত্তিই কাম্য?

উঃ তুমি কি ভাবো যে মায়ের মন তোমাদের মনের ধারণার মতো সকল অবস্থার ও সকল সময়ের জন্য একটা বাঁধাধরা অকাট্য নিয়মের কথা ওতে বলেছেন? তিনি চেতনার একটা অবস্থার কথা বলেছেন যখন কাজের থেকে নিবৃত্তি এসেছে। তার পরেও আসে কাজের মধ্যেও সচ্চিদানন্দের অবস্থা। তারও পরে আসে যখন দুই অবস্থাই সমান, সেটা হলো অতিমানসের। নিষ্ক্রিয় ব্রহ্ম ও সক্রিয় ব্রহ্ম দুইই তখন একত্র হয় এবং মিলে যায় (তৃতীয় অবস্থা)। আগে প্রথম অবস্থায় যাও তখন তা বলবে, এখন কেন?

×

প্রঃ কাজের মধ্যেও কি সচ্চিদানন্দের চরম উপলব্ধি আসবে?

উঃ নিশ্চয় তা হতে পারে। নতুবা পূর্ণ যোগ টেঁকে কেমন ক'রে?

×

প্রঃ মা বলেছেন যে অনুভূতিও আসে ভগবানের ইচ্ছাতে। তাহলে কি অনুভূতির অভাব অথবা তার প্রাচুর্য সবই ভগবানের ইচ্ছাতে?

উঃ ভগবানের কাছ থেকে আসছে এটা উপলব্ধি না হলে ওর কোনো অর্থ নেই। মা যেমন দুর্দান্ত রকমের কষ্ট যন্ত্রণা ও দুঃখকেও ভগবানের দেওয়া বলে মেনে নিয়েছিলেন তাঁকে প্রস্তুত ক'রে তোলার জন্য কাজের প্রয়োজনে, তেমনি যদি মেনে নিতে পারো তাহলে তার আধ্যাত্মিক সাফল্য আছে। অন্যের বেলাতে তা ভুল হবে।

১০-৫-১৯৩৪

×

প্রঃ আপনি বলেছেন, গত মহাযুদ্ধের পরে মানবজগতে প্রাণ জগৎ নেমে এসেছে। কিন্তু প্রাণের জগৎ তো বস্তুর মধ্যে অনেক আগেই নেমেছে——মানুষ জন্মাবারও আগে। আবার কোন প্রাণ জগতের নেমে আসা বাকি ছিল? আর এখনই বা তা নেমে আসা সাব্যস্ত করলে কেন—— তা কি মানব জগতে উচ্চ আলোক আসা নিবারণ করবার জন্য?

উঃ আলো নেমে আসতে প্রস্তুত হওয়ার ফলে যখন প্রাণ জগতের উপর চাপ পড়ে, তখন সেই জগতের কতক অংশ মানুষের জগতে ঝুলে পড়ে। প্রাণের জগৎ অনেক বড়ো, মানুষের জগতের চেয়ে অনেক বেশি।

কিন্তু সাধারণত সে জগৎ তার প্রভাবের দ্বারাই কাজ করে। অবশ্য সে জগতের এ অংশের এই প্রচেষ্টা যাতে মানুষকে সে জগৎ বরাবরই তার তাঁবেতে ধরে রাখতে পারে, কোনো আলো আসতে না দিয়ে।

৯-৬-১৯৩৬

x

প্রঃ আপনি যেমন বলেছেন, প্রাণ জগতের অবতরণে যদি এখানকার অবস্থা খারাপ হয়ে গিয়ে থাকে, তাহলে পার্থিব চেতনাতে অতিমানসের আসা অসম্ভব হয়ে উঠবে, কিংবা "এখনই আসার" সময়ের বদলে সে সময় আরো অনেক পিছিয়ে যাবে। আর এখন যখন বড়ো বড়ো জাতিরা চূড়ান্ত রকমের শক্তিলাভ ক'রে সমৃদ্ধ হয়ে উঠেছে, তখন এখানে শান্তি স্থাপনের আশা তো সুদূর-পরাহত।

উঃ প্রাণ জগতের অবতরণ অতিমানসকে থামাতে পারে না—আর শক্তিসমৃদ্ধ জাতিরাও তাদের শক্তিতে তা বন্ধ করতে পারে না, কারণ অতি-মানসের অবতরণ একটা আধ্যাত্মিক সত্য, বাহ্য সব কিছু বাধাসত্ত্বেও তা ঘটবে। আগেকার প্রাণরাজ্যের অবতরণ তখনকার উচ্চ আলোকে বিকৃত ক'রে দিয়েছিল, যেমন কৃশ্চান ধর্মের ইতিহাসে দেখা যায় যে তার শিক্ষা-গুলিকে বিকৃত ক'রে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছিল। কিন্তু অতিমানস হলো এমন এক আলো যে তার আপন অধিকার নিয়ে উপস্থিত হলে তাকে কোনোমতে বিকৃত করা যায় না। কেবল যখন সে পিছিয়ে থেকে নিম্নতর শক্তিদের কাজ করতে দেয় এবং সত্যকে স্তিমিতজ্যোতি ও বিকৃত ক'রে অভিব্যক্ত করতে থাকে তখনই প্রাণশক্তিরা জ্ঞানকে আয়ত্তের মধ্যে রেখে আপন কাজে লাগায়।

১২-৬-১৯৩৬

x

প্রঃ মা লিখেছেন বিশ্বজগতে (Univers) আভ্যন্তরীণ উন্নতির কথা। কিন্তু কয়েকটি ব্যক্তিতে ছাড়া মানুষের জগতে কোনোই উন্নতির লক্ষণ দেখা যায় না। বাহ্যাভ্যন্তর সকল দিক থেকে জগৎ একই বৃত্তের মধ্যে ঘুরছে, অগ্রসর কিছু হচ্ছে না।

উঃ ফরাসীতে Univers মানে বিশ্ব নয়—পৃথিবী। পার্থিব চেতনার অগ্রগতি নিশ্চয়ই হচ্ছে, তা ছাড়া বিবর্তন ঘটতেই পারে না। মানুষের বিবর্তন চক্রাকারে বা ঘুরে ঘুরে এগোতে পারে, কিন্তু উত্তরোত্তর আরো সম্ভাবনার দরজা নিশ্চয় খুলে যাচ্ছে, যাতে আরো উন্নত সম্প্রদায়ের বিবর্তন ঘটা সম্ভব হয়।

১-৯-১৯৩৬

"কথাবার্তা" থেকে

প্রঃ মা বলেছেন, "আসল প্রয়োজন হলো ভগবানের উপর একাগ্রতা এনে তাঁর ইচ্ছা এবং উদ্দেশ্যের কাছে সম্পূর্ণ নিবেদিত হওয়া"। ইচ্ছা ও উদ্দেশ্যে তফাৎ কি?

উঃ দুইএর এক অর্থ নয়। উদ্দেশ্য হলো মতলব, অর্থাৎ ভগবান যে মতলবে কাজ করছেন। আর ইচ্ছা হলো তার চেয়ে ব্যাপক অর্থে।

১-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "হৃদয়ে একাগ্রতার" অর্থ কি? একাগ্রতা কি আর ধ্যান কি?

উঃ একাগ্রতা মানে চেতনাকে এক স্থানে কেন্দ্রীভূত ক'রে এনে কোনো লক্ষ্যবস্তুতে বা ভাবেতে নিবিষ্ট হওয়া। ধ্যান এক সাধারণ কথা, আভ্যন্ত-

রীণ ক্রিয়ার জন্য অনেকরূপ ভাবেই প্রযুক্ত হতে পারে।

১-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "পূর্ব পূর্ব জন্মে আমাদের সকলের সাক্ষাৎ হয়েছিল",—মা বলেছেন। "আমরা" কে? আপনি আর মাকে কি আমি গতজন্মে এমনি সেবা করেছিলাম?

উঃ যারা আমাদের কাজ করছে তাদের কাছে সাধারণভাবে কথাটা বলা হয়েছিল অতীতের দিকে চেয়ে। বর্তমানে আমরা স্থূলচেতনার উপর চরম ক্রিয়া নিয়ে ব্যস্ত আছি। আমরা দেখছি যে সাধনার কঠোর কাজ ছেড়ে সাধকরা ঐ কথার উপরেই গুরুত্ব দিচ্ছে। তাই আমরা এখন অতীত সম্বন্ধে আলোচনা বন্ধ ক'রে দিয়েছি।

২-১-১৯৩৭

×

প্রঃ মা বলেছেন, "যোগের দুই পথ আছে, এক হলো তপস্যার, আর এক সমর্পণের"। আপনি বলেছিলেন আমার ভিতরকার তপস্যার অগ্নি থেকে সত্যের সূর্য উদয় হবে। তাহলে আমি কোন পথে চলেছি? সমর্পণে তপস্যার কি অংশ? বিনা তপস্যায় কি সমর্পণ হয়?

উঃ সমর্পণের ক্ষেত্রে একরূপ তপস্যা আপনা হতেই হয়, তা ছাড়া আর এক প্রকার নিজের প্রচেষ্টার তপস্যা আছে বিনা কোনো সহায়তাতে —সেটাই হলো অন্যরূপ পথ। কিন্তু তপস্যার অগ্নি দুই পথেই থাকে।

৪-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "অধ্যাত্ম অনুভূতি মানে নিজের মধ্যে ভগবানের সংস্পর্শ (বাইরে হলেও একই কথা)"। এই বাইরে সংস্পর্শের অর্থ কি? তা কি বিশ্বগত ভগবান বা পরাৎপরের সঙ্গে, অথবা দুইই?

উঃ তার মানে বাইরের বস্তুতে, ব্যক্তিতে, ঘটনা প্রভৃতিতে ভগবৎ সংস্পর্শ।

৯-১-১৯৩৭

×

প্রঃ স্বপ্ন কখনো মনে থাকে, কখনো মনে থাকে না। এর কারণ কি?

উঃ জাগার সময় চেতনার অবস্থার উপর তা নির্ভর করে। চেতনা হঠাৎ বদ্‌লে যায় বলে স্বপ্নাবস্থার কথা একেবারে মুছে যায়, দেহকোষের উপর সে সকল ঘটনার কোনো চিহ্নই থাকে না। ঘুমটা যদি হঠাৎ না ভাঙে কিংবা স্বপ্নের ছবিটা খুব জোরালো হয়, তাহলে শেষের স্বপ্নটা অন্তত মনে থাকে। তার স্মৃতি অনেককাল পযন্ত থাকতে পারে, কিন্তু সাধারণত ঘুম ভাঙলেই স্বপ্নস্মৃতি চলে যায়। যারা স্বপ্নকে স্মরণ করতে চায় তারা চুপচাপ শুয়ে থেকে পশ্চাৎস্মৃতি ফিরে পেতে চেষ্টা করলে একে একে সব মনে পড়ে যায়। গভীর ঘুমের স্বপ্নের চেয়ে হাল্কা ঘুমের স্বপ্ন বেশি-রকম মনে থাকে।

৯-১-১৯৩৭

×

প্রঃ মা বলেছেন, "ভগবৎ রাজ্য পেতে চাইলে আমাদের যা কিছু আছে, যা কিছু করি বা যা কিছু হই সমস্তই ভগবানকে সমর্পণ করতে হবে।" সম্পূর্ণ সমর্পণ করতে যদি পারি তাহলে কি আর কিছু করা দরকার?

উঃ না, কিন্তু সম্পূর্ণরূপে দিতে পারা সহজ কথা নয়।

১৪-১-১৯৩৭

×

প্রঃ কেউ যে তার সব কিছু ও সব কাজ ভগবানকে দিয়েছে তা কেমন ক'রে জানবো?

উঃ তা তুমি জানতে পারো না, আভ্যন্তর দৃষ্টি না থাকলে।

১৪-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "অবশ্য যা ঘটবার ছিল তাই ঘটেছে, অভিপ্রেত না হলে তা কখনো ঘটতো না"। তাহলে মানুষের জীবনে অনুতাপের কি অর্থ থাকে? সাধকের জীবনে কি তার কোনো স্থান নেই?

উঃ অনুতাপের ফল হয় ভবিষ্যতের পক্ষে—যে ঘটনা ঘটে গেছে তার দিক থেকে যদি প্রকৃতি তাতে অন্য দিকে মোড় নেয়। সাধকের পক্ষে অবশ্য কেবল অনুতাপই নয়, তার ভুল কাজ স্বীকার ক'রে নিয়ে তার পুনরাবৃত্তি হওয়া বন্ধ করা চাই।

১৯-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "অনেক আশ্চর্যরূপে তোমাকে জানিয়ে দেবে যে জগৎসৃষ্টি কেমন ক'রে হয়েছিল, এর ভবিষ্যৎ কি হবে, অতীতকালে তুমি কোথায় কেমন ভাবে জন্মেছিলে, কেমন জীবন যাপন করেছিলে, এর পরে কেমন ভাবে জন্মাবে ও কেমন জীবন যাপন করবে। কিন্তু এ সবের সঙ্গে আধ্যা-

ত্মিক জীবনের কোনো সম্পর্ক নেই।” কিন্তু তারা যা কিছু বলে তা কি একেবারেই ধাপ্পা? আধ্যাত্মিক ছাড়া আর কি উপায়ে এসব কথা জানা যায়?

উঃ প্রায়ই তা ধাপ্পা, কিন্তু যদি ঠিকও হয় তার সঙ্গে আধ্যাত্মিকের সম্পর্ক নেই। অনেক মিডিয়ম, অলৌকিক দ্রষ্টা, বিশেষ গুণী লোক থাকে যারা এসব কথা বলতে পারে। তা কোনো আধ্যাত্মিক গুণ নয়, যেমন পুল গড়া বা রান্না করা বা অংক কষতে পারাও নয়। মানুষের বুদ্ধিশক্তি যেমন থাকে তেমনি গুহ্যশক্তিও থাকে।

২০-১-১৯৩৭

×

প্রঃ “ডাইনীরা মানুষ নয়, মানুষের আকার নেয়। তারা প্রথমে কোনো এক মানুষের উপর প্রভাব বিস্তার করে, তার পর তার মধ্যে ঢুকে তাকে এমন আয়ত্ত ক'রে ফেলে যে তার মানবাত্মা ও মনুষ্যত্ব চলে যায়।”

ক একটি মেয়েকে বিবাহ করেছে, যার সম্বন্ধে মা বলেছেন কতকটা ডাইনীর মতো। তার কি কোনো বিপদের ভয় আছে? তাকে কি আমি সাবধান থাকতে বলে দেবো?

উঃ প্রথমত এ কথা ঠিক নয় যে মানুষের দেহে থেকে কোনো ডাইনী অন্য কোনো মানুষকে আয়ত্ত করতে পারে। ওটা বলা হয়েছে দেহমুক্ত একরূপ প্রাণসত্তার কথা যারা কোনো জন্ম না নিয়ে অন্য মানুষকে অধিকার করে, কারণ সেটাই তাদের কাম্য, কোথাও জন্ম নেওয়া নয় কিন্তু কাউকে অধিকার ক'রে থাকা। এই ভাবে মানুষের মধ্যে থেকে অপর যারা তার সংস্পর্শে আসে তাদের প্রাণের হানি করে—এই ব্যাপার।

দ্বিতীয়ত, মা যে বলেছেন মেয়েটি কতকটা ডাইনীর মতো, তার মানে সে বস্তুত ডাইনী নয়, তবে অন্যের পক্ষে অনিষ্টকারী হতে পারে। যাই হোক, এ সম্বন্ধে ক-কে কিছু বলে দরকার নেই, তাতে সে বিভ্রান্ত হতে

পারে, উপকার কিছু নেই।

২৭-১-১৯৩৭

×

প্রঃ মা তাঁর "কথাবার্তা"তে বলেছেন, "যোগের প্রথম ফল এই হয় যে মানসিক সংযম চলে যায়, তার ফলে যেসব কামনা ভাবনা সংযত হয়ে ছিল সেগুলো হঠাৎ প্রবল হয়ে উঠে বাধার সৃষ্টি করে।"

উঃ আগে যে সেগুলি এমন প্রবল ছিল না তার কারণ প্রাণসত্তার তাতে প্রশ্রয় দেওয়া হতো। সে প্রশ্রয় বন্ধ হওয়াতে ঐরূপ প্রকট হয়ে ওঠে। কিন্তু যোগের দ্বারা সেগুলো জন্মায় না, তা আগের থেকেই ছিল। মন তাদের সংযত ক'রে রাখতো কিন্তু তাড়ায়নি। যোগের বেলাতে মানসিক সংযমের স্থলে চৈত্য ও আধ্যাত্মিক আত্মসংযম আনতে হবে, তবে অনেক সাধক ঠিক সময়ে তা না পারাতে ঐরূপ অবস্থা হয়।

১২-৫-১৯৩৩

×

প্রঃ চিন্তাশক্তি সম্বন্ধে মা দৃষ্টান্ত দিয়ে বলেছেন— "যদি তুমি চাও যে কোনো একজন ব্যক্তি তোমার কাছে আসুক, এবং সেই মনের ইচ্ছার সঙ্গে তোমার যদি প্রাণ-শক্তির তাই প্রবল কামনা জাগে, এবং তোমার যদি সু-নির্দিষ্ট ইচ্ছাশক্তির জোর থাকে, তাহলে তোমার সে কামনা সফল হবে।" কিন্তু যদি সেখানে প্রাণশক্তির প্রবল কামনা না থাকে, কেবল মনের ইচ্ছা ও কল্পনা থাকে, তাহলে কি সে ইচ্ছা সফল হবে?

উঃ তা হতে পারে; বিশেষত সেই অভিপ্রেত ব্যক্তির তরফ থেকেও যদি আসবার ইচ্ছা থাকে, তাহলে আহ্বানকারীর ইচ্ছা জোর পাবে।

কিন্তু অধিকাংশ ক্ষেত্রে চিন্তাশক্তির পিছনে ইচ্ছাশক্তির ও কামনার জোর থাকা দরকার।

২৬-৮-১৯৩৬

×

প্র ঃ "কথাবাতা"তে মা বলেছেন যে কাউকে নিরুৎসাহ করলে বা দমিয়ে দিলে স্নায়বিক আবরণে ছিদ্র জন্মায়, তাতে বিরোধী শক্তিরা আক্রমণের সুবিধা পায়। তার মানে এই হয়, যে মঙ্গলাকাঙ্খী সে কারো ভুল ক্রিয়া বা ভুল ধারণা দেখেও তাকে দমিয়ে দেবার মতো কিছু বলবে না। কিন্তু সাধনাতে এবং সাধারণ জীবনেও কি তা নীতিবিরুদ্ধ হয় না? যদি সে অবস্থায় চুপ করেও থাকা যায় তাতেও অনেকে আহত বোধ করে। ভুল দেখে নিরুৎসাহ করলে সাধারণ জীবনেও কি ক্ষতি হয়?

উ ঃ ও কথা বলা হয়েছে সাধককে শিক্ষা দেবার জন্য, যাতে ওরূপ কাজকে সে এড়িয়ে যায়। তার নিজেরই আত্মনিপীড়ন ও নিরুৎসাহ হবার অভ্যাস আছে বলে সে প্রত্যাশা করতে পারে না যে অপরে তার ভুল কাজকেও উৎসাহ দিক। নিরুৎসাহ না হওয়া তার নিজেরই দরকার, সেটা অন্য কেউ ক'রে দেবে না। কেউ কেউ আছে যারা এমন যে মা তাদের কামনা পূরণ না করলেই তারা দমে যায়, তাই বলে মা তাদের খুশি করতে তা করতে পারেন না,—তাদের মনের এ অভ্যাস তাদের নিজেকেই ছাড়তে হবে। যারা উৎসাহ চায় তাদের পক্ষেও এই কথা। চুপ ক'রে থাকলেও নিরুৎসাহ হওয়া তাদের নিজেরই দোষ।

সাধারণ জীবনেও এই কথা, দমিয়ে দেওয়া ক্ষতিকর হয়। সাধনার জীবনে আরো ক্ষতিকর, কারণ তাতে লক্ষ্যের দিকে নির্বিরোধ অগ্রগতি ব্যাহত হয়।

১৮-৭-১৯৩৬

×

প্রঃ মা বলেছেন—"নির্বাণ পেয়ে যারা সরে পড়তে চায় তারাও অপরপ্রান্তে গিয়ে দেখে যে পালিয়ে গিয়ে বিশেষ কিছু লাভ হয়নি।" তার মানে কি তারা নীরব রাজ্যে চলে গিয়ে দেখে, না এ জগতে ফিরে এসে দেখে?

উঃ না, ওর মানে মৃত্যুর সময় দেখে। অর্থাৎ তারা নির্বাণে পৌঁছে দেখে যে ভগবানের বৃহত্তম উপলব্ধি তাদের হয়নি, তাই আবার তাদের এখানে ফিরে আসতে হবে এবং জগতের কাজে অংশ নিতে হবে, তবেই বৃহত্তম উপলব্ধি পাবে।

২-৫-১৯৩৫

×

প্রঃ মা বলেছেন "বস্তুত সারা পৃথিবীতে মৃত্যু জীবনের সঙ্গে জড়িয়ে আছে। তাইতে মনে হয় তিনি বলছেন যে মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী। কিন্তু তার আগের লাইনে তিনি বলছেন—"চেতন মন থেকে মৃত্যু ধারণা যদি একেবারে লুপ্ত করা যায় তাহলে মৃত্যু আর অবশ্যম্ভাবী থাকে না"। তার মানে এখানে "যদি" দিয়ে বলা হচ্ছে যে মৃত্যুকে এড়ানো যেতে পারে। কিন্তু "বস্তুত" বলে অমরত্ব সম্বন্ধে ধারণা পাতলা হয়ে গেছে। আর "যদি" কথাটাও কম নয়।

উঃ ওর মধ্যে কোনো গণ্ডগোল নেই। "বস্তুত" এবং "জড়িয়ে আছে" বললে অবশ্যম্ভাবিতা বোঝায় না, বর্তমানে পৃথিবীতে জীবনের শেষে মৃত্যু জড়িত আছে এই বোঝায়। কিন্তু ওতে এমন বোঝায় না যে তা ছাড়া অন্যরকম কিছু হতেই পারে না, কিংবা বোঝায় না যে মৃত্যুই সকল অস্তিত্বের অপরিবর্তনীয় বিধান। কতকগুলি কারণে বস্তুত এখন তাই ঘটে থাকে—মানসিক ও দৈহিক কতকগুলি অবস্থাগতিকে—কিন্তু সে অবস্থাগুলি যদি বদ্‌লে দেওয়া যায় তাহলে মৃত্যু আর এমন অবশ্যম্ভাবী থাকবে না। অবশ্য তেমন পবিবর্তন আসবে "যদি" কতকগুলি বিশিষ্ট

শর্তের পূরণ করা হয়, এই "যদি"র উপরে বিবর্তন ক্রিয়ার পরিবর্তন হওয়া নির্ভর করে। পশুজীবনের মনকে বাক্যশক্তিতে ও বুদ্ধিবৃত্তিতে উত্তীর্ণ ক'রে দিয়ে মনওয়ালা মানুষ জন্মাতে কখনই পারতো না, যদি না এই "যদি"র শর্তগুলির পূরণ হতো, কিন্তু সেই বিশিষ্ট ও বিরাট "যদি"র তখন পূরণ ঘটেছিল। তেমনি সকল নবোন্নতির পক্ষেই এই "যদি"র পূরণ হওয়া চাই।

৩১-৭-১৯৩৬

> প্রঃ মা তাঁর ১৬ই জুন ১৯১৪ সালের প্রার্থনায় যা বলেছেন, "তোমার জ্যোতি চায় ছড়িয়ে পড়তে, তার চেয়ে বড় আর কিছু নেই। বিশ্বচেতনার গতির দিক থেকে দেখলে মনে হয় যে নিজেকে নিখুঁত করা বা যন্ত্রস্বরূপে হওয়া কতটা নিরর্থক।

উঃ এটা ঠিকই। নিজেকে নিখুঁত করা বড় আদর্শ নয়। সাধনার বা যন্ত্রস্বরূপে হওয়ার সার্থকতা জ্যোতিসমুদ্রে ভেসে যাবার উপায় হিসাবে।

৩০-৪-১৯৩৬

×

> প্রঃ ১৯১৪ সালের ১২ই ডিসেম্বরের প্রাথনা আরম্ভ হয়েছে এই ভাবে "প্রতিমুহূর্তে জানা চাই কি রকমে সব হারিয়ে সব লাভ হয়..."
>
> ঈশোপনিষদও বলেছে "তেন ত্যক্তেন ভুঞ্জীথা"। দুটোই কি একই সত্য প্রকাশ করছে না?

উঃ নিশ্চয়ই। মূলতঃ একই সত্য, বিভিন্ন ধারায় বলা হয়েছে। নেতিবাচক হিসাবে এরকমভাবে বলা যেতে পারে "অবিদ্যায় ত্রুটিপূর্ণ জিনিস যদি আমরা আঁকড়ে ধরে থাকি, তাহলে দিব্য আলোয়, ছন্দে ও আনন্দে

তাদের আমরা নিখুঁতভাবে পাব না"।

১৬-৮-১৯৩৫

×

প্রঃ ১৯১৪ সালের ১৭ই মে'র প্রার্থনায় মা বলেছেন "এক অনিবার্য্য প্রয়োজনের বশে যেন এই দুটি কথা কাল আমি লিখেছি। প্রথমটি এই জন্যে, যেন কাগজ-টির উপর লেখা না হলে প্রার্থনাটির পূর্ণশক্তি লাভ হবে না।"

প্রার্থনা যদি লেখায় বা ভাষায় প্রকাশ না করা হয়, তাহলে তা বিশেষ শক্তিশালী হয় না, বা পুরোপুরিভাবে শক্তিশালী করতে হলে প্রকাশ করা প্রয়োজন, একথা কি ঠিক?

উঃ সাধারণ নিয়ম হিসাবে এটা বলা হয়নি। সেই বিশেষ প্রার্থনা ও অনুভূতি সম্বন্ধেই ওটা বলার প্রয়োজন হয়েছিল। সবটা নির্ভর করছে বিশেষ লোকের পারিপার্শ্বিক অবস্থার সময়ের বা চেতনার বিশেষ স্তরের উপর। আধ্যাত্মিক ক্ষেত্রে এই সব জিনিস সবসময়ই পরিবর্তনশীল। কোনও অবস্থায়, ক্ষেত্রে বা মুহূর্তে প্রার্থনার ফল আনবার বা অনুভূতিকে স্থায়ী করবার জন্য বহিঃপ্রকাশ দরকার, অন্য কোনও অবস্থায়, ক্ষেত্রে বা মুহূর্তে এর বিপরীতটাই দরকার---তখন বহিঃপ্রকাশ শক্তিকে দুর্ব্বল বা অনুভূতির স্থায়িত্বকে ক্ষুণ্ণ করতে পারে।

২১-৬-১৯৩৬

×

প্রঃ ১৯১৪ সালের ৪ঠা আগষ্টের প্রার্থনায় মা বলেছেন "শক্তিরাজির সংঘর্ষ মানুষকে জোর করে চালিয়ে নিয়েছে ---তারা অপরূপ আত্ম-বলিদান করে চলেছে..." মনে

হয় তিনি গত বিশ্বযুদ্ধ সম্বন্ধেই এটা বলেছেন। কিন্তু সেই যুদ্ধের ফলে কি কোনও পবিত্র আলো মানুষের অন্তরকে পূর্ণ করেছে, বা দিব্য শক্তি কি পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়েছে, বা মঙ্গলময় কিছু কি ঐ বিপর্যয় থেকে প্রসূত হয়েছে, যেমন তিনি বলেছেন? যখন দেখা যাচ্ছে যে বিভিন্ন দেশ আবার যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হচ্ছে, আর পরস্পরের সঙ্গে বিবাদ করছে, তখন বোঝা যায় যে মানুষের অন্তরের কোনও পরিবর্তন হয়নি। সারা পৃথিবীর লোকেরা, এমন কি ভারতবর্ষের পর্যন্ত, যুদ্ধ চাইছে বলে মনে হয়, কেউই শান্তি, আলো বা ভালবাসা চাইছে না।

উঃ পরিবর্তন যা হয়েছে তা খারাপের দিকেই গেছে—প্রাণের জগৎ জড় জগতে নেমে এসেছে। অপরদিকে বলা যেতে পারে যে অসুরগ্রস্ত দেশগুলি ছাড়া অন্য সব দেশ শান্তিরক্ষার জন্য আরও বেশী ব্যগ্র এবং একটা ধারণা গড়ে উঠছে যে যুদ্ধবিগ্রহ আর যেন না ঘটে। ভারতবর্ষ যুদ্ধের সত্যিকার পরশ পায়নি। যাই হোক আধ্যাত্মিক সত্যের দিকে উন্মীলনের কথাই মা ভাবছিলেন। অন্ততঃ সেটা আসবার চেষ্টা করছে। পুরানো জড় সভ্যতার সম্বন্ধে বিশেষ অসন্তোষ দেখা যাচ্ছে, গভীরতর আলো বা সত্যের দিকে অনুসন্ধিৎসা বাড়ছে। কিন্তু দুভাগ্যবশতঃ প্রাচীন ধমগুলি এদের গ্রাস করছে, আর অতি অল্পসংখ্যক লোকই সচেতনভাবে নতুন আলোর সন্ধান করছে।

৯-৬-১৯৩৬

×

প্রঃ ১৯১৪ সালের ১৬ই আগষ্টের প্রার্থনায় মা বলেছেন, "যে কয়টি মহাশক্তিধর অসুর রয়েছে, তাদের প্রত্যেকে দৃঢ় সঙ্কল্প করে তোমার সেবক হবার জন্যে..." অসুররাও যে মায়ের সেবক হতে দৃঢ়সঙ্কল্প হ'ল এটা কি করে হ'ল? এটা কি ভগবানকে দিয়ে নিজের কার্যসিদ্ধির জন্য বা রাজনীতির চালবাজি?

উঃ যেসব অসুর মানুষের দেহে জন্ম নিয়েছে, ভগবানের সেবা ও তাঁর কাজ করে নিজেদের মুক্ত করতে, তাদের সম্বন্ধেই এটা বলা হয়েছে। এটা ঠিক সফল হয়নি। অসুররা সাধারণতঃ মানুষী জন্ম প্রত্যাগ্রহ করে, কেননা জন্মগ্রহণ না করে মানুষকে দখল করতেই তারা বেশী ইচ্ছুক।

১৫-৬-১৯৩৬

×

প্রঃ "Eveillez-vous" নামক পুস্তকে (ইংরেজী থেকে অনূদিত) আমাদের মতন কিছু কিছু চিন্তাধারা আছে যেমন "আবির্ভাব" "শত্রুভাবাপন্ন সত্তা" প্রভৃতি। ঐ বইয়ে একটা কথা আছে "শান্তি রাজত্ব করবে পৃথিবীর উপর"। এটা মায়ের Prayers বইয়েও আছে। লেখক কি মায়ের Prayers বইটি (অপ্রকাশিত) থেকে এটা তুলে নেননি?

উঃ নাও হতে পারে। ইংরেজরা খুব বাইবেল-ভক্ত, আর যে কেউ বাইবেল পড়েছে, তার মনে এই কথাটা অনায়াসে আসতে পারে। শত্রু-ভাবাপন্ন সত্তা জিনিসটাও মোটেই নতুন নয়, বেদের মত পুরানো। "আবির্ভাব"-এর আশাও সর্বত্র ছড়িয়ে রয়েছে পুরানো দৈববাণী অনুসারে যখন সময় আসবে, তখন আবির্ভাব ঘটবে।

১৬-৯-১৯৩৫

×

প্রঃ "একটি অগ্নিশিখা সেখানে জ্বলছে...তোমার ভিতরে ঐ হচ্ছে ভাগবতী সত্তা, তোমার প্রকৃত সত্তা"। এর কথা শোনো, আদেশ পালন করো"

এই অগ্নিশিখাকে আমি দেখিনি। তা সত্ত্বেও বেশ বুঝতে পারি যে আমার মধ্যে ভগবান আছেন। তাঁর কথা শুনতে পাই, আর যতদূর সম্ভব, তাঁর আদেশ পালন

করবার চেষ্টা করি। এই ধারণা কি ভুল?

উঃ না, তুমি যা অনুভব করছ, সম্ভবতঃ তা চৈত্যসত্তার অবদান, মনের ভিতর দিয়ে। সরাসরিভাবে চৈত্যের ঐ অগ্নিশিখাকে জানতে হলে, সূক্ষ্ম দৃষ্টি বা অনুভব শক্তিকে সক্রিয় হতে হবে, বা চেতনায় চৈত্যসত্তা শক্তিশালী হয়ে কাজ করতে থাকবে।

২-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "যৌন উপভোগের মত ঐ ধরনের অন্য সব বেগও শক্তি পায়, যেহেতু লোকে ও সবের উপর বড় বেশী নজর দেয়"।

অন্য বেগ কোনগুলি?

উঃ প্রাণসত্তার।

৪-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "সারা বিশ্ব এই বিষে জর্জরিত হয়ে আছে। প্রতি নিশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে এটা তুমি গ্রহণ করছ।"

কতদিন পর্যন্ত সাধককে এই বিষকে ভয় করে চলতে হবে? আমার মনে হচ্ছে এখন আর আমার ভয় না করলেও চলবে। এ ধারণাকে বিশ্বাস করা যায় কি?

উঃ বিশ্বাসযোগ্য কিনা জানি না। যোগের পথে অনেক অগ্রসর হওয়ার পর এ সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়।

৪-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "প্রয়োজনীয় ভিত্তি যাদের মধ্যে আছে, তাদের আমরা বলি--আহ্বান করো, নামিয়ে আনো"।

আহ্বান করা ও নামিয়ে আনার ক্ষমতা মানে কি যোগের পথে অনেকটা অগ্রসর হওয়া?

উঃ না। এটা প্রথম দিকের পদক্ষেপ।

৫-১-১৯৩৭

×

প্রঃ অধিমানসের দুই সত্তার সংস্পর্শে এসে জোয়ান অব আর্কের প্রকৃতি কি রূপান্তরিত হয়েছিল?

উঃ রূপান্তরের প্রশ্ন কেন আসছে বুঝছি না। তিনি তো যোগ অভ্যাস করছিলেন না, বা রূপান্তর চাইছিলেন না।

৯-১-১৯৩৭

×

প্রঃ গভীরতর স্তর থেকে আসা স্বপ্ন আর অন্তঃদৃষ্টির পার্থক্য কি ভাবে বোঝা যায়?

উঃ কোনও মাপকাঠি নেই, কিন্তু কেউ যদি অন্তঃমুখী হয়ে থাকে, নিদ্রিত নয়, যে অবস্থায় সাধারণতঃ অন্তঃদৃষ্টি হয়, তাহলে যে ছাপ বা দাগ রেখে যায় তার স্বরূপ থেকে বোঝা যায়। স্বপ্নে কিছু সূক্ষ্ম দেখাকে, স্বপ্নে সুস্পষ্ট দেখা থেকে তফাৎ করা আরও কঠিন, কিন্তু তফাৎটা বোঝা যায়।

৯-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "এমন কোনও জিনিস তোমার থাকবে না, যা তোমার নিজের বলে তুমি দাবী করতে পারো। সব কিছুই ভগবানের কাছ থেকে আসছে, এটাই তুমি অনুভব করবে, আর সব কিছু ভগবানকেই ফেরৎ দিতে হবে। এই অনুভব যখন দৃঢ় হবে, তখন অতি ছোট জিনিস যা সচরাচর তোমার নজরে পড়ে না, তাও আর তুচ্ছ, মূল্যহীন থাকবে না। তার ভিতরে গভীর অর্থ নিহিত থাকবে, এবং অনেক দূরের দৃষ্টি খুলে যাবে।"

এটাও কি যাত্রার প্রথম দিকের পদক্ষেপ——যেমন "আহ্বান করো, নামিয়ে আনো"?

উঃ অতো প্রথম দিকের নয়।

১৪-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "কেননা এমন কিছু পৃথিবীতে নেই যার ভিতর সেই সর্বশেষ সত্য বা ভগবানের সাহায্য"।

সম্পূর্ণভাবে এই অনুভূতি পেলে অনেক কিছুই পাওয়া যায়, বোধ হয় শেষ পাওয়া যা তাই। ঠিক কি?

উঃ হ্যাঁ।

১৯-১-১৯৩৭

×

প্রঃ "কর্মের শৃঙ্খলে তুমি বদ্ধ, আর সেই শৃঙ্খলে যা কিছুই ঘটুক না কেন, সেটা আগেকার কর্মের ফল।"

"আগেকার" বলতে কি সব পূর্ববর্তী জীবনকেই বোঝায়, প্রথম থেকে এই জীবন পর্যন্ত?

উঃ এটা পাইকারি হিসাবের কথা হ'ল। দার্শনিক অর্থে যা কিছু ঘটে, সেটা হ'ল ঘটনার অব্যবহিত পূর্ব পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছিল, তারই ফল। বাস্তবিক পক্ষে, কোনও বিশেষ ঘটনা, ভূতপূর্ব কোনও বিশেষ ঘটনারই ফল, এবং এখনই বলা হয়ে থাকে যে আজকের ঘটনা পূর্বেকার ঘটনার ফল।

(কোথা থেকে *এই* উদ্ধৃতিগুলি এল? ঠিক কি পরিপ্রেক্ষিতে বলা হয়েছে সেটা জানলে ঠিক মানে বোঝা যায়।)

১৯-১-১৯৩৭